[illegible]

[illegible]

। । । । । । । সপ্ত সিন্ধু

। । । । । । । । । । দশ দিগন্ত

সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত

সম্পাদনা

শঙ্খ ঘোষ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত



নতুন সাহিত্য ভবন

কলিকাতা-২০

প্রকাশক
সুশীলকুমার সিংহ
নতুন সাহিত্য ভবন
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
কলিকাতা-২০

মুদ্রক
সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী



প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৫৩

দাম বারো টাকা

উৎসর্গ

স্থধীন্দ্রনাথ দত্ত

ব্যক্তি ও বিশ্ব

তখন পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে একটিমাত্র ভাষাই প্রচলিত ছিল। এমন এক সময় পশ্চিম দিকে রওনা হতে গিয়ে জগতের লোক সেন্নর বলে একটি দেশে সমতলভূমি দেখতে পেয়ে সেখানেই আস্তানা গাড়ল। এখানেই তো আমরা আগুনে সেঁকে ইঁট বানিয়ে নিতে পারি, এ ওকে বলল। ওরা পাথরে নয়, মাটিতেই ভিৎ গাঁথল। এবার তাহলে এসো আমরা একটি নগর গড়ে তুলি, তার মাঝখানে এমন এক বুরুজ বানাই যার চুড়ো আকাশ ছুঁয়েছে; মস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে না থেকে এসো আমরা অনেক বড়ো হয়ে উঠি—এই সব যখন তারা বলাবলি করছে, ঈশ্বর নেমে এসে লক্ষ্য করলেন, আদমের সন্ততি নগর আর দুর্গ বানাতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তিনি ভাবলেন, এখানে সব মানুষ এক হয়েছে, এমন-কি তাদের ভাষাও অভিন্ন। কিন্তু এই তো ওদের উদ্যম-উদ্যোগের শুরু, ওদের ইচ্ছা কাজে পরিণত করতে বাধাটা কোথায়? বরং ওদের ভাষার মাঝখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাক ওরা যাতে পরস্পরের কথা বুঝতে না পারে—এই ভেবে ঈশ্বর তাদের সেই মিলিত বাস ভেঙে সারা দুনিয়ায় তাদের ছত্রখান করে দিলেন, ইচ্ছানগরী গড়ার কাজ আর শেষ হলো না। সেই কারণে এর নাম হলো ব্যাবেল অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা, কারণ সেখানেই তিনি সারা জগতের ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করে জগৎবাসীকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বাইবেলের এই বৃত্তান্ত কবিতার ইতিহাসে একটি উদ্দীপক সত্য। ঈশ্বর একদিন প্রায় প্রত্যেক দেশের ভাষাকে অন্য দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন এবং তারপর থেকে কবিরা নিরন্তর চেষ্টা করেছেন ভাষার বিভিন্নতা ঘোচাতে। কাজ চালানোর সুবিধের জন্য উদ্ভূত Volapük কি Pidgin English-এর ভাষাসঙ্কর নয়, হয়তো ব্রজবুলি ভাষার জন্মসূত্রে ঐ দূরান্বয়ী শুভেচ্ছা নিহিত ছিল। বাংলাদেশের কবি গোবিন্দদাস তাঁর অনুবাদ্য মৈথিল ভাষার কবি বিদ্যাপতিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছিলেন :

> ভুবনে আছয়ে যত ভারতি-বাণি
> তাকর সার সার পদ সঞ্চয়ে
> বান্ধল গীত কতহুঁ পরিমাণি ॥

পৃথিবীর কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতাবলি স্বীকরণ করে বিদ্যাপতি অজস্র কবিতা লিখেছিলেন, গোবিন্দদাসের কাছে এটি ঈর্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল। বস্তুত, অপর ভাষার মাধুর্যনির্যাস স্বভাষায় নিয়ে আসার এই যে মৈত্রেয়ীমমতা থেকে ব্রজবুলি নামক কাব্যভাষার জন্ম, সেইটেই কবিতা অনুবাদের অন্যতম মনস্তত্ত্ব।

গদ্য অনুবাদের পিছনে ওরকম কোনো মনন নেই, কেননা তার মূল্য প্রধানত ব্যবহারিক। কিন্তু গদ্য অনুবাদকের হৃদয়েও কি একটি কবিপুরুষের অভিঘাত অনিবার্য নয়? গ্রীক দার্শনিক রচনা লাতিনে তর্জমা করতে গিয়ে সিসেরো দেখলেন তাঁর ভাষায় ঐ সব নবীন ভাবনা বহনের উপযোগী অনেক শব্দই নেই—তাই তাঁকে নতুন শব্দ ব্যবহারের কথা ভাবতে হলো। নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিক চিন্তনও তাহলে বাণীর বিবেকাত্মা স্পর্শ করে। জেস্‌পের্সনের মতো এমন আইন বেঁধে দেব না যে ধার-করা শব্দই কোনো ভাষার পরিণতিমাপক মাইলস্টোন। এমনও বলব না, শব্দ-ঋণ প্রকট হয়ে ওঠা কোনো ভাষার পক্ষে শ্লাঘাসঞ্চারী। কিন্তু যদি সেই আহরণী প্রবণতা মৌল সিস্‌ক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন কি বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় না? গোতিয়ে'র l'art pour l'art পেটারের হাতে art for art's sake-এ বিবর্তিত হয়ে অবশেষে যখন সুধীন্দ্রনাথের মন্ত্রণায় কলাকৈবল্যবাদে পরিণত হয়, তখন না মেনে উপায় থাকে না শিল্প মুক্ত, যদিও সেই মুক্তির শর্ত সারা বসুন্ধরা থেকে পরিগ্রহণ। এবং যে. যথার্থ শক্তিমান, সেই তো পারে প্রদত্ত উপহার আত্মমূল্যায়নের উদ্দেশ্যে অর্জন করে নিতে। যখন সুধীন্দ্রনাথের পরিচর্যায় শেক্সপীয়রের life হয়ে ওঠে 'বিভূতি', অথবা জীবনানন্দের 'মায়াবীর মতো জাদুবলে' ইয়েট্‌সের passion হয় 'রক্তিম বাসনা', তখন কি এটাই আমরা অনুভব করি না যে অনুবাদ আসলে একটা চমৎকার ছল, নিজেকে আবিষ্কার করার একটি বিনীত উপায়?

বাংলা সাহিত্যে ঐ আত্মআবিষ্ক্রিয়ার উৎসাহ প্রায় পাঁচশো বছর ধরে এক-একটা ঝোঁকে প্রকাশ পেয়েছে। বলতে পারি, একান্তর ঝোঁক, কেননা, এই প্রবণতা যেন এক শতাব্দীতে উচ্ছল, আবার শতাব্দীর ব্যবধানে পরবর্তী শতকে উদ্রিক্ত। পনেরো শতক, সতেরো এবং তারপর উনিশ-শতকের একান্তর তর্জমাচর্চা আমাদের শতকের ভাষান্তরস্পৃহার আড়ালে এতোটুকু সক্রিয় নয়, একথা বললে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে হয়। এবং ঈষৎ

তলিয়ে দেখলেই লক্ষ্য করি, প্রত্যেকবারই অনুবাদকের চরিত্রমানসের নিজস্বতায় আক্রান্ত হয়েছে মূল কবিতা, তাই 'রচিল যে কৃত্তিবাস পূর্ণ করি অভিলাষ/বন্দিয়া সে বাল্মীকি পুরাণ'—অনূদিত কবিতাকে স্বরচিত কবিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চিরায়ত উদাহরণ রয়ে গেল। গ্যাভিন ডগ্‌লাসের ঈনিড অনুবাদে যেমন স্কটল্যাণ্ডের আবহমণ্ডল, মালাধর বসুর বিশ্বস্ত ভাগবত অনুবাদেও তেমনি বাংলাদেশের শ্যামল প্রসঙ্গ। পনেরো শতকের স্বদেশী কবিদের কাছে অবশ্য মোরের প্রত্যুত্তরে বাইবেল-অনুবাদক টিণ্ডালের সেই শব্দসম্বিৎ আশা করি না যাতে charityর বদলে love শব্দের সগৌরব প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয়। কিন্তু কৃত্তিবাস-মালাধর যে মূল কবিতার সঙ্গে নিজেদের যোগ করে দিয়েছিলেন তার মূল্য অসীম। সৈয়দ আলাওল যখন পদ্মাবৎ অনুবাদের অবতারণায় বললেন 'স্থানে স্থানে প্রকাশিব নিজ মন উক্তি' তখনো ঐ নিজেকে যুক্ত করার অভীপ্সা সুগোচর।

কিন্তু মূল কবিতার সঙ্গে নিজেকে বা নিজের সংস্কৃতিকে মিলিয়ে নিলে কি অনুবাদ অবিশ্বাসী হয়? উনিশ শতকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একাধিক কবি অথবা কবিযশঃপ্রার্থী নাটক তর্জমা করেছেন। সবচেয়ে স্মরণীয় দুটি নাম হেমচন্দ্র ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। হেমচন্দ্র রোমিও জুলিয়েটের অনুবাদ করতে বসে পরিবর্তন পরিবর্জন ছাড়াও ঐ 'নাটকের গল্পের ও তাহার প্রধান নায়কনায়িকাদিগের চরিত্রের সারাংশ' নিয়ে তা 'দেশীয় ছাঁচে' ঢেলে 'স্বদেশীয় পাঠকের রুচিসংগত' করবার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে এই পদ্ধতির আপেক্ষিক অক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন বলেই হেমচন্দ্র এমন একটি জরুরি কথাও বলেছিলেন, 'এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশ বিদেশীয় নাটক কবিতাদির অবিকল অনুবাদ বাংলাসাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু আপাতত কিছুকাল এই প্রণালী অনুসরণ করা অপরিহার্য বলিয়াই আমার ধারণা'। মধুসূদনের কবিতায় যখন তাসোর ক্যামিল্লা প্রমীলার সঙ্গে মিলে যায় তখন মানতে ইচ্ছা করে, দেশজ ভাবাসঙ্গ অনায়াসেই বৈদেশী ঐশ্বর্যের প্রতিসাম্য পেতে পারে। এ ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক-এক জায়গায় বিস্ময়কর সার্থকতায় পৌঁচেছেন, কিন্তু তাঁর এই নিরীক্ষা যে বাইরের স্তরেই নিবদ্ধ ছিল, মলিয়েরের নাটকের সেনেকা ও জুভেনাল যথাক্রমে বাণভট্ট ও কালিদাসে পরিবর্তিত হওয়ার মধ্যে তার দৃষ্টান্ত। তাই 'হঠাৎ নবাব'কে স্বাধীন নামান্তরিত নাটক হিসেবে চিহ্নিত

করে তিনি এই বিবেচনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন যে অনুবাদ প্রকৃতপ্রস্তাবে বহিঃশরীরের নয়, সত্তার ঘটনা।

কিন্তু শুধু ভাবাসঙ্গ নয়, নতুন ভাষাসঙ্গও তার জটিল চাহিদা নিয়ে উপস্থিত। সম্ভবত বর্তমান শতকেই এই কথা আমরা তীব্রভাবে অনুভব করেছি। নীরেন্দ্রনাথ রায় শেলির One word is too often profaned কবিতাটির অনুবাদ করে সংশোধন করতে দিলে রবীন্দ্রনাথ এই নব্য অনুবাদ-তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করে বলেছেন :

'মূলের ভাবটাকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে ঠিক তার মাপসই করে আঁট করা চলে না। তাই প্রতিরূপ না হয়ে কতকটা অনুরূপ হয়েচে। মূল কবিতার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, এটা যে তারা জলের মতো বুঝবে এমন আশা নেই, কিন্তু সেজন্যে আমি বা বাংলাভাষাই যে একমাত্র দায়ী তা মানতে পারি নে। বস্তুত প্রথম শ্লোকের শেষ দুটো লাইন ঠিক যেন জায়গা পায়নি—যেন আরেকজনের কেদারার হাতার উপরে বসেচে।'

—জুলাই ২০ (?) ১৯৩১-এর চিঠি (পরিচয়, কার্তিক ১৩৩৮)

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা পড়লে অনুমান করা সম্ভব, কেন তিনি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের অনুবাদকবিতার প্রশংসাসূত্রে 'নবজন্মের নূতন শ্রী' বা 'দুঃসাহসিক নাবিকবৃত্তি' কথাগুলির উপর জোর দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অনুবাদ বলতে তিনি নিছক ভাষান্তর না বুঝে আন্তরভাষ্য বুঝেছিলেন। অবশ্য, গত শতকে অসামান্য পরিশ্রমী স্পেনীয় অনুবাদক অ্যানিবাল গালিন্দোর বক্তব্যেও এই মনোভঙ্গির আভাস পাওয়া গিয়েছিল। শব্দ ও পংক্তি ধরে কবিতা অনুবাদের শতুব্রিয়ঁ নির্দেশিত রীতিটি অগ্রাহ্য করে তিনি বলেছিলেন যে ঐ রকম তর্জমা literal না হয়ে verbal হওয়ার বিবর্ণতায় রুগ্ন। অর্থাৎ, অনুবাদ সমালোচনারই আরেকটি ধারা বা উপায়। একটি কবিতা রচিত হওয়ার পরক্ষণ থেকে পাঠকের সাহিত্যস্নায়ুকে যেমন সে অসংখ্যভাবে আলোড়িত করে চলে, তেমনি যুগে যুগে পাঠকের নতুন নতুন ব্যাখ্যায় তার অর্থও নিশ্চয় পরিবর্তিত হতে থাকে। আমাদের পক্ষে কোনোক্রমেই জানবার উপায় নেই কীট্‌স্ ঠিক কী বলতে চেয়ে হৈমন্তিকস্তোত্র রচনা করেছিলেন। সেক্ষেত্রে তার নতুন একটি প্রায়-সার্থক ভাষান্তর নিশ্চয় কোনো সমালোচনার চেয়ে কম মর্মান্বেষী হয়ে ওঠে না।

এদিক দিয়ে, বোদলেয়রের Harmonie du soir-এর দ্বিতীয় স্তবকের সঙ্গে অনূদিত এই অংশগুলি মিলিয়ে পড়লে অর্থোদ্ধারের নতুন-নতুন জীবন্ত প্রয়াস নজরে আসে :

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ;
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige ;
Valse mélancolique et langoureux vertige !
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.

Each flower, like a censer, sheds its sweet,
The violins are sad souls that cry,
O languorous waltz ! O swoon of dancing feet !
A shrine of Death and Beauty is the sky.

(Lord Alfred Douglas)

Each flower to heaven exhales, a censer fair ;
The violin sobs, a soul in sorrowing plight,
A mournful waltz, a languorous, whirling flight !
The sky, sad, lovely tomb, knows not of care

(Dorothy Martin)

বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস,
শিহরি গুমরি বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন
সান্দ্র ফেনিল মূর্চ্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন !
সুন্দর-ম্লান বেদি সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ।

(সন্ধ্যার সুর। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

• •

ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়, যেন সে ধূপের ধূম !
বেহালার সুরে শুনিতেছি কোন্ প্রেতের আর্তনাদ !
নৃত্যের তালে মূর্চ্ছার রেশ, চরণে জড়ায় ঘুম,
অস্ত-গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ !

(সন্ধ্যার সুর। মোহিতলাল মজুমদার)

প্রতিটি ফুল মিলিয়ে যায় যেন ধূপের ধোঁয়া ;
বেহালা, যেন আতুর প্রাণ, তীব্র প্রাণ তোলে ;
করুণ ভাল্‌জ-নাচের তাল ফেনিয়ে ওঠে ফুলে ;
বেদির মতো আকাশে নামে বিষাদঘন মায়া।

(সান্ধ্যসুর। বুদ্ধদেব বসু)

প্রতিটি অনুবাদই এক্ষেত্রে উৎসের প্রতি অনুগত, এমন কি,—অ্যালফ্রেড ডগ্‌লাস ও ডরোথি মার্টিনের ভাষান্তর দুটিও এ উক্তির অন্তর্গত—অনূদিত কবিতাগুলিতে অধিকাংশত একই শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু একটির সঙ্গে আরেকটির কী দুস্তর দূরত্ব! Shrine শব্দের প্রয়োগ সত্ত্বেও ডগলাস যেখানে ঐহিক, ডরোথি মার্টিন সেখানে চিন্ময়। আবার একই যান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের দাঁড়ে সত্যেন্দ্রীয় বিহঙ্গ যেখানে উর্ধ্বোন্মুখ, মোতিলালের পার্থিব পাখিটি সেখানে অতীন্দ্রিয় দিগন্তের অস্তিত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ বধির। এ দুটি মনোভঙ্গি প্রায় পরস্পর মেরুসুদূর হয়েছে বললেই সমীচীন হয়। বরং বুদ্ধদেব কি পাঁচমাত্রার ছন্দে একটি ভারসাম্যের দিকে ঝুঁকেছেন যেখানে মোহ আর মুক্তির মিশ্র মনন সমন্বিত? এই পাঁচটি অনুবাদ পাঁচটি পর্যালোচনা, অথবা সমালোচনা। এবং কবিকর্ম। এক-একজন নিজেদের দৃষ্টিকোণ আরোপ করে মূল কবিতাটি ব্যাখ্যা করেছেন। গদ্যে নিবদ্ধ সমালোচনার চেয়ে এই সব ছন্দোময় ভাষ্য অনেক বেশি কেন্দ্র অভিমুখে ধাবমান, কেননা এই সব ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা মিলেছে ব্যঞ্জনার সঙ্গে।

অর্থাৎ, অনুবাদক নিছক দোভাষী নন। বরং অনুবাদকের কাজ মাতার না হলেও ধাত্রীর। জন্মগ্রহণের পর শিশুকে বারে বারে জন্ম নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় এবং ধাত্রীর হাতে সে একটি মায়াবী সামঞ্জস্য লাভ করে অতঃপর পিওারকথিত সুঠাম যৌবনে বিবর্তিত হয়ে যায়।

আধুনিক কবিতার স্বরায়তন বিভিন্নের ঐকতান। ক্লাসিক কবিতা একদিন নানা মালঞ্চের ফুল সংগ্রহ করে একটি নৈর্ব্যক্তিক ফুলদানির সৌন্দর্যে পৌঁচেছিল। সেই সৌন্দর্য অসামান্য কিন্তু আমাদের অনাদৃত প্রত্যহ তাতে আপন স্বত্ব মুদ্রিত করে দিতে পারেনি। আধুনিক কবিতা সেই অজস্র বিক্ষিপ্ত ব্যাপ্ত জীবনের উপর স্বকীয় মুদ্রা এঁকে দিতে চেয়েছে। শিল্পচৈতন্যের মধ্য দিয়ে সেই জীবনের ফুলকে অবিকৃত রাখতে উন্মুখ অনুবাদকবিতা।

নিজের থেকে স্বতন্ত্র যে বাস্তবতা তাকে সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার এর চেয়ে ব্যক্তিগত অথচ নিরাসক্ত পদ্ধতি আর কী হতে পারে? কবিতার অনুবাদ আধুনিক কবিতার কার্যক্রমের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, কেননা, সেই totality বা সামগ্র্য তার লক্ষ্য

যা পাওয়া যায় গাছের ফুলে
ডালে পালায় সব মিলিয়ে
. ...
মুঠোয় করে ধরবার জন্যে সে নয়
তার অসাজানো আটপহুরে পরিচয়কে
অনাসক্ত হয়ে মানবার জন্যে
তার আপন স্থানে।

(শেষ সপ্তক, ২৪)

ব্যক্তিবিশ্ব

অনেকটা খেলনার মতো, যেন রঙিন বল হাতে পেয়ে গেলেন রোমান্টিকেরা। সকল বহির্বিষয় স্পর্শ করে করে বল আবার ফিরে আসতে থাকে হাতে: এই হলো আমি'র প্রথম জাগরণ। এই এক নব-আবিষ্কারে বিহ্বল শিশুর মতো কবি, অনুভবের আবেগ হলো তাঁর সত্যদর্শনের সোনার তরণী। কাণ্ট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন দেকার্তের *cogito ergo sum*; অজানার ঢেউ ভেঙে বেয়ে তো চলে যাই ঠিক, কিন্তু চিৎ কি শেষ পর্যন্ত লাভ করতে জানে পরম কে? কে তবে জানে? অনুভব এবং আত্ম-অনুভব। আর এই সূত্র থেকে পুরোনো জড় গেল ভেঙে, শূন্যে শূন্যে আলোর আনন্দকুসুম ফুটে উঠল তখন, যখন 'আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম'।
পাষাণ ভেঙে দিয়ে অহল্যার এই নবীন জাগরণ আমিত্বের জাদুতে: একই কালখণ্ডে দেশে দেশে এর সুর ছড়িয়ে পড়ল বিস্ময়ে-বিষাদে। তরুণ হ্বের্থরের দুঃখ যিনি শুনিয়েছিলেন তাঁর কাছে অবশ্য রোমান্টিকতার নাম ছিল রুগ্নতা; কিন্তু ভুলে যাওয়া অনুচিত যে এই আক্রমণ তিনি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন পরে, ভাবী যুগের আত্মার মধ্যে মিলিয়ে নিয়েছিলেন নিজেরও নিশ্বাস। 'সব

কবিতাই অবশেষে কবির আত্মব্যক্তিত্বের প্রতিফলন' গ্যেটের এই বাণী ধ্বনিত হতে থাকল উগো থেকে রোজালিয়া কাস্ত্রো পর্যন্ত; 'নিত্য কী যে খুঁজে বেড়াই, কী জানি কী জানি' (কাস্ত্রো) যেন রবীন্দ্রনাথেরই সুদূর সূত্র হিসেবে স্পেন আর বাঙলাকে ঘনিষ্ঠ করে নিমেষে বেঁধে দিয়ে গেল, কাল থেকে কালে।

কিন্তু না, পতনচিহ্ন মাত্র এই নয় যে কবি তাঁর অহংকে পেয়ে বিহ্বল; বরং অল্পদিনেই ধরা পড়ল কবি এক অন্যায় সুযোগ গ্রহণেও তৎপর, রোমান্টিক সেই অন্যায়, যখন মানবজীবনের নীতিনিয়ন্তা বলে নিজেকে ঘোষণা করে দিলেন তিনি। এ তো তবে বিষয়ীর অভিমান মাত্র নয়, বিষয়কে আত্মগোত্রে বেঁধে নেবার এ তো এক অভিনব কৌশল মাত্র! একদিকে এই, আবার অন্যদিকে নির্বাচনহীন সমগ্রবিধ বিষয়ে তুলে আনবার অভ্যাসে নতুন বিশ্ব ক্রমে ছিন্ন ছিন্ন হয়ে এলো সতীদেহের মতো, তৈরি হলো যেন Barzun-এর পরিভাষায় এক 'multiverse rather than a universe'। ক্লাসিক-কাল যদি অবজ্ঞাত হতে পারে স্থাণু বিষয়ের জড়তায়, নূতন দিনও কি এম্‌নি করে ঘুলিয়ে উঠল না বিষয়ীর স্বৈরাচারী তাড়নায়?

ফলে কবিতার এই জগৎ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা আর গ্রহণ করা গেল না। একে বলা গেল না বিষয়ীর আত্মতা। 'উনিশ শতকে ছিল বিষয়ীর আত্মতা' এ হয়তো স্বীকার্য শেষ পর্যন্ত, যদি সমগ্র য়ুরোপকে একযোগে বিচার করতে প্রস্তুত থাকি আমরা। কিন্তু, যদিও পশ্চিম বা য়ুরোপ শব্দের দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ এর উল্লেখ করেছিলেন, তবু সন্দেহ কী যে তাঁর আলোচ্য ছিল ইংরেজি বা মার্কিন কবিতা! ইয়েটসের রাইমার্স ক্লাব তো অনেক পরকালীন ঘটনা, তার দৃষ্টান্তে কি বলতে পারি যে ইংরেজি কবিতায় বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতকেই?

কেননা আত্মতা শব্দটির নিজস্ব মূল্য আমরা ভুলতে পারি না, রোমান্টিকতার জগতে এই শব্দকে যেন প্রক্ষিপ্তের মতো মনে হয়। সে জগৎ বিষয়ীর উন্মোচনে পরিপূর্ণ, কিন্তু তার আত্মতায় নয়। যতটা অনর্গল উৎসার, ততো নিরোধী অঙ্গীকরণ তার নয়। সমগ্র আধুনিকতা তার সহজিয়া মুক্তিকে বেঁধে আনতে চায়, কেননা যা-কিছু চৈতন্যের দ্বারা পরিশুদ্ধ আত্মস্থ নয় তা কবিতার বিষয়ও নয়, এ-কথা জানিয়ে দিল আধুনিকতা, প্রাচ্য জগৎ পর্যন্ত ধ্বনিত তার প্রতিরণন শুনতে পাওয়া গেল যখন হো চি ফাং বিশ শতকের চীন থেকে

শুনিয়ে দিলেন শেলিকে : যেটা স্বাভাবিক সেটাকে আমি করি দৃশ্যপট, একটা গহনামাত্র······আমরা শেষ করেছি উনিশ শতকের সহজ ভাব।

কীট্‌স্‌ স্বভাবত স্ব-তন্ত্র। অথবা নোভালিস মাত্র ধ্বনিসুভগ শব্দসৌন্দর্যের জন্য কবিতা সৃষ্টি করতে চেয়ে রূপচেতনার আংেকরকম পরিচয় রেখেছিলেন। কিন্তু সেখানেও নয়, বিষয়ীর আত্মতা সুস্থ নির্ভর হিসেবে গৃহীত হলো পারীর সেই ঘরে—যেখানে দেগা, লাফর্গ, ভালেরি, ক্লোদেল, জিদ, ইয়েটসের পরিবেষ্টনে বসে মালার্মে বিশ্ব আর তাঁর নিজের মধ্য-আবরণ এক ধূম্রজাল রচনা করে চলেছিলেন। এঁরা মেনে নিয়েছিলেন কেবল ক্লিন্ন কুসুমের কবিকে, অথবা শতাব্দী পেরিয়ে ক্রমে পাস্কাল পুনর্জীবন লাভ করছিলেন তাঁর দার্শনিকতায়, কিন্তু যেমন ক্লাসিক আর রোমান্টিকের সেতুবন্ধে দাঁড়িয়ে আছেন গ্যেটে, বোদলেয়রের পরিচয়ও তো তেমনি শেষ-রোমান্টিক নামে। প্রতীকী কবিদের ধ্যান পর্যন্ত পৌঁছে তবেই আমরা জানলাম বিষয়ী কীভাবে মহাবিষয়ের সমগ্রতার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে নেয়। বিশ্ব-বিষয় এক নূতন বেধ মাত্র তখনই অর্জন করতে পারল, পারীর সেই ঘরে; বিষয়ীর নিবিড় আত্মতায় তখনই পরিপূর্ণ হয়ে এলো কবিতা।

কবিতা কিছুই জানায় না, সে হয়ে ওঠে। এই হয়ে-ওঠাই ক্রমে অগ্রসর হয়ে যায় পরমের প্রতি, যে পরম ভিন্ন আর কাউকেই প্রয়োজন ছিল না মালার্মের। কিন্তু তার উপায় হিসেবে ছড়িয়ে আছে প্রতিষঙ্গ প্রকৃতি: 'অম্বর, কস্তুরী, ধূপ, পরিকীর্ণ গম্ভীর লোবান/গুঞ্জরে আনন্দময় আত্মা আর ইন্দ্রিয়ের গান'। প্রকৃতি এসে এই তো প্রতিহত হলো কবির ব্যক্তিত্বের মধ্যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞাতজাত প্রতীকের মধ্যে সে আবার তার অহংকে সংহত করে নিল। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তো হওয়া চাই পরিব্যাপী, বিশ্ববিষয়কে ঐক্যে পৌঁছে দেবার সাধনা হওয়া চাই মূলগত আর সেইজন্যে সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্তে বিকীর্ণ হয়ে পড়া চাই কবির দৃষ্টি,—বায়রনী ভ্রাম্যমাণতায় নয়, কিন্তু পাউণ্ডের বিশ্ববীক্ষণে।

কেন এই বীক্ষণ? প্রেরণা কি অবিশ্বাসী? অন্তত, ঐ শব্দের কোনো কৌলীন্য নেই আধুনিক কবিসমাজে—ভূতগ্রস্ত উচ্চারণে কে-বা আত্মসমর্পণ করতে চায়! এলিয়ট-বিশ্বাসী বিষ্ণু দে-র কোনো কবিতায় প্রেরণার সন্দেহে আপত্তি জানিয়েছিলেন ভালেরি-সতীর্থ সুধীন্দ্রনাথ। আচ্ছন্ন অবস্থায় মহা-রচনা লিখতেও রাজি হননি ভালেরি, বরং পূর্ণ চেতনায় থেকে দুর্বলও

লিখবেন এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। এ-সবই সংগত আগ্রহ, তবুও কি লক্ষ্য করা উচিত নয় যে ঐ পুরোনো কথাটাই এখন ঘুরে গিয়েছে প্রেরণা থেকে প্রজ্ঞায়? আর প্রজ্ঞা বা vision প্রতীকী কবির সাধনায় পরিত্যাজ্য তো নয়ই বরং এর প্রতিই তাঁর সমস্ত উন্মুখতা। কিন্তু দৈববশে এই vision-দ্বারা তড়িতাহত হবেন কবি, এই ভুল বিশ্বাসে বসে থাকেন না তিনি, তাঁকে মুহূর্তে মুহূর্তে গড়ে তুলতে হয় সেই আত্ম-উপযোগ যার দ্বারা পরমতমের ক্ষণসান্নিধ্য তাঁকে স্পর্শ করে যাবে, অভিজ্ঞতা, ধারণা আর অনুভূতির মিলিত সমবায়ে রচিত হয়ে ওঠে কবির যে-ব্যক্তিত্ব তার সঙ্গে প্রজ্ঞা এসে মিলিত হলে তবেই কবিতার জনন সম্ভব হতে পারে। আর এই মিলনমুহূর্তেরই অপর নাম কি প্রেরণা নয়? বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল বিশ্বজাগতিক অস্তিত্বের মধ্যে আশা করা যায় না যে মুহুর্মুহু এই মিলন ঘটে যাবে, কিন্তু তবু কবিই তো পারেন এই মিলন ঘটাতে! যে আত্মাহীন সময়ের দুঃখে হেল্ডারলিন বলেছিলেন 'কবি আর কেন'—কবিতা তো তারই উত্তর। অনেক ধৈর্য-তপস্যার দ্বারা ক্রমে এই ঐক্যস্পর্শ করবার সাধনা হলো কবির, শুদ্ধসত্তার গভীরে এই ক্রমিক অবরোহণেই কবির ইতিহাস।

কিন্তু যে-মুহূর্তে এই প্রেরণা সম্ভব হলো, জন্ম হলো একটি কবিতার, তখন সেইটেই হলো কবির আরেক অভিজ্ঞতা, নূতন অভিজ্ঞতা, তার ব্যক্তিত্বের সৃষ্টিতে আরো একটি গ্রহণীয় উপাদান। এইভাবে, কবিতা হলো একই সঙ্গে আত্ম-আবিষ্কার এবং পারম্যস্পর্শ। যদি ব্যক্তিত্ব এইভাবে নিত্যজায়মান হয়ে উঠতে না পারত কবিতার ভিতরে, সমগ্র প্রবাহ তার তরঙ্গবেগ হারিয়ে ফেলত তবে, রীড হয়তো তখন বলতেন এ আর পার্সোনালিটি থাকল না, এর এখন মৃত্যু হলো ক্যারেক্টারে! এই অর্থে আধুনিক কবিতাও ব্যক্তিত্ব থেকে নির্মোচন নয়, পরমের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের মিলন মাত্র। কিন্তু খণ্ড অভিজ্ঞতার এই সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে, খণ্ডব্যক্তিত্বগুলিকে খুলে ফেলতে ফেলতে তবে এই মিলনমন্দিরে অগ্রসর হওয়া যাবে, বলা যাবে: 'আবার ফিরে পেয়েছি তারে। কারে? শাশ্বতীরে।'

পরমা এবং শাশ্বতী যখন কবিতার অন্বিষ্ট, বিশ্ব আর ব্যক্তিত্বের অন্যোন্য সংযোগ যখন সেই অন্বেষণের অবলম্বন, তখন অনিবার্যভাবে তাকে হয়ে উঠতে হলো সুরময়, আভাসযোগ্য ইন্দ্রজাল। কবি এমন এক সংবেদন অর্জন করে নিলেন যা বীণাযন্ত্রের মতো সাড়া দিয়ে উঠতে পারে, আর এই জন্যে তাঁকে

মিলিয়ে আনিতে হলো শিল্পকলার পারস্পরিক ব্যবধানগুলি। একই সূত্রে সমস্ত কল্পনাসুন্দরীর আরাধনা করতে হবে শিল্পকর্মকে, যেমন বলেছিলেন জাঁ কক্‌তো। চিরন্তনের স্বভাবগুণে সংগীতই তার নিকটতম স্পর্শক; তাই স্থাপত্যের গরিমা ভেঙে দিয়ে উনিশ শতকের য়ুরোপ আমাদের দেখিয়ে দিল সাংগীতিক বৈজয়ন্তী, এবং সমস্ত শিল্পকলাও এসে মিলতে চাইল সংগীতসুষমায়। মরণশয্যায় বুদ্ধির জড়তার মধ্যেও বোদলেয়র আস্বাদন করতেন হ্বাগনার, মালার্মের জগতে সর্বত্রই সংগীত থাকে ছড়িয়ে, আবার তরুণ পাউণ্ডও যে রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসা দিয়েছিলেন তারও তো মূল উৎস ছিল এই বোধে যে one must read each poem as a whole and then reconceive it as a song—আর তাহলেই লক্ষ্য করা যাবে যে রবীন্দ্রনাথে the source of the charm is in the subtle underflow!
এই সুচিক্কণ অন্তঃস্রোতে কবিতা যে আরেকরকম মুখশ্রী পেল, বিষয়ীর আত্মতা ছিল তারই চারিত্রে। রবীন্দ্রনাথ অল্প সময়ে তাকে স্পর্শ করেছেন হয়তো, তবু শেষ পরিণতিতে পৌঁছবার পূর্ব পর্যন্ত উন্মোচনেই ছিল তাঁর অধিকতর আগ্রহ। আর সেইটে লক্ষ্য করেই কি ইয়েটস বা পাউণ্ড ক্রমে নীরব হয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রসঙ্গে? কিন্তু সে যাই হোক, উনিশ শতকের সূচনা যাকে পেয়েছিল খেলনার মতো, শতাব্দীর অবশেষ তাকে দেখতে পেল পরিণত মণ্ডনে। প্রগল্‌ভ প্রবক্তা কবি এখন মিতবাক দ্রষ্টার স্থৈর্যে। কবিতার বিশ্ব একরকম সমগ্রতার নিকটবিন্দুতে গিয়ে পৌঁছল বলে এখন লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু গটফ্রীড বেন আধুনিক অধিকারচ্যুত মানুষের পটভূমি দেখেছিলেন সিজোফ্রেনিয়ার বিশ্লেষণে। মস্তিষ্ককোটরে সঞ্চিত আদিম জীবনস্তরের স্মৃতি-পুঞ্জ টুকরো টুকরো হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে স্বপ্নে, অবচেতনে। ফলে যে-সমগ্রতার ধ্যান একদিন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা সংশয়ে বিপর্যস্ত হয়ে এলো, সাধ্য এবং সাধন দুয়েরই বিষয়ে সংশয়। অন্য এক অর্থে ব্যক্তিত্ব ভেঙে যাবার লক্ষণ দেখা দিতে লাগল; অজ্ঞেয়তার, অনস্তিত্বের নৈরাশ্যে ভরে উঠতে লাগল দিগন্ত; বিশ্ববিষয়ের পরিপ্রেক্ষণায় ব্যক্তির বাস্তবতা বিষয়ে নূতন জিজ্ঞাসা উঠে এলো, এই হলো বিষয়ীর আরেক আবির্ভাব।
নীৎসে প্রতিষ্ঠিত হলেন মহত্তম জার্মানদের অন্যতম হিসেবে; চূর্ণ বিশ্বের

বিশৃঙ্খলাই লক্ষ্যের কেন্দ্রে এসে দেখা দিল। কিন্তু বিশৃঙ্খলার মধ্যে সামঞ্জস্যের ঐক্য এনে দিতে এগিয়ে এলো কবিতা, এই সামঞ্জস্যই তো কবিতা, কিন্তু তার দ্বারা সে যে এক নূতন সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলছে এমন নয়, এখানেও সে গড়ে তুলছে কবিকেই, তাঁকেই সে এগিয়ে নিচ্ছে সম্পূর্ণতার অভিমুখে। এরই মধ্য দিয়ে রিলকে স্পর্শ করলেন শাশ্বতকে, অনুভব করলেন *gesang ist dasein*, সংগীতই হলো অস্তিত্ব, মালার্মের এষণা শক্তি পেল আরো এক মাত্রা।

বিষয় এবং বিষয়ী একাকার হয়ে এক মহাবিষয়ে পরিণত হয়ে এলে সে-ই নিজে হয়ে ওঠে কবিতা, গান—আর এই জন্যে তার অনুভবই রূপের অনুভব,—সংগীতই অস্তিত্ব এই ধারণা থেকে কবি নিজেই সেই রূপ হয়ে উঠতে চান, ফর্মকে অনুভব করতে চান কন্‌টেন্টের মতো। 'একমাত্র ফর্মই আছে' বলেছিলেন মিস্ত্রাল। হয়তো নীৎসে এই ধারণাকে এক বিপজ্জনক মেরু পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তবুও এই ধারণা আধুনিক কবিকে নূতন করে চেতনা দেয়। জীবনের অনর্গলতাকে শিল্প এক অবয়বের গঠনে বেঁধে আনে, 'জীবনকে ঝরিয়ে, গুটিয়ে নিয়ে, হ্যাঁ, তার সঙ্গে যুঝে—কেননা তাকে দেহাবয়বের শ্রী দিতে হবে' (বেন)। এবং এই জন্যই ভালেরি কবির তুলনা করেছিলেন এমন-কি একজন বীজগাণিতিকের সঙ্গে, সমস্ত জীবনকে যাঁর নিয়ে আসতে হবে ফর্মের বশে ; যাঁর হাতে সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে সুমহান্ এক বেদি পর্যন্ত পৌঁছে কবিতার নাম হবে *torrent melodique*।

তাই শেষ পর্যন্ত ভালেরির কিছু শ্রদ্ধা বেঁচে ছিল উগোর জন্য। 'রোমান্টিকেরা অনুকরণের যোগ্য কিছু দিয়েছিলেন, শেখবার যোগ্য কিছু নয়' এই কথা বলেও উগোকে তিনি এই গোত্র থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও কিছু দেবেন কি না আধুনিক তরুণ কবিকে, এর উত্তর পেতে প্রান্তিকে'র মতো কাব্যচর্চা মনে রাখতে হবে, উগোর সপক্ষেও মাঝে মাঝে কথা বলবেন সুধীন্দ্রনাথ বা ভালেরি, সে-কেবল এই কারণে যে যে-ফর্মের বিনাশ নেই তার মধ্য থেকে ঐ কবিরা সংহত করে নিচ্ছিলেন নিজেদের,—সামঞ্জস্যকে কি কোনো অর্থেই তাঁরা অনুভব করেননি ?

কিন্তু পরম সামঞ্জস্য কি আছে কোথাও, অথবা নেই ? অন্তত এই মুহূর্তের পৃথিবী নিষ্ফল হয়ে তাকিয়ে আছে তার সমস্ত ঐতিহ্যের দিকে, সে-ঐতিহ্য তাকে কিছু দেয়নি বলে সে কল্পনা করে। আর, প্রবক্তা কিংবা দ্রষ্টা,

কোনো ভূমিকাই আর কবির নয় বলে বর্তমান আমাদের বুঝিয়ে দেয়। আমরা কেবল প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতার কথা বিরলে শুনিয়ে যাব, এই আনত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আরেকবার তার আবরণ সরিয়ে দিল রোমান্টিকতা। বিষয়ী থেকে মহাবিষয় বা মহাবিষয়ীতে পৌঁছে রোমান্টিকতা কি আবার তবে ফিরে আসবে তার পুরাতনত্বে? এডমণ্ড উইলসন তো প্রতীকী কবিতাকে একদিন রোমান্টিক কাব্যআন্দোলনের ফলশ্রুতি বা 'এক দোলকের দ্বিতীয় দোলন' বলে অভিহিত করেছিলেন। আজ আবার ফাল্গুনীর সেই বুড়োর মতো রোমান্টিকচেতনা গুহা থেকে বেরিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সে 'বারে বারেই প্রথম, ফিরে ফিরেই প্রথম'। কিন্তু সার্ধশতাব্দীর কবিতা কবিকে যে মহিমার পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল, সেই আসন থেকে তাঁকে চ্যুত করবার এক পৃথুল আগ্রহ কবির সামনে এখন কী দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার! ইতিমধ্যে এমিলি ডিকিনসনের কবিতায় আমাদের ভরসা জীবিত হয়ে উঠছে, বা সহজ নিবিড়তায় পাঠককে আয়ত্ত করবার স্পৃহা ডেকে আনছেন সমালোচক। কিন্তু রবার্ট লোয়েল কেন 'ইমিটেশন্‌স্' প্রকাশ করেন অবশেষে? অনুবাদ নয়, তবু অনুবাদকল্প ওই রচনাগুলিতে দেশকালব্যাপী সমগ্র আধুনিকতার প্রেক্ষিতকেই কি একবার স্পর্শ করে নিচ্ছেন না লোয়েল? হয়তো হ্যাঁ, হয়তো নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বিশ্বকবিতাকে এক গুচ্ছের মধ্যে সাজিয়ে দেখা আজ সব সময়ের চেয়ে জরুরি হয়ে উঠল, কেননা তার মধ্যে থেকে হয়তো আবার সেই কেন্দ্রকে আমরা প্রার্থনা করে নিতে পারব:

> To cry aloud to the grey birds, and dreams,
> That have had dreams for father, live in us!

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। শঙ্খ ঘোষ।

প্রস্তুতিপ্রসঙ্গ

যে-সব কবিতা অনুবাদ-হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি সংকলন সাজানোই আমাদের মূল অভিপ্রায় ছিল না। সেই সঙ্গে, সমগ্র আধুনিক্ কবিতার একটি নির্বাচনও ছিল আমাদের লক্ষ্য। ফলে, অনেক কবিতাই আমরা পূর্বপ্রস্তুত অবস্থায় পাইনি, তৈরি করিয়ে নিতে হয়েছে। প্রবীণ-নবীন যে-কবিরা দাক্ষিণ্যের সঙ্গে আমাদের সমস্ত দাবি তৃপ্ত করেছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা অনিঃশেষ।

কয়েকটি কবিতা এ-সংকলনে গৃহীত হয়েছে, যা হয়তো অনুবাদের সীমাকে ঈষৎ অতিক্রম করে যায়; রচয়িতারা তাকে 'অবলম্বনে রচিত' বলতেই পছন্দ করবেন। যেমন 'আলোর ফুলকি' থেকে নেওয়া অংশ, অথবা বুদ্ধদেব বসু-কৃত 'অমরতার গান'।

সকলের রুচিসম্মত হবে এই অসম্ভব আশা আমরা মনে রাখি না। এটি বিশ্বকবিতার সংগ্রহ; দেশ এবং কালে এর বিস্তার ব্যাপক, ফলে অসন্তোষও ব্যাপকতর হওয়া স্বাভাবিক। যোগ্যতর সম্পাদনায় নিপুণতর সংকলন সম্ভবপর হতে পারত, সন্দেহ নেই।

বিদেশীভাষাবিদ অনেকের অকৃপণ সাহায্য আমরা অবাধে গ্রহণ করেছি: অরুণ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ রায়, অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনিমেষ পাল, জ্যোতি রায়, সন্তসিং বিনেপাল, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, ডেভিড ম্যাকাচ্চিন, ব্রুনো, জর্জিও ফ্রাঙ্কি। কয়েকটি দুর্লভ বই বা কবিতা দিয়ে কৃতার্থ করেছেন পুলিনবিহারী সেন, বুদ্ধদেব বসু, সুবীর রায়চৌধুরী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছেন সুবিমল লাহিড়ি, ছন্দা দাশগুপ্ত, অসীমরঞ্জন দাশগুপ্ত। কয়েকটি কবিতা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন বিশ্বভারতী, নাভানা কর্তৃপক্ষ, শৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, বিরাম মুখোপাধ্যায়, কনকলতা দেবী, তরুবালা দেবী। এই সংকলন প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে এক অবিশ্বাস্য ঝুঁকি নিয়েছেন অনিলকুমার সিংহ। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের অপার ঋণ। গুরুতর দু'একটি ভুল এখানে উল্লেখিত হলো। ৫২ পৃষ্ঠার ৫ম লাইনে 'মহাজ্ঞান', ৫৪ পৃষ্ঠার ৫ম লাইনে 'মেষ', ৫৫ পৃষ্ঠার ২য় লাইনে 'শুষে নিল' এবং ৬৪ পৃষ্ঠার ১০ম লাইনে 'পাপে' পড়তে হবে। ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতাটি অনুবাদ করেছেন দীপংকর দাশগুপ্ত, অনবধানবশে আলোক সরকারের নাম মুদ্রিত হয়েছে।

সূচিপত্র


একাকার ধ্বনি আর রঙ

জাঁ-পীয়ের ফ্লরিয়াঁ

স্ফুলিঙ্গ

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ,
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিক্তর হুগো

সূর্য ও ফুল

পরিপূর্ণ মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙা এক ভিত্তি 'পরে ফুল শুভ্রবাস
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে।
ছোটো মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে
'লাবণ্যকিরণছটা আমারো তো আছে'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেঁচেছিল, হেসে হেসে

বেঁচেছিল, হেসে হেসে
খেলা করে বেড়াত সে—
হে প্রকৃতি, তারে নিয়ে কী হলো তোমার!
শত রঙ-করা পাখি,
তোর কাছে ছিল না কি—
কত তারা, বন, সিন্ধু, আকাশ অপার!
জননীর কোল হতে কেন তবে কেড়ে নিলি!
লুকায়ে ধরার কোলে ফুল দিয়ে ঢেকে দিলি!

শত-তারা-পুষ্প-ময়ী
মহতী প্রকৃতি অয়ি,
নাহয় একটি শিশু নিলি চুরি করে—
অসীম ঐশ্বর্য তব
তাহে কি বাড়িল নব?
নতুন আনন্দকণা মিলিল কি ওরে?
অথচ তোমারি মতো বিশাল মায়ের হিয়া
সব শূন্য হয়ে গেল একটি সে শিশু গিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিদাঘরজনী

বিশল্য-কারিণী রাত্রি, যবে লক্ষ কুসুমে কুসুমে
উৎসারিত হয় মধু, ডোবে আমাদেরও নিদ্রালস
চেতনা, দুচোখ মুদে আধোজাগরিত স্বচ্ছ ঘুমে
অনুভব করি তার জাদুকরী রোমাঞ্চরভস!

নক্ষত্রে নক্ষত্রে জ্বলে আরও সম্মোহনী ইন্দ্রজাল;
অস্পষ্ট নিশীথকরে রঙ ধরে ছায়ার শরীরে;

অভ্যস্ত লগ্নের তরে প্রতীক্ষায় এদিকে সকাল
সারা রাত ইতস্তত ঘুরে মরে স্বর্গের বাহিরে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জেরার দ্য নের্ভাল

ঘোড়াগুলো জিরোনোর পর

যেতে-যেতে ক্ষণিক বিরতি, গাড়ি থেকে নেমে এলে,
কি ভেবে বাড়ি ছুটোর মাঝরাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে,
ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে থির পথ ঠেলে শেষে,
দেখে-দেখে শ্রান্ত চক্ষু, অবয়ব ক্লান্তির আবেশে।

হঠাৎ সম্মুখে দেখো উন্মোচিত এক উপত্যকা,
সবুজে সবুজে ছাওয়া আর্দ্র পাটল পুষ্প ঢাকা,
ঝাউকুঞ্জে বয়ে যায় একটি তটিনী গুঞ্জরিত
গর্জমান জনপথ অচিরেই সম্পূর্ণ বিস্মৃত।

তৃণপর্ণে শুয়ে তুমি শোনো নিজ জীবনের স্বর,
হরিৎ খড়ের গন্ধে চৈতন্য তোমার মূর্ছাতুর,
চিন্তালেশশূন্য তুমি চেয়ে রও ঊর্ধ্ব আকাশে যে……
হায়! কে বেসুরো বলে : মশাইরা, সবাই উঠে গেছে!

সুপর্ণা সেন

লুক্সেমবুর্গের পথে

সে তো গেল চলে মিলিয়ে, নহুলী বালা,
পাখির মতন থির্‌থিরে চঞ্চলী,

হাতে কাঁপে ফুল ঝলমলে রঙে আলা,
অধরে সে কোন্ নতুন গানের কলি।

বিশ্বে হয়তো সে একমাত্র, সে-ই
মন দিয়ে মনে তুলতে পারত সাড়া,
একবার শুধু চোখ তুলে তাকালেই
প্রদীপ্ত হতো আমার আঁধার-কারা!

কিন্তু না—আজ আমার দিনাবসান··
বিদায়, রশ্মি, দ্যুতি কমনীয় তেজে—
সৌরভ, নব কামিনী, ঐকতান···
ভাগ্য রহে না—এবং চলে গিয়েছে!

সুপর্ণা সেন

আলফ্রেদ দ্য মুসে

বিরহিনীর গান

সুকুমার ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা চলেছ সমরে,
তুমি কি কাজের তরে
ছুটে যাও অতদূরে?
দেখছ না তুমি রাত্রি অন্ধ গহন
এবং পৃথিবী আনে অগণন
বিপত্তি ঘুরে ঘুরে?

তুমি শুধু ভাবো ছিন্ন প্রেমের স্মৃতি
মুছে যাওয়াটাই রীতি
মন থেকে সব ছোঁয়া—

হে যশাভিলাষী হায় হায় হায়
মুহূর্তে দেখো ভেসে চলে যায়
তোমার উড়ানো ধোঁয়া।

সুকুমার ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা ছুটে যাও রণে
আমাদের ছেড়ে কোন প্রয়োজনে
সুদূরে চলেছ মিতা?
অশ্রুতে ভিজে ভাবা ভালো লাগে কেউ
শ্রবণে জাগায় ঢেউ
কী মধুর হাসো দয়িতা!

মানস রায়চৌধুরী

তেয়োফিল গোতিয়ে

শিল্পকর্মে বাড়ে মাধুর্য
শ্রম দিয়ে করো সৃষ্টি যদি তা,
এবং ধৈর্য—
মিনা, মর্মর, মণি ও কবিতা।

বাধা বিপত্তি সবই অনিত্য!
যদি যেতে চাও দুর্মরগতি
দৃঢ়পিনদ্ধ
উপানৎ-আঁটো, হে সরস্বতী।

চুলোয় যাক্ না সরল ছন্দ
ঢিলেঢালা জুতো, যে-কোনো চাষাড়ে
যাতে আনন্দে
পা ঢুকিয়ে ফের তুলে নিতে পারে।

ভাস্কর, করো পরিবর্জন
সেই কর্দম, যা অঙ্গুষ্ঠ
করে না ধারণ,
অথবা যখন নও ধ্যানস্থ।

বিরল কারারা-ধাতুমর্মর
এবং দুরূহ পারিয়া-পাথরে
হও তৎপর,
রেখার শুদ্ধি যারা রাখো ধরে;

সাইরাকিউস খ্যাত সে ব্রোঞ্জে
আছে যে ধাতব বর্ণাভা, হোক
তারি মতন যে
তোমার গরিমা তোমার আলোক।

কমনীয়তায়, নিবিড় খেয়ানী
এঁকে তোলো তুমি পর্যুৎসুক
দামি সোলেমানি
পাথরের গায়ে অ্যাপোলোর মুখ।

জল-জল রঙ চেয়ো না শিল্পী,
কিংবা যে রঙ পালায় চকিতে,
আগুনে গলাবি
এনামেল তোর মহাচুল্লিতে।

রচো নীল-নীল কুহকিনী যত,
শতধা তাদের পুচ্ছবাহার
করো পুঞ্জিত,
গড়ো জলসার মাতাল হাজার।

ত্রিস্তর সেই জ্যোতি অদৃশ্য
সুকুমারী মাতা এবং যীশুর,
গড়ো সে বিশ্ব
ক্রুশকাঠ সুব্যাপ্ত সুদূর।

সবই মুছে যায়। শুধু কালসীমা
পেরিয়ে সুঠাম শিল্প অমর
একটি প্রতিমা
পার হয়ে যায় শ্রেষ্ঠ নগর।

মজুর হঠাৎ রাস্তা চলতে
পেয়ে যায় বহুমূল্য মোহর
মাটির মধ্যে
নৃপতি মহান্ যাতে সুগোচর।

মরে এমন-কি সুরবৃন্দ,
তবু পিত্তল যথা, ততোধিক
দৃঢ় অতীন্দ্র
পদাবলী, তার ঋজু আঙ্গিক।

বিঁধে তোলো, গাঁথো, তক্ষণে মাতো,
যেন অস্ফুট স্বপ্ন তোমার
ফোটে অবদাত
কঠিন পাষাণে দীপ্ত সাকার॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সাগরে প্রেম

আমরা এখন প্রেমের দেশে, তবে,
বলো এখন কোথায় যাব আর?

থাকবে হেথা ?— যেতে কোথাও হবে ?
পাল তুলে দিই ?   ধরি তবে দাঁড় ?
নানান্ দিকে বহে নানান্ বায়,
ফাগুন চিরদিনই ফাগুন হায়,
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা তায়,
এখন বলো, কোথায় যাব আর ?

চুমার চাপে যে দুখ গেছে মরি',—
অস্ত সুখের শেষ নিশাসে ভরি', --
প্রসাদ পবন মোদের হবে সে ;
ফুলে বোঝাই হবে নৌকাখান্,
পন্থা মোদের জানেন ভগবান,
আর জানে সে কুসুম-ধনু যে !
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায়,
এখন বলো, যাব আর কোথায় ?

মাঝি মোদের প্রণয়-গাথা যত,
ধ্বজে দুটি কপোত প্রণয়-ব্রত,
সোনার পাটা, সোনার হবে ছই,
রশারশি রসিক জনের হাসি,
নয়নকোণে রবে রসদ রাশি,
রসদ রবে অধরপ্রান্তে সই !
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায় !
এখন বলো, যাব আর কোথায় ?

কোথায় শেষে নামাব, বল্, তোরে,—
বিদেশী সব যেথায় নিতি ঘোরে ?
কিংবা মাঠের শেষে গাঁয়ের ঘাটে ?—
যে দেশে ফুল ফোটে অনল মাঝে ?
কিংবা যেথায় তুষার বুকে সাজে ?
কিংবা জলের ফেনার সাথে ফাটে ?

প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায়!
এখন বলো,— যাব আর কোথায়?

কয় সে ধীরে "নামিও মোরে সেথা,
প্রেমের পাখি একটিমাত্র যেথা;—
একটি শর, একটিমাত্র হিয়া!"
তেমন পুরী যেথায় আছে, হায়,
নরের তরী যায় না গো সেথায়;
নারী সেথায় নামতে নারে, প্রিয়া!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

লকঁৎ-দ্য-লিল্

গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

মধ্যাহ্ন, গ্রীষ্মের রাজা, মহোচ্চ সে নীলাকাশে বসি'
নিক্ষেপিল রৌপ্যজাল, বিস্তৃত বিশাল পৃথ্বী 'পরে;
মৌন বিশ্ব; দহে বায়ু তুষানলে নিশ্বসি' নিশ্বসি';
জড়ায়ে অনল-শাড়ি বসুন্ধরা মূরছিয়া পড়ে।

ধূ ধূ করে সারা দেশ; প্রান্তরে ছায়ার নাহি লেশ;
লুপ্তধারা গ্রাম-নদী! বৎস গাভী পানীয় না পায়;
সুদূর কানন-ভূমি (দেখা যায় যার প্রান্তদেশ)
স্পন্দন-বিহীন আজি; অভিভূত প্রভূত তন্দ্রায়।

গোধূমে সর্ষপে মিলি' ক্ষেত্রে রচে সুবর্ণ সাগর,
সুপ্তিরে করিয়া হেলা বিলসিছে বিস্তারিছে তারা;
নির্ভয়ে করিছে পান তপনের অবিশ্রান্ত কর,
মাতৃক্রোড়ে শান্ত শিশু পিয়ে যথা পীযূষের ধারা।

দীর্ঘ-নিশ্বাসের মতো, সন্তাপিত মর্মতল হতে,
মর্মর উঠিছে কভু আপুষ্ট শস্যের শীষে শীষে ;
মন্থর, মহিমাময় মহোচ্ছ্বাসে জাগিয়া জগতে,
যেন গো মরিয়া যায় ধূলিময় দিগন্তের শেষে।

অদূরে তরুর ছায়ে শুয়ে শুয়ে শুভ্র ধেনুগুলি
লোল গল-কম্বলেরে রহি' রহি' করিছে লেহন ;
আলসে আয়ত আঁখি স্বপনেতে আছে যেন ভুলি',
আনমনে দেখে যেন অন্তরের অনন্ত স্বপন।

মানব ! চলেছ তুমি তপ্ত মাঠে মধ্যাহ্ন সময়ে,
ও তব হৃদয়-পাত্র দুঃখে কিবা সুখে পরিপূর !
পালাও ! শূন্য এ বিশ্ব, সূর্য শোষে তৃষামত্ত হয়ে,
দেহ যে ধরেছে হেথা দুঃখে সুখে সেই হবে চূর।

কিন্তু, যদি পারো তুমি হাসি আর অশ্রু বিবর্জিতে,
চঞ্চল জগৎ মাঝে যদি থাকে বিস্মৃতির সাধ,
অভিশাপে বরলাভে তুল্য জানো,— ক্ষমায় শাস্তিতে,
আস্বাদিতে চাহ যদি মহান্ সে বিষণ্ণ আহ্লাদ,—

এসো ! সূর্য ডাকে তোমা, শুনাবে সে কাহিনী নূতন ;
আপন দুর্জয় তেজে নিঃশেষে তোমারে পান করে,—
শেষে স্নিগ্ধ জনপদে লঘু-করে করিবে বর্ষণ,
মর্ম তব সিক্ত করি' সপ্তবার নির্বাণ-সাগরে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তিনটি সূত্র

আমি বিস্মৃতবলাকার মতো সাগর পারে
যেতে চাই রেখে দয়িতারে এইখানে,

সে তবু তিনটি সোনালি সুতোর স্বেচ্ছাচারে
এ-হিয়া আমার ধরে রাখে পিছুটানে।

চাহনি যে তার একটি সূত্র, আরেক সুতো
হাসি তার, আর তৃতীয়টি তার মুখের রাঙন,
দীর্ঘসূত্রী হবার রাস্তা উপদ্রুত,
সূত্রাকারেও হতে যে পারিনে বজ্র-আঁটন।

বাঁধন খুলে যে উড়ে যেতে চাই তড়িৎগামী,
পর্দা নামুক আক্ষেপে অনুরাগে,
তিনটি সুতোর শৃঙ্খলে বুঝি মরব আমি;
তবু কোনো সুতো ছিঁড়তেও ভয় লাগে!

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শার্ল বোদলেয়র

স্তোত্র

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার।

বাতাসের সত্তার লবণে
বাঁচায় সে জীবন আমার,
তৃপ্তিহীন আত্মার গহনে
গন্ধ ঢালে চিরন্তনতার।

শাশ্বত সৌরভ মাখে হাওয়া
কৌটো থেকে, কোনো প্রিয় ঘরে;

সঙ্গোপনে, কোনো ভুলে-যাওয়া
ধূপদানি জ্বলে রাত্রি ভরে।

কেমনে, অন্যের প্রেম, ধরি,
ভাষায় তোমাকে অবিকার,
এক কণা অদৃশ্য কস্তুরী
অসীমের গহ্বরে আমার।

সে-উত্তমা, সুন্দরীতমারে,
স্বাস্থ্য আর আনন্দ আমার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার।

বুদ্ধদেব বসু

প্রতিষঙ্গ

প্রকৃতি, মন্দির এক : স্তম্ভরাজি, প্রাণের কম্পনে
মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট প্রলাপে দেয় সংকেত ছড়িয়ে ;
সেখানে মানুষ আসে প্রতীকের অরণ্য পেরিয়ে
সে-অরণ্য দেখে তাকে অনুক্ষণ অভ্যস্ত নয়নে।

বহু ভিন্ন প্রতিধ্বনি—দূরাগত, গভীর, অন্তর,
অবশেষে খুঁজে পায় অন্ধকার, গাঢ় সমতান,
নিশীথের মতো ব্যাপ্ত, স্বচ্ছতার মতো মহীয়ান
সেই মতো বর্ণ, গন্ধ পরস্পরে জানায় উত্তর।

কোনো-কোনো গন্ধ যেন অর্গানের নিস্বনে কোমল,
প্রেইরির সবুজে মাখা, শিশুর পরশে সুখময় ;
অন্যেরা—বিজয়ী, খিন্ন, কলুষিত, ঐশ্বর্যে উচ্ছল,

এনে দেয় অসীমের আদিগন্ত বিরাট বিস্ময়—
অম্বর, কস্তুরী, ধূপ, পরিকীর্ণ গম্ভীর লোবান
গুঞ্জরে আনন্দময় আত্মা আর ইন্দ্রিয়ের গান।

বুদ্ধদেব বসু

এক শব

কী আমরা দেখেছিলুম হঠাৎ পথের মোড়ে
গ্রীষ্মমধুর দিনে,
শিলার শয়নে গলিত জন্তু রয়েছে প'ড়ে—
প্রেয়সী, পড়ে কি মনে?

আর্দ্র নারীর ধরনে শূন্যে পা দুটি তোলা,
তাপে, ঘামে বিষ কীর্ণ,
লজ্জাবিহীন, উদাসীন ভাবে উদর খোলা,
বিকট বাষ্পে পূর্ণ।

প্রকৃতির দান এ-পূতিপুঞ্জে বাঁধবে ব'লে
রৌদ্ররশ্মি জ্বলছে,
ফিরে দেবে শত খণ্ডে, যা তিনি মহৎ বলে
মিলিয়েছিলেন গুচ্ছে;

উত্তম শব, আকাশ দেখছে দৃষ্টি মেলে,
ফুটন্ত ফুলের মতো,
এমন তীব্র গন্ধ, ভেবেছ হঠাৎ ট'লে
ঘাসে প'ড়ে যাবে না তো?

ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি প'চে-ওঠা গলা জঠর ছেয়ে;
আর নামে, অবিরল,

মন, কালো স্রোতে সপ্রাণ, ছেঁড়া টুকরো বেয়ে
কৃমির সৈন্যদল।

আর এই সব ওঠে আর পড়ে ঢেউয়ের মতো,
কাঁপে আচমকা স্বননে ;
যেন সে-শরীর, শিথিল বায়ুতে নিশ্বসিত,
জীবিত পুনর্জননে।

সে এক জগৎ, অদ্ভুত সুর ঝরে তা থেকে,
যেন জল গতিমন্ত,
কিংবা বাতাস, কিংবা কুলোয় ঘুরিয়ে ঝেঁকে
শস্য বাছার ছন্দ।

যত আছে রূপ, স্বপ্নে সকলই বিলীয়মান ;
আর, বিস্মৃত পটে,
শিল্পীর কৃতি, বিকল্পহীন স্মৃতির দান,
ধীরে রেখা ওঠে ফুটে।

দূরে, অস্থির কুক্কুরী এক, রুষ্ট চোখে
আমাদের করে লক্ষ,
কখন ফিরিয়ে নেবে কঙ্কালপিণ্ড থেকে
তার খণ্ডিত ভক্ষ্য।

—আর তবু তুমি, তুমিও হবে এ-বিষ্ঠাধারা,
জঘন্য কীটপংক্তি,
আমার স্বভাবী সূর্য, আমার চোখের তারা,
দেবদূত, সংরক্তি !

তা-ই হবে তুমি, অন্ত্য কৃত্য সাঙ্গ হলে,
ওগো লাবণ্যপ্রতিমা,

যবে, অস্থির আধারে, নশ্বর ফুলের তলে
বিনষ্ট হবে তনিমা।

তাহলে, রূপসী, বোলো সে-কৃমির বংশে, যার
চুম্বন করে গ্রাস,
আমি বাঁচিয়েছি ধ্বস্ত প্রেমের আকৃতি, আর
স্বর্গীয় নির্যাস।

বুদ্ধদেব বসু

আত্মস্থতা

হে আমার দুঃখ, তুমি প্রাজ্ঞ হও, স্থৈর্য নাও শিখে।
চেয়েছিলে সন্ধ্যারে ; আসন্ন সে যে, এই তো আগত :
ধূমল মণ্ডল এক নগরীকে ক্রমে দেয় ঢেকে,
শান্ত কারো মন, আর অন্য কেউ দুশ্চিন্তায় নত।

এখনই ছুটুক ওরা— ক্ষমাহীন জল্লাদ, প্রমোদ,
চালায় চাবুক মেরে যে-কুৎসিত, ক্লিন্ন জনগণে,
ফুর্তির গোলামি করে অনুতাপে তার পরিশোধ
দিক তারা ;— দুঃখ, এসো, হাত রাখো হাতে। চলো দুইজনে

যাই বহুদূরে। চেয়ে দেখো, আকাশের বারান্দায়
নিঃশেষ বৎসর সব ঝুঁকে আছে প্রাচীন সজ্জায় ;
দম্ভময় মনস্তাপ জল থেকে ধীরে তোলে মাথা ;

এদিকে মুমূর্ষু সূর্য শয্যা নেয় মেঘের তোরণে ;
আর, যেন পূর্বাকাশে দীর্ঘায়িত শবাচ্ছাদ পাতা,
সেইমতো, শোনো প্রিয়, রাত্রি নামে মধুর চরণে।

বুদ্ধদেব বসু

সন্ধ্যার সুর

ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্পন্দিত-সচেতন
বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস ;
ধ্বনিতে গন্ধে ঘূর্ণি লেগেছে, বায়ু করে হাহুতাশ,
সান্দ্র ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন !

বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস,
শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন ;
সান্দ্র-ফেনিল মূর্ছাশিথিল নৃত্য-আবর্তন !
সুন্দর-ম্লান, বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ।

শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন,
অগাধ আঁধার নির্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস ;
সুন্দর-ম্লান বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ,
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য হয়েছে অদর্শন !

অগাধ আঁধার নির্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস,
ধরার পৃষ্ঠে মুছে গেছে শেষ আলোকের লক্ষণ ;
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য হয়েছে অদর্শন,
স্মৃতিটি তোমার জাগিছে হৃদয়ে, পড়িছে আকুল শ্বাস।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শত্রু

আমার যৌবন ছিল নিরুদ্দিষ্ট ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটি
সূর্যের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে তীব্র তীর এখানে-ওখানে
বিদ্যুত-বিচূর্ণ মাটি, বৃষ্টির প্রহার, সেই ত্রুটি
এমন মৃত্তিকা মৃত ফল অতি দুর্লভ উদ্যানে।

অধুনা যেহেতু পাশে হৃদয়ের শারদীয়া সুর
নতুন কর্ষণে মাটি সুনিশ্চিত করব উর্বর।
বন্ধ্যা অনুর্বর ভূমি প্লাবিত, যা নিতান্ত বন্ধুর,
আগ্নেয়গিরির সত্তা—যেথা সমাধির শূন্য স্বর।

কিশোরী পুষ্পের অর্ঘ্যে স্বপ্নসহচরী যারা রাতে
এই একই মৃত্তিকায় পরিস্রুত সমুদ্র-সংঘাতে
পাব কি রহস্যময় প্রেরণায় তরুণ উদ্যম?

যন্ত্রণা যন্ত্রণা শুধু! সময় হেনেছে মৃত্যুবাণ
হৃদয় চিবিয়ে খায় নিষ্ঠুর দৈত্যের পরিশ্রম
রক্তকে সমৃদ্ধ করে কাড়ে তার স্পর্ধিত সম্মান।

আলোক সরকার

স্তেফান মালার্মে

নীলিমা

নিরপেক্ষ নীলিমার নির্বিকার, নির্মল বিদ্রূপ,
মদালস পুষ্প যেন, সাংঘাতিক সৌন্দর্য ছড়ায়
অনর্থক বিড়ম্বনা অভিশপ্ত প্রতিভার যূপ,
যন্ত্রণার মরুপথে আমি কবি ছুটি নিরুপায়॥

• •

ছুটি নিমীলিত নেত্রে; তবু বেঁধে নিষ্কবচ বুকে
লক্ষ্যভেদী দৃষ্টি তার, রুদ্র অনুশোচনার মতো।
কোথায় লুকাব এই নিদারুণ অবজ্ঞার মুখে,
কই তম, অন্ধ তম, পুঞ্জ পুঞ্জ, সমুখ, বিতত?

মাথা তোলো, কুজ্ঝটিকা ; মেলো শূন্যে মিলন চীবর ;
করো, পরিকীর্ণ করো বিরঞ্জন বিভূতির কণা :
ডুবুক সে-পাংশুস্তূপে হেমন্তের রসস্থ প্রান্তর ;
অচিরে সমাধা হোক নৈঃশব্দ্যের মণ্ডপ-রচনা ॥

বৈতরণী পঙ্ক ছেড়ে, উঠে এসো তুমিও, নির্বেদ ;
দু-হাতে কুড়িয়ে আনো বর্ণচোরা শৈবাল, কর্দম :
শতচ্ছিদ্র নভস্তলে লেপে দাও স্তরে স্তরে ক্লেদ,
পায় না প্রবেশপথ আর যাতে দুষ্ট বিহঙ্গম ॥

পুনর্বার লুপ্তপ্রায় বাষ্পোচ্ছ্বাসে বিষণ্ণ সরণী ;
কজ্জলীর কারাগার দিগ্বিজয়ে বদ্ধপরিকর ;
বীভৎসের অবরোধে ম্রিয়মাণ পীত দিনমণি ;
আসন্ন অনাদি অমা ; নির্বাপিত নক্ষত্রনিকর ॥

মরে গেছে মহাকাশ। চাই আমি তোমাতে আশ্রয় ;
আমাকে ভোলাও, জড়, নিষ্করুণ আদর্শ ও পাপ।
যে-গড্ডলিকার স্রোতে মানুষের আত্মপরিচয়
নিশ্চিহ্ন, পাতুক তাতে শেষ শয্যা আমার সন্তাপ ॥

কারণ প্রাচীরমূলে অধোমুখ বর্ণভাণ্ড-বৎ,
নিরিক্ত আমার মর্ম ; অন্তর্যামী আর রূপে, রসে
সাজাবে না কোনোদিন ক্রন্দসীর মৌন মনোরথ ;
তাই খুঁজি বিস্মরণ মরণের জৃম্ভিত রহসে ॥

বৃথা অব্যাহতিভিক্ষা। নীলিমাই আবার বিজয়ী ;
উন্মুখর তারই মন্ত্র মন্দিরের জীবন্ত ঘটায় ;
কানে কাংস্য প্রতিধ্বনি ; অসূর্যের সুস্নিগ্ধ মাভৈ
অন্তরিত অকস্মাৎ হৃদয়ের ক্ষিপ্ত উৎকণ্ঠায় ॥

কুয়াশার অন্তরালে চক্রবর্তী, প্রাগৈতিহাসিক,
সে মাপে আমার মৌল বিবিক্তির কণ্টকিত সীমা।
কোথায় পালিয়ে বাঁচি ? বিদ্রোহ কি সর্বত্র বাতিক ?
নীলিমানিমগ্ন আমি ; চতুর্দিকে নীলিমা, নীলিমা॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সমুদ্রসমীর

দেহ দুঃখময়, হায় ! সব শাস্ত্র করেছি নিঃশেষ।
উড়ে যাওয়া বহু দূরে ! জানি মহাকাশের আবেশ,
সিন্ধুর অচেনা ফেনা আপ্ত বলে বলাকা মাতাল !
কিছু নেই : যেমন প্রাচীন কুঞ্জ, চোখের দুলাল,
আমার সমুদ্রমগ্ন হৃদয়ের উদ্ধারে অক্ষম,
হে শর্বরী, রিক্ত কাগজের শুক্ল স্বগত সংযম
বিবিক্ত প্রদীপে, তথা স্তন্যদায়ী যুবতী তেমনই !
প্রস্থানে প্রস্তুত আমি ! দোলা লাগে মাস্তুলে ; তরণী,
উঠাও নোঙর, চলো পরকীয়া প্রকৃতির খোঁজে !
নির্বেদ যদিও নিঃস্ব, প্রত্যাশার দশচক্রে মজে,
রুমালী বিদায়ে তার আস্থা তবু হয়নি নির্মূল !
এবং ঝড়কে ডাকে জাতিস্মর ওই যে মাস্তুল,
হাওয়ার দমক ওকে হয়তো-বা নোয়াবে আবার
সে-অগাধে, যার কোলে বানচাল নৌকার কাতার,
মাস্তুল ঘুচিয়ে, আসে, ভোলে কামদ্বীপের প্রশ্রয় ·
কিন্তু নাবিকের গান কী মধুর সেখানে, হৃদয় !

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ফনের দিবাস্বপ্ন

ওই অপ্সরীরা, মন চায় ওদের চিরায়ু দিতে ॥

কী স্বচ্ছ ওদের কান্তি, আবহের পুঞ্জিত গ্লানিতে
ভাসে যেন ঊর্ণাজাল ॥

ভালোবেসেছিলুম তবে কি
স্বপ্নকেই ?

প্রতর্ক, প্রাক্তনরাত্রি, সাঙ্গপ্রায় দেখি,
সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায়, অবশিষ্ট বাস্তব বনানী
জানায় নির্জনে যাকে জয়শ্রীর অর্ঘ্য বলে মানি,
তার আখ্যা অনুরাগ গোলাপের স্বভাবদোষেই ॥

তবু ধরো···

সে-বর কিশোরীদের পরিচয় এই
হয় যদি যে তারা তোমারই ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞান
পরিণত সচিত্র পুরাণে !   বিনির্গত ওই ধ্যান
আপাতকুমারী প্রথমার, সাশ্রু নির্ঝরের মতো
ইন্দ্রনীল, হিমনেত্র থেকে : পক্ষান্তরে ক্রমাগত
দীর্ঘশ্বাসে দ্বিতীয়া কি স্মরণে আনে না দ্বিপ্রহরে
উত্তপ্ত হাওয়ার স্পর্শ রোমশ শরীরে ! কিন্তু জ্বরে
মূর্ছাপন্ন স্নিগ্ধ অহনার পরবর্তী চেতনাকে
পিষে পিষে মারে যে-নিস্তব্ধ অবসাদ, সে বিপাকে
আমার বাঁশিই শুষ্ক কুঞ্জে দ্রবস্বর ঢালে ; আর
একমাত্র বায়ু রেখারিক্ত চক্রবালে প্রেরণার
প্রকট, কপট, শান্ত প্রাণ, যা আমার বেণুরবে
প্রত্যুৎপন্ন, পরিকীর্ণ নির্জলা বৃষ্টিতে, তথা নভে
অধুনা পুনরারূঢ় ॥

সিসিলির নিস্তরঙ্গ হ্রদ,
যার তটে তটে আমি সবিতার প্রতিযোগী মদ
ধর্ষণে করেছি ব্যয়, হতবাক তুমি বিকসিত
স্ফুলিঙ্গের নিচে, বলো, "এখানেই ছিলুম ব্যাপৃত
"আমি প্রতিভাপালিত, ফাঁপা নল কাটায়, যখন
"দূরের শ্যামল উৎসে সমর্পিত দ্রাক্ষার হিরণ
"জন্তুনিভ শুভ্রতার অবিচল ঊর্মিতে উতলা
"হয়েছিল আচম্বিতে : কিন্তু যেই বাঁশরীর গলা
"ফুটেছিল বিলম্বিত আলাপে, অমনই পাখসাটে,
"মরালের ঝাঁক শূন্যে মিশে গিয়েছিল, না বিরাটে
"জলকন্যকারা ফিরেছিল ডুব সাঁতারেই…

জ্বলে
জড়জগৎ প্রখর প্রহরের তাম্রতাপে : স্থলে,
জলে, অন্তরীক্ষে অপর্যাপ্ত সেই কৌমার্যের লেশ
নেই, এমনকি নেই শিল্পসার সে-ষড়্জের রেশ,
যার অনুসন্ধানেই পলাতকাদের রূপকার
হারিয়ে ফেলেছে আজ ; আদি উন্মাদনায় আবার
নিজেকে জাগিয়ে তবে, পুরাতন আলোকের বানে
দাঁড়াব একেলা, ঋজু, হে পদ্মিনী, অপাপের ভানে
তোমাদেরই অন্যতম ॥

যে-মূক চুম্বনে, থেমে যায়
অনুলাপী অধরের প্রলাপরটনা, স্বস্তি পায়
বিশ্বাসহন্ত্রীরা, ততোধিক রহস্যনিগূঢ় ক্ষত—
অমর্ত্য দন্তের সাক্ষ্য—অথচ আমার অনাহত
বক্ষে স্বাক্ষরিত ; কিন্তু থাক বাক্যব্যয় ! সমুদার
যুগল বেতসই শুধু হেন মন্ত্রগুপ্তির আধার :
বিবিক্তির মর্মবাণী, পরিণত তারই দীর্ঘ স্বরে,
নীলিমাকে স্বধর্ম ভোলায় ; প্রতিবেশে যায় ঘুরে

রূপসীর মাথা, আত্মগত সঙ্গীতের নায়িকা সে
ভাবে আপনাকে, যদিও প্রকৃত পক্ষে, প্রতিভাসে
প্রত্যক্ষ উরুর কিংবা পৃষ্ঠাদির রূপান্তর করে,
বিশ্রম্ভের অস্থায়ী অন্তরা যেমন অমর মরে,
তাকে মেনে সার্থক তেমনই একতাল ওঙ্কারের
প্রতিধ্বনিগ্রহত অভাব ॥
তবে ফুটে ওঠো ফের,
হে যন্ত্রস্থ পলায়ন, পিশুন সিরিংস্, পুনরায়
স্ফূর্তির প্রয়াস পাও ইতস্তত বিতত জলায়,
যেথা তুমি আমারই প্রতীক্ষা-রত ! আমি জনরবে
অলজ্জিত, কাটাব অমেয় কাল দেবীদের স্তবে ;
কৃতবিদ্য প্রতিমাপূজায়, একাধিক বৈদেহীর
মেখলা খসাব : যেমন সন্তাপ ভুলে আমদির
বিতর্কবাদেই, আঙুরের শোষিত প্রসাদ ত্বকে
ফুৎকার ভরেছি, এবং প্রচুর হেসে, অপলকে,
মাতাল তৃষ্ণায়, সারা বেলা তাকিয়ে থেকেছি, তুলে
ধরে মহাকাশে ভাস্বর নির্মোক ॥

স্মৃতির পুতুলে
এসো, হে অপ্সরীবৃন্দ, প্রাণবায়ু ফুঁকি। "নলবন
"চিরে চিরে, আমার চাহনি বিঁধেছিল অতুলন
"তাদের গ্রীবায়, যার জ্বালা নিবারণে দিগ্বধূর
"দল ঝাঁপ দিয়েছিল লহরীতে, নির্লিপ্ত, নিষ্ঠুর
"শূন্যে আরণ্যক আর্তনাদ হেনে ; এবং অচিরে
"কুন্তলের মুক্তধারা হীরকের মথিত মির্মিরে
"বিভাব হারিয়েছিল ! আমি ছুটেছিলুম সে-দিকে ;
"কিন্তু পা, উচট লেগে, থেমেছিল যেখানে, সখীকে
"বাহুক্ষেপে বেঁধে, সখী (সম্ভাবিত অনৈক্যে আহত)
"অঘোরে ঘুমিয়েছিল। আনিনি বিয়োগ করগত

"সে অদ্বৈতে ; ছায়াবিড়ম্বিত এই গোলাপবিতানে
"নিয়ে এসেছিলুম তাদের, যাতে দিনেশের টানে
"বীতগন্ধ ফুলের মতোই, আমাদের উচ্ছ্বসিত
"রতিপরিমল উবে যায় দিবাশেষে।" বলাৎকৃত
কুমারীর ক্রোধ, উলঙ্গিনী উন্মত্তরভসে শুচি,
পিপাসিত অধরের তপ্ত স্পর্শে যেন বররুচি
বিদ্যুতের স্খলিত বিলাস, ভালোবাসি—ভালোবাসি
আমি আতঙ্কের সংবৃতিশরীরে হোক্ তা উদাসী
প্রথমার পদান্তে বা দ্বিতীয়ার দুরু দুরু বুকে :
উভয়ে সমান তারা নষ্ট অনভিজ্ঞার অসুখে,
একজন আত্মহারা যদিচ ক্রন্দনে ও অপরে
মাত্র বাষ্পাকুল। "আমার মহাপরাধ, দৈব-বরে
"যে-চুম্বন একাকার তথা আলুথালু, জয়োল্লাসে—
"যেহেতু তাদের ভয় ভেঙেছিল আমারই প্রয়াসে—
"যে সহযোগের জোট আমি চেয়েছিলুম ছাড়াতে।
"কারণ উদ্দীপ্তকাম জ্যেষ্ঠার সংক্রাম কনিষ্ঠাতে
"দেখা দূরে থাক, অগ্রবর্তিনীর গভীর আহ্লাদে
"যেই নিবাতে গেলুম আমার দীপক হাসি, সাধে
"আর সাধ্যে তৎক্ষণাৎ বিবাদ বাধাল বিধি : শ্বেত
"পালকের মতো অলজ্জ, সরল অনুজা সঙ্কেত
"থেকে পলাল সে-সুযোগে, আমার অঙ্গুলি ছিনিয়ে ;
"সঙ্গে সঙ্গে, গদ্‌গদ নির্বন্ধে কান পর্যন্ত না দিয়ে,
"কৃতঘ্ন শিকার খণ্ডাল শিথিল কণ্ঠাশ্লেষ ॥"

যাক

যা যাবার ; অনাগত সুন্দরীরা ভরাবে এ-ফাঁক,
জড়িয়ে আমার শৃঙ্গে কেশপাশ, আরামে তরাবে :
স্বসমুখ আদিরসে অলিদের মুখর করাবে
আমার বাসনা-স্ফুট ; নীলারুণ, সুপক্ব ডালিম ;
এবং যে-পরিপ্লুতি আমাদের শিরায় রক্তিম,

তার নিত্য নির্বিশেষে ধার্য নয় কে বসন্তসেনা।
কুঞ্জকে ছোপায় যবে ধূসরিত গোধূলির হেনা,
তোমার উৎসব, এট্না, নির্বাপিত পাতায় পাতায়
অন্তরিত হয় সে-সময়ে, আসে অমায়িক পায়ে
স্বয়ং ভীনাস্, পেরিয়ে লাভার প্রস্থ, অকস্মাৎ
নীরবের বজ্রনাদে ঘটে খিন্ন বহ্নির নিপাত।
ধরি ভুজে অপ্সরীরাজ্ঞীকে ॥

হা, শান্তি অনপনেয়...

কিন্তু বাক্যবিমুক্ত হৃদয়, তথা গুরুভার দেহ,
হার মানে শেষে মধ্যাহ্নের উদ্ধত মৌনের কাছে :
আর নয় দেবনিন্দা ; স্মরণের আনাচে কানাচে
তন্দ্রা জমে ; পাতি শয্যা তবে রুক্ষ বালুতে এ-বার,
এবং স্থরার জন্মপত্রে যে-গ্রহ প্রবল, তার
নিচে শুই, যথারীতি মুখ খুলে !

যমলা বিদায় !
আমাকে সে-ছায়া ডাকে, তোমাদের লুপ্তি যে-দ্বিধায় ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ছায়ামূর্তি

চাঁদের বিষাদ জমে। কিন্নরেরা অশ্রুধারাগীতে
স্বপ্নাকুল, ছড় হাতে, বাষ্পময় ফুলের শান্তিতে
মুমূর্ষু সারেঙ্গি থেকে মীড়ে মীড়ে বোনে অবিরত
নীলিমার পত্রদল বেয়ে ঝরা শুভ্র কান্না যত
—সে দিন পুণ্যাহ, পুণ্য সে তোমার প্রথম চুম্বনে ;
আমার প্রেমিক স্বপ্ন চায় তাই আত্মবিসর্জনে

আকণ্ঠ আঘ্রাণ, তাই মগ্ন মধুগন্ধে বিষাদের,
শোচনা যেখানে গত বঞ্চনা বা বিসংবাদের,
স্বপ্নের সঞ্চয়ে এক, সঞ্চয়ী যে তারই চেতনাতে।
তারপরে পথে ফিরি চোখ পেতে জীর্ণ ফুটপাথে,
যখন তোমার কেশে সূর্য বুনে সন্ধ্যার রবাবে
আসো তুমি, তোমার সে হাস্যময় দীপ্ত আবির্ভাবে
সচকিত আমি ভাবি ওড়্না-ভাস্বর এলো কি এ,
শৈশবসোহাগে সেই যে আমার সাঁঝঘুম নিয়ে
একদা আসত আধমুঠা হাতে ছড়াতে ছড়াতে
শাদা শাদা সুরভি নক্ষত্র কত তুষারসম্পাতে।

বিষ্ণু দে

সনেট

যখন ছায়ার সত্তা লীন তার অলঙ্ঘ্য নিয়মে
কয়েকটি প্রাচীন স্বপ্ন মজ্জাগত ইচ্ছা অসুস্থতা
গতায়ু হর্ম্যের নিচে মরণের যন্ত্রণাকাতর
সে আমাকে ভরে তার সাহজিক পাখার স্পন্দনে।

বিলাসিতা! মেহগনি দরবার নৃপতিতোষণে।
সেখানে বিখ্যাত মাল্য তাদের বিনাশে একীভূত।
তুমি কিছু নও শুধু গর্ব এক আঁধারে আবৃত
স্বকীয় বিশ্বাসে ভ্রান্ত সে-একক দৃষ্টির সম্মুখে।

আমি জানি নিশীথের অন্তিম দূরত্বে মহীয়ান
পৃথিবী বিমূর্ত করে এক জ্যোতি রহস্য দুর্লভ
এবং কুটিল কাল অল্পই অবোধ্য করে তাকে।

নিজের নিয়মে দেশ ব্যাপ্ত হোক অথবা না হোক
ক্লান্ত রুগ্ন আগুনের আবর্তে সাক্ষ্যের প্রয়োজনে
একটি তারার, তার শুভক্ষণে মহৎ জাগ্রত।

আলোক সরকার

আরেকটি হাতপাখা

(শ্রীমতী মালার্মেকে)

অয়ি মায়াবিনী, অমিশ্র আহ্লাদে
ডুব দিতে পারি তোমারি প্রতিবিধানে
তোমার হাতের সূক্ষ্ম উপাখ্যানে
পক্ষ আমার জুড়াও শুশ্রূষাতে।

বক্ষে আমার প্রত্যেক স্পন্দন
বহে আনে ঐ শীতল সমীরবায়
কারান্তরীণ বুকের আন্দোলন
মৃদু নুয়ে পড়ে দিগন্ত সীমানায়।

অস্থির করে!   একি বিস্তার কাঁপে
অস্বীকৃত চুম্বন যেই মতো
বিপুল জন্মে, ওষ্ঠপুটের অভাবে,
স্ফারিত হয় না, হয় না উপশমিত।

আনো যে-স্বর্গ তোমার মগ্ন বোধে
যেমন লাজুক হাস্য প্রোথিত থাকে
অথচ তোমার মুখের প্রান্ত হতে
স্রোতে চলে গাঢ় অভেদ বর্ষ্ম বাঁকে।

তটের গোলাপি রাজকীয় মর্যাদা
সান্ধ্য সোনায়।   এনে দিলে তুমিও তো
নিমীলিত এক বেপথু কাঁপন শাদা
আগুন-ঝরানো কাঁকনে সমন্বিত ॥

স্থপর্ণা সেন

পল ভেরলেন

নব্য অলংকার

ললিত শব্দের লীলা সকলের আগে কবিতায় ;
পয়ার সে বর্জনীয়; বরণীয় ছন্দে বিচিত্রতা ;
নিশ্চয় নির্ণয় নাই, গলে যেন মিলিবে হাওয়ায় ;
ভারে যাহা কাটে শুধু, রবে না এমন কোনো কথা।

যথা অর্থ সংজ্ঞা খুঁজে উদ্‌ভ্রান্ত না হয় যেন চিত ;
নাই ক্ষতি নির্ভুল শব্দটি যদি নাই পাওয়া যায় ;.
ব্যক্ত আর অব্যক্তের যুক্তবেণী মদির সঙ্গীত !
তার মতো প্রিয় আর নাহি কিছু নাহি এ ধরায়।

সে যেন বিমুগ্ধ আঁখি ওড়নার সূক্ষ্ম অন্তরালে,
স্পন্দহীন মধ্যাহ্নের সে যেন গো আলোক-স্পন্দন ;
সে যেন সন্তাপহারী শরতের সন্ধ্যাকাশ-ভালে
প্রদীপ ও দীপ্তিহীন নক্ষত্রের মৌন সংক্রমণ !

আমরা চাহি গো শুধু লীলায়িত 'ছায়া-স্থষমায়',
রঙে প্রয়োজন নাই, কি হবে রঙীন্ তুলি নিয়ে ?
'ছায়া-স্থষমা'ই শুধু বিচিত্রের মিলন ঘটায়,—
বাঁশি আর শিঙারবে,—স্বপনে স্বপনে দেয় বিয়ে।

নিষ্ঠুর বিদ্রূপ আর অশুচি বাচাল পরিহাস,—
পরিহার করো তুই প্রাণঘাতী ছুরির মতন ;
রন্ধন-গৃহের যোগ্য ও যে নীচ রসুনের বাস,
দেবতার (ও) পীড়াকর ; তাঁদেরো কাঁদায় অকারণ।

কবিতার কুঞ্জগৃহে বাগ্মিতা প্রবেশ যদি করে,—
বাগ্মিতার গ্রীবা ধরি, মোচড় লাগায়ো ভালো মতে ;
অনুশীলনের লাগি সাধু শ্লোক এনো ভাষান্তরে,—
সে কাজ বরঞ্চ ভালো ; কবিতারে মাঠে মারা হতে।

বাণীর লাঞ্ছনা, হায়, বর্ণনা করিতে কেবা পারে,—
অনধিকারীর হাতে কি দুর্দশা, বিড়ম্বনা কত !
হীরা, জিরা মিলাইয়া শিকল সে গেঁথেছে পয়ারে,
নির্জীব, বৈচিত্র্যহীন ;—অর্বাচীন অনার্যের মতো।

শব্দের ললিত লীলা,—সমাদর সর্বযুগে তার ;
উড়িয়া চলিবে শ্লোক মুক্তপাখা পাখির মতন !
পাওয়া যাবে সমাচার প্রয়াণ-চঞ্চল চেতনার,
আরেক নূতন স্বর্গ,—ভালোবাসা আরেক নূতন !

কবিতা সে হবে শুধু সংগীতে সংকেতে উদ্বোধন,—
আভাসের ভাষাখানি,—প্রভাতের মঞ্জিম বাতাস ;
দু'পাশে দোলায়ে যাবে গোলাপ কমল অগণন !
বাকি যাহা,—সে কেবল পণ্ডশ্রম, পাণ্ডিত্য-প্রয়াস।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

হৃদয়ী সংলাপ

পুরানো নির্জন পার্ক, চতুর্দিকে ছড়ানো তুষার
দুটি ছায়ামূর্তি এই মাত্র হল পার।

চক্ষুগুলি মৃতবর্ণ, ওষ্ঠাধর শ্লথ
ওদের গলার স্বর শোনা যায় না যেন ঠিকমতো।

পুরানো নির্জন পার্ক ভেসে গেছে তুষারের জলে
দুটি মৃত আত্মা এসে হারানো স্মৃতির কথা বলে।

—সে সব রোমাঞ্চ মুখ তোমার কি আজও পড়ে মনে?
—কেন তাকে জোর করে টেনে আনা আবার স্মরণে?

—বলো না, আমার শুধু নামে আজও কেঁপে ওঠো কিনা
এখনও তোমার স্বপ্নে আমার আত্মার ছবি কখনো ভাসে?—না।

—আহা! কি মধুর দিন, সে সব সুখের দিন অনির্বচনীয়
ওষ্ঠে ওষ্ঠ ঢেলে আমরা পুলকে কেঁপেছি, আহা! হয়তো আমিও।

—আকাশ কি তীব্র নীল ছিল, আর সাধ ছিল বিশাল বিশ্বাসে
—সাধ পরাজিত হয়ে উড়ে গেছে আঁধার আকাশে।

ওই ঘাস পার হয়ে চলে গেল দুজনে আবার
ওদের অস্ফুট কথা শুনল শুধু রাত্রির আঁধার।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পরম লগ্ন

ঝরে দুধ জ্যোৎস্না শ্বেত ধারা
ওই দূর বনের ভিতর;
শাখে শাখে সবুজ পাতারা
দুলে ওঠে, কার স্নেহ স্বর
মুখরিত বৃক্ষমূল ঘেঁসে···

প্রেয়সী, তোমাকে ভালোবেসে।

সরোবরে প্রতিবিম্ব পড়ে
অপরূপ উজ্জ্বল মুকুর ;
জারুলের ছায়ামূর্তি নড়ে
হাওয়ার ক্রন্দন বনময়···

এই তবে স্বপ্নের সময়।

গোলাকার আবৃত আকাশ
সেখানে বহুলবর্ণ তারা
কী বিশাল প্রশান্তি—উল্লাস
নিয়ে প্রবাহিত স্রোতোধারা
উদার শান্তির প্রস্রবণ

এই তো পরম শুভক্ষণ।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

পুষি ও মেয়েটা

মেয়েটা পুষিকে নিয়ে মেতেছে খেলায়
নয়নাভিরাম দৃশ্য—বড়ো চমৎকার,
দুধশাদা হাত আর দুধশাদা পায়
জমেছে কৌতুক মজা—রাত্রি অন্ধকার

মেয়েটা এমন দুষ্টু, কালো দস্তানায়
গোপন রেখেছে তার নখ তীক্ষ্ণধার!
কী উচ্ছল ভয়ংকর ছুরিকা শানায়
যেন গুপ্ত পদ্মরাগ মণি অলংকার।

পুষিও কেমন শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে সেজে
প্রখর নখরগুলি লুকিয়ে রেখেছে,
যদিও ঘুমন্ত নয় ইতর শয়তান…

এবং নির্জন ঘরে দেখো অলৌকিক
মেয়েটা ছড়াচ্ছে হাসি, বেজে উঠছে গান।
চারবিন্দু ফস্‌ফরাস জ্বলন্ত নির্ভীক।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

বনের দেবতা

পুরনো পাথুরে বনের দেবতা কে ঐ
মাঠের মধ্যে হেসে ওঠে হাহাকারে,
বলে : দুর্দিন পরিণামে হবে জয়ী—
মুহূর্তগুলি মিছে শুক্লাভিসারে।

আমায় এনেছে তোমায় এনেছে ধরে
শোকের তীর্থ এ যে—
এই প্রহরে, যে ঘূর্ণিপাখায় ওড়ে,
হাজার ঢাকের শব্দে যে ওঠে বেজে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পরিচিত স্বপ্ন

প্রায়ই আমার স্বপ্নে অসহ্য রহস্যময় মুখ
অপরিচিতার এক ; প্রিয়তমা, আমি তার প্রিয় ;
এবং নিত্যই নয় যথার্থ অপরিবর্তনীয়
তথাপি অনন্যা। ভালোবাসে, বোঝে প্রেমের স্বরূপ।

যেহেতু আমাকে জানে আমার হৃদয় মেলে বুক
একমাত্র তার-ই জন্য, আহা, আর নয় অদ্বিতীয়
একমাত্র তার-ই জন্য, এবং আমারও চিন্তনীয়
সে একা, ক্রন্দসী, জানে কোন হাতে জ্বলে শান্তিধূপ।

শ্যামলী অথবা শুক্লা, চাঁপার বরন ?—জানিনি তা।
তার নাম ?   মনে পড়ে সে তো ছিলো স্নিগ্ধা ও বিনীতা
সেই প্রেমিকার মতো সময় করেছে যাকে দূর।

মর্মর মূর্তির মতো দৃষ্টি তার প্রশান্ত গম্ভীর
এবং প্রণয়ী ডাক সুদূর নির্জন সৌম্য স্থির
রেখেছে প্রণতি এক ভুলে-যাওয়া পুরনো বন্ধুর।

আলোক সরকার

ত্রিস্তঁ করবিয়ের

ভ্রষ্ট

ওদের পেতে দাও আপন সাধারণতন্ত্র
স্বাধীন নাগরিক!   জোয়াল কাঁধে তুলে ওরা
মত্ত হোক নিজ নিভৃত শান্তির নীড়ের সন্ধানে
আমি ··আমি তো এক নিরালা কৃশকায় কোকিল।

আমার মন যেন হিজড়ে একটি, এ পায় না কোনোদিনও
সুখ ও উল্লাস, আমার কাছে তাই ওদের স্বরাজের
মূল্য কতটুকু ?   আমি তো চিরকাল
স্বাধীন, চিরকাল সঙ্গহীন।

আমার দেশ সে তো পৃথিবীবিস্তৃত
এবং যেহেতু এ পৃথিবী গোলাকার
আমার ভয় নেই দেখতে শেষ সীমা কোথায় এ গ্রহের···
আমার দেশ আমি যেখানে রেখে দেব থাকবে সেখানেই
যখন আমি উঠে দাঁড়াব সে সময়
আমার পদতলে থাকবে এই দেশ জলে বা স্থলভূমে।

যখন শুয়ে আছি, আমার দেশ যেন
একটি নির্জন পিষ্ট শয্যা ;
বুকের বন্ধনে সেখানে টেনে নেব
আমারই মতো এক আত্মাহীন
আমার অর্ধেক সত্তা, যে আসলে মেয়েমানুষ এক,
একটি নারী, যাকে পাই না আমি।

আমার বিশ্বাস সুড়ঙ্গের মতো স্বপ্ন যেন এক
আমার দিকলেখা অদেখা চিরকাল, গৃহের জন্য
দুঃখ পাই, যেন দুঃখ গ্রাস করে, একটি গৃহকোণ
কখনো হায় আমি, দেখিনি এ জীবনে।

ভেড়ার পাল যাক কারকাসোন থেকে সঠিক পথে
দূর টিম্‌বাকতু, আমার পথ যায় আমার পশ্চাতে
এবং ঠিক জানি ও যাবে চিরকাল, যেখানে যাব আমি
আমার পিছে পিছে।

মাথার পরে ঐ উচ্চে নীলাকাশে ওড়ে নিশান
রাজমুকুট চায়, এ শুধু বাতাসের ক্ষণিক ঢেউ তোলা
আমার কালো চুলে···যে কোনো ভাষাতেই
যুক্ত হতে পারি বক্তৃতায় আমি, অথবা প্রয়োজনে
শব্দহীন রবো।

ভাবনাগুলি যেন শুষ্ক নিশ্বাস। শুধু বাতাস
সারাটা পৃথিবীর বাতাস যত আছে, আমারই সবখানি
আমার কথাগুলি প্রতিধ্বনি যেন শূন্য, বাণীহীন,
এবং তাই যেন যথোপযুক্ত।

অতীত শুধু তাই যা আমি ভুলে গেছি
শুধু যা বেঁধে রাখে সে শুধু এক হাতে
অপর হাত ধরা, আমার স্মৃতি নেই
না, কোনো স্মৃতি নেই, সে শুধু গতিপথ
যা কিছু পার হয়ে এগিয়ে যায় তাই বর্তমান
ভবিষ্যৎ সে তো আগামীকাল সে তো আগামীকাল।

চিনি না কোনো লোক, আমি তো সেই যাকে নিজেই গড়ে তুলি,
মনুষ্যত্বের অহংকার বড়ো ঘৃণিত মনে হয়
নিজেকে কোনোদিন ভালোবাসি না আমি, করি না ঘৃণা।

জীবন যেন এক বালিকা, যে আমায়
আত্মসুখ চেয়ে নিকটে টানে
আমার সাধ তাকে ভাঙব, ছিঁড়ে দেব
বাসনা কেড়ে নিয়ে বানাব বেশ্যা।

দেবতাদল? আমি হঠাৎ জন্মেছি
হয়তো কেউ আছে, হয়তো…যদি তাঁরা
আমাকে খুঁজে নিতে চান্ তো সন্ধান
পাবেন দূরে কাছে।

মৃত্যু যেথা হোক, আমার দেশ রবে মুক্ত বিস্তৃত
আমার শবাধারে আচ্ছাদন দেবে
কেন বা আবরণ? যেহেতু পৃথিবীর

সকল ভাগ জুড়ে আমার দেশ, তাই আমার হাড়গুলি
সহজে নিজেরাই মিশবে পৃথিবীতে ··

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যাঙ্

একটা গান হাওয়াশূন্য রাতে···
চন্দ্র রাখে দীপ্র ধাতুর পাতে
ঘনশ্যাম আলেখ্য ক'খানা।

···একটা গান ; উচ্চকিত ঝনন্
প্রোথিত ঐ ঝাড়ের মধ্যে গহন
থামল। এসো, দেখবে, যায়-দেখা-না ··

একটা ব্যাঙ্ ! ছায়ায়। এ কোন্ ত্রাস
আমার কাছে, তোমার সেবক-সেনা ?
ঐ দেখো, সেই কবির পালক-ডানা ;
কাদার ওটা বুল্‌বুলি, সন্ত্রাস !

গায়। কেন এই শঙ্কিত সংঘাত ?
দেখো তো, ঐ ওরি চোখের আলো ?
উঁহু। শীতে পাথরতলায় গেল
* * *
ব্যাঙ, না·আমি ? আমিই। শুভরাত।

সুপর্ণা সেন

ঊষা

আমি গ্রীষ্মের ঊষাকে আলিঙ্গন করেছি।
প্রাসাদের শীর্ষে তখন কিছুই নড়ছিল না। জল ছিল নিথর। ছায়ার শিবির বনের রাস্তা ছেড়ে যায়নি। প্রখর উষ্ণ নিশ্বাস জাগিয়ে আমি হেঁটেছি; মণিমানিক তাকিয়ে দেখল, ডানা উপরে উঠল নিঃশব্দে।
মেটে পথ ইতিমধ্যেই ভরে উঠেছে তাজা অস্ফুট ঝলকে; তার মধ্যে প্রথম উদ্যম হলো একটি ফুল, যে তার নাম বলল আমাকে।
জলপ্রপাতে আমি হেসে উঠলাম, ঝাউ গাছের মধ্যে দিয়ে সে এলায়িত হলো : রূপালি চূড়ায় আমি দেবীকে চিনলাম। তখন একটার পর একটা গুণ্ঠন আমি খসিয়ে দিলাম। বীথির উপর, হাত নেড়ে। সমতলে, যেখানে আমি মোরগের কাছে তাকে চিনিয়ে দিলাম। বিরাট নগরীতে, গম্বুজ আর গির্জাচূড়ার মধ্যে দিয়ে সে পালাতে লাগল আর আমি নদীর পাথর-বাঁধানো ঘাটে ভিখিরির মতো তার পেছনে ছুটলাম।
রাস্তার চড়াইতে এক লতাগুল্মের বনের কাছে আমি তাকে তার গুণ্ঠনের স্তূপ দিয়ে ঘিরলাম এবং তার বিশাল শরীরকে অনুভব করলাম। ঊষা আর শিশু বনের নিচে ধরাশায়ী হলো।
যখন নিদ্রাভঙ্গ হলো তখন দ্বিপ্রহর।

অরুণ মিত্র

শহরের পথে

শহরে দেখা হলো তার সঙ্গে, কথা বললাম পরস্পর।

অন্ধকার ঘরে ছিলাম। ওরা বলল, আমার ঘরে সে এসেছে। দেখলাম সে আমারই শয্যাশায়িনী, পরিপূর্ণভাবে আমারই, অন্ধকারে! বাড়িটা পৈতৃক, তাই উদ্বেগবিদ্ধ হলো মন, বেদনায় ভরে গেল। আমার পোশাক শতচ্ছিন্ন আর বাস্তবজগৎবাসী এক নারী তার সব দিতে এসেছে, যদিচ তাকে ফিরে যেতে হবে। যন্ত্রণা, এক নামহীন যন্ত্রণা আমার শরীরে!

তাকে গ্রহণ করলাম, গড়িয়ে দিলাম বিছানা থেকে নিচে, উলঙ্গপ্রায়; এক অকথ্য দুর্বলতায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর, কম্বলের ওপর গড়াগড়ি গেলাম, অন্ধকার! বাড়ির অন্যান্য বাতিগুলো লাল হয়ে জ্বলে জ্বলে উঠল ক্রমান্বয়ে এবং সেই নারী অন্তর্হিত হলো। আমি কাঁদলাম, অজস্র। এতো অশ্রুর প্রয়োজন ছিল না ঈশ্বরের।

ঘুরে বেড়ালাম শহরের পথে পথে। আহা ক্লান্তি! স্বাদহীন রাত আর উড্ডীন সুখের মধ্যে ডুবলাম। এ যেন হিম শীতের রাত, তুষার, শেষবারের মতো নিষ্পেষণ করছে পৃথিবীকে। কাতর প্রশ্ন করলাম বন্ধুদের, সে কোথায়? মিথ্যে জবাব এলো। সেই জানালার সামনে গেলাম যেখানে প্রতিসন্ধ্যায় সে আসে। ছুটে গেলাম ঢালু বাগানের মধ্য দিয়ে। আমাকে তাড়িয়ে দিল ওরা। আর কাঁদলাম, সর্বক্ষণ, অজস্র। অবশেষে ধূলিধূসর এক জায়গায় এলাম এবং একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে শরীর থেকে সব অশ্রু নিঃশেষে ঢেলে দিলাম। তবু ফিরে এলো সেই ক্লান্তি, ফের।

প্রত্যহের জীবনে সে বিধৃত। তার মনে করুণার সেই মুহূর্ত ফিরে আসতে সীমাহীন কাল নিঃশেষ হয়ে যাবে, জন্ম নেবে নতুন নক্ষত্র।

ফেরেনি, কোনোদিন ফিরবে না। আমার ঘরে এসেছিল সে অনাহূত : ডাকিনি, ডাকতে পারতাম না কোনোদিন। এবারও কাঁদলাম, অজস্র, পৃথিবীর সব শিশুদের চেয়েও অধিকতর ॥

মৃগাঙ্ক রায়

শাশ্বতী

আবার ফিরে পেয়েছি তারে
কারে ?—শাশ্বতীরে।
সমুদ্র সে সূর্যে মেশে
মিলন-মন্দিরে।

মৃত্যুজয়ী আমারও মন
তোমারি মতে চলে,—
যদিও রাত প্রবঞ্চিত,
আগুনে দিন জ্বলে।

চতুর তুমি, তোমাতে তাই
যত্নে পরিহৃত
প্রাকৃত সুখ-দুঃখাবেগ—
তুমি অকুণ্ঠিত।

আশার পথে কখনো নয়,
উদয়-পথে নয়।

সাধ্য আর সাধনা সবই
বিড়ম্বনাময়।

আগামী চিরকালের তরে
আছে তো জানো প্রিয়,
রেশমে ঢাকা আগুন সেই
তোমার বহনীয়।

আবার ফিরে পেয়েছি তারে!
কারে?—শাশ্বতীরে।
সূর্য আর সমুদ্রের
মিলন-মন্দিরে!

লোকনাথ ভট্টাচার্য

স্বরবর্ণ

আ কৃষ্ণ, অ শ্বেতবর্ণ, ই রক্ত, উ সবুজ, ও নীল :
স্বরবর্ণ, একদিন তোমাদের গাঢ় পরিচয়
শোনাব : আ, কৃষ্ণ নীবিবাস, ক্রূর পূতিগন্ধময়
রোমশ মৌমাছি তারে অবিনয়ে স্ফীত করে, খিল

মহা গুহার; অ, বাষ্প অথবা শিবির ঋজুরেখ,
বল্লম হিমবাহের, শ্বেত রাজা, কম্প্র পুষ্পদল;
ই, লোহিত, রক্ত ইতস্তত, হাসি কোপন চঞ্চল
অথবা মদের শেষে ম্লান মধু অধরে ক্ষণেক;

উ, আকাশবৃত্ত, স্পন্দমান দিব্য সবুজ সাগর,
শান্তি তাপিত জীবের, যে-শান্তি নিখিল জাদুকর
আঁকে স্নিগ্ধতার রসে চিন্তাশীল কুঞ্চিত কপোলে;

ওঁ, পরম ভেরী বাজে তীক্ষ্ণধার অপূর্ব স্বরিত,
লোক-লোকান্তরে দেবযোনি-পুরে মৌন সচেতন :
ওমেগা, তোমার দৃষ্টি কাঁপে নীল কিরণ-হিল্লোলে।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

একটি আকাঙ্ক্ষা

তোর একটু আঙুলের টোকা লাগলে বেজে ওঠে ভেরী;
তার শব্দে মন্দ্রিত ভুবন, নব সংগীত সূচনা।
বারেক চরণ ফেললে নবীন যৌবন জাগে, সম্মিলিত উদ্ধত মিছিল। ওদিকে ফিরালি বেণী, অভিনব প্রেম! যদি এদিকে ফিরালি বেণী, অপূর্ব প্রণয়।
"প্রথম মুহূর্ত থেকে আমাদের নরক যন্ত্রণা, ত্রাণ করো," বলে, ওই শোন্ গুঞ্জিত শিশুরা, "কোথায় রয়েছে গূঢ় আমাদের ঐশ্বর্য বাসনা, কেবা গ্রাহ্য করে, তুই আমাদের আলোয় তুলে নে"— শোনো করুণ মিনতি।
আসছি বলে চিরকাল তুই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বেড়াবি!

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আমি ভবঘুরে

দুটি হাত ছেঁড়া পকেটে গলিয়ে পালিয়েছিলাম,
আমার বিশাল কোটখানা, তারও ছিরি তদ্রূপ,
আহা মরি, বড়ো মনোরম প্রেম স্বপ্নের রূপ—
উপরে আকাশ, বাগ্‌দেবী, আমি তোমার গোলাম।

প্রকাণ্ড এক ছিদ্র অদ্বিতীয় পাৎলুনে
যেতে যেতে বুড়ো আংলা বেঘোরে ছড়া আওড়াই

ওই দূর সাত ঋষিমণ্ডলে ঘর ছিল, তাই
আকাশনিবাসী তারাদের মুখ ফিসফিস। শুনে

আমি বসে পড়ি পথের উপর, কী মধুর রাত ;
মনে হয়েছিল আশ্বিন তার শিশিরের হাত
আমার কপালে ছুঁইয়েছে যেন মহুয়ার বাটি ;
আশ্বিন, দেখি ছায়াদের ক্রমে ঘন করে আনে—
ছেঁড়া জুতোটার ফিতে টান করে আমি মাঝখানে
বেহালার মতো বুকে ঠ্যাং রাখি, আর ছড়া কাটি ॥

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

জুল লাফর্গ

বুলভারে চৈত্রসন্ধ্যা

মস্ত বুলভারগুলোয় চৈত্রসন্ধ্যায় এক-বেঞ্চের উপর বসে, বিচিত্রা-বিপণির কাছেই। একটা কাফে বাতির আলোয় ভেসে যাচ্ছে। আগাগোড়া লাল একটি বেশ্যা মদ থেকে মদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তেতলায় একটা ঠাণ্ডা ঘরে অল্প আলো আর ক'টি মাত্র টেবিলে নত ক'জনার মাথা, ছোটো একটু ধ্যানের ছবি। তার উপরের তলায়, আলোয় চোখ ঝল্‌সানো, সবগুলো জানলা খোলা, ফুল, গন্ধ, একটা নাচের মহড়া প্রায় সারা। রাস্তার গাড়ি জমছে লোক বাড়ছে তার গোলমাল, টানা বারান্দাটা অনবরতই মানুষ গিলছে আর বমি করে ফেলছে, বিচিত্রা-বিপণির সামনেটাতেই প্রোগ্রাম পাবার জন্য যত হুলুস্থুল, গান শুনতেই পাওয়া যাচ্ছে না সেই কাড়াকাড়ির শব্দে কিন্তু, এই দশটি জানালার ধার দিয়ে সরে-সরে গেলেই দেখবে কৃষ্ণপুচ্ছ আর শাদা শার্টের

প্রান্ত নিয়ে মানুষগুলো গানের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে, নীল, গোলাপি, নীল লোহিত শাদা, সাজ-পরা মেয়েদের মৃদু সন্তর্পণে ধরে-ধরে ঘুরছে, আবার ঘুরছে, গম্ভীর, হাস্যরেখা-হীন মুখে (কিন্তু ওরা যে গান অনুসরণ করছে তা কেউ শুনতে পাচ্ছে না) জনকয়েক কোটনা ঘুরঘুর করছে, এ ওকে বলছে "দশ-দশ মোহর নগদ পেয়ে গেছে মেয়েটা, বুঝেছ হে" · বিরতির ফাঁকে বিচিত্রা-বিপণি থেকে লোকেরা ফেঁপে-ফুলে উঠে পড়ছে, বুলভারের নরক থামে না, গাড়ি, কাফে, আরো আরো বেশ্যারা ঝেঁকে ওঠে·· আমার একেবারে কাছটাতে একটা খবরের কাগজের স্টল, দুজন মহিলা গল্‌গল্‌ করে কথা বলছেন। একজন বলে উঠলেন: "মেয়েটাকে আজ আর রাত কাবার করতে হচ্ছে না, আমার বাছা হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে।" মেয়েপুরুষ পরস্পরকে চুম্বন করছে, যে যার আপন অনুভব, সমস্যা আর পাপ নিয়ে। এবং এ সবের উর্ধ্বে শান্ত, চিরন্তন নক্ষত্রপুঞ্জ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

মধ্যজুলাই, প্রদোষ, আটটা

এক পশ্‌লা বৃষ্টি, ছোটো-ছোটো জলা ভরে গেছে, কাদা মাটিতে সবুজ, হারিয়েছে সেই ভাঁজ সেই রেশ্‌মি নরম জল।

সমস্ত জুড়ে তিনটি একঘেয়ে শব্দ: রেলগাড়ির শিস্‌, আলিশায় নিচু পাতার গুচ্ছে কালো পাখির বাঁশি, আর গোরুর গলার ঘণ্টা।

এছাড়া আর সবই স্তূপীকৃত পাহাড়, বিস্তৃত পরিসর, আর ছাই-রঙা পাণ্ডুর আকাশ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বৈদ্যুতিক গহ্বর

তখন তারার মধ্যে আমি এক শিবির সদনে।

অকস্মাৎ, মাথা ঘুরে, বিদ্যুৎ-বোধিতে, জালায়নে
কেঁপে-কেঁপে উঠে আমি ভয়ে সারা, মনে এসে লাগে
সৃষ্টির প্রহেলি, স্বচ্ছ লাগে তার সব সমস্যাকে।
সকলই তবে কি এক ? আমি কোথা ? যে-পুঞ্জ আমায়
নিয়ে চলে, সে যাবে কোথায় ? যদি মরি, নিই ছুটি,
কিছুই কি জানব না ? বলো, উষ্মা ! সময় পালায়
ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে, ফেরে না তো ! আনন্দ বস্তুটি
প্রবেশ্য ? কি জানি, আমি কিছুই জানি না। তবে বুঝি
আমার প্রহর এলো ? কি জানি ! ছিলাম রাত্রে, কেন
জন্ম হলো ? বিশ্ব কোথা থেকে ? কোথা যায় ? সে-ঠিকুজি
কে বলবে, পুরোহিত ? তিনিও মানুষ। কেউ কোনো
কিছুই জানে না। এসো, চিরদিবসের ভাষ্যকার,
জীবনের অর্থ বলো, হৃদয়বিহীন ব্যাপ্তি, হায় !
একটি মুহূর্ত, অয়ি তারাপুঞ্জ, বাঁচাও, আমার
প্রতিভা, বাঁচাও। একি, ফের অনাবর্তে, শূন্যতায় ?

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

চাঁদের বিলাপ : মফস্বলে

আহা চাঁদ, কী সুগোল তোমার আনন,
যেন এক পুষ্ট থলি, ভরা যার আকণ্ঠ কাঞ্চন !

দূরে কে বাজায় শিঙে ; মূর্ছা যায় সুরের আফিম ;
কে যায় একলা পথে ? আমাদের ডেপুটি হাকিম।

কাতর পিয়ানো কাঁদে পথের ওপারে,
একটি বেড়াল দেখি ঘুরঘুর করছে চত্বরে।

নিদ্রামগ্ন মফস্বল নাসিকা-গুঞ্জনা,
বাতাসে মিলিয়ে যায় ব্যাঞ্জোর ব্যঞ্জনা,

পিয়ানো ঘুমোতে গেল সশব্দে জানলা বন্ধ করে,
বুঝি না বেজেছে কটা ফিকে অন্ধকারে!

মফস্বলে বাস যেন দ্বীপান্তর; হে প্রশান্ত প্রভু
তথাস্তু বলতে হবে তবু?

ওগো চাঁদ, হে শৌখিন চাঁদ,
সর্বত্র তোমার গতি, প্রবেশ অবাধ,

মিশৌরি নদীর জলে মুখ দেখে তুমি গতকাল
টপকে এসেছ দূর পারীর দেয়াল,

দেখেছ মোহন নীল নরওয়ের খাড়ি,
বরফে আবৃত মেরু, সাগরে ঢেউএর বালিয়াড়ি;

রেলের কামরায় তুমি উঁকি মেরে দেখছ এখন
নববিবাহিতদের প্রগাঢ় চুম্বন,

শুনেছ চলেছে তারা শেষে
পাণ্ডববর্জিত সেই স্কটিশ প্রদেশে

ভাগ্যিস গত শীতে তোলেনি সে কানে
আমার পত্রের স্পষ্ট মানে!

ভবঘুরে হে বাউল, বাউণ্ডুলে চাঁদ,
আমাকে স্তাঙাৎ করো, দাও গো প্রসাদ,

আশ্চর্য ঐশ্বর্যময়ী দেবী বিভাবরী,
মফস্বল শল্যবুকে দেখো আমি মরি।

বুড়ি চাঁদ শুনছে না, একেবারে চুপ,
দুকানে এঁটেছে বুঝি তুলোর কুলুপ।

জ্যোতির্ময় দত্ত

পল ক্লোদেল

উত্তাপ

নরকের চাইতেও কঠোর এই দিন।
বাইরে প্রচণ্ড সূর্য আর দৃষ্টি-অন্ধ-করা দীপ্তি সব ছায়াগুলোকে গ্রাস করে নিয়েছে, এতো শান্ত মনে হচ্ছে যেন জমে গিয়েছে সব। অনুভব করছি, চারিদিক ঠিক ততোটা সংজ্ঞাহীন নিশ্চল নয়, এক বিরতি অন্তরালে সক্রিয়। কারণ এই চার চান্দ্রমাসে পৃথিবী তার প্রজনন শেষ করেছে; সময় এসেছে যখন পুরুষ হত্যা করবে তাকে, উন্মোচন করবে সেই আগুন যা তাকে প্রজ্বলিত করত, অকরুণ চুম্বনে ঘৃণা জানাবে তাকে।
কী আর বলব? যদি এই অগ্নিশিখা ক্লান্ত আমার কাছে অসহনীয় হয়, যদি চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়, ঘেমে উঠি, যদি টলমল করি পায়ের তিনভাঁজ গ্রন্থির উপর ভর করে, এই নির্বাক পরিস্থিতিকে অপরাধী করব, কিন্তু এই পুরুষ সত্তা এক নির্ভীক আনন্দে উদ্ভাসিত। আমি স্পষ্ট অনুভব করছি! হৃদয় দ্বিধান্বিত কিন্তু এই ভীষণ মধুর ঈর্ষাকে অসামান্য ব্যতীত

কোনো কিছুই পরিতৃপ্ত করতে পারে না। পালিয়ে যাক সবাই মাটির গহ্বরে, সযত্নে রুদ্ধ বাসগৃহের সবগুলি ছিদ্র; কিন্তু মহান হৃদয়, ভালোবাসার তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে রুদ্ধশ্বাস হয়ে, আগুনকে, যন্ত্রণাকে আলিঙ্গন করে। সূর্য, দ্বিগুণিত করো তোমার শিখা, কেবল দাহন-ই যথেষ্ট নয়, গ্রাস করো আমাকে সেই যন্ত্রণা আমার কাছে তীব্রতম হবে না।
কোনো মালিন্যকেই রক্ষা কোরো না সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে,
আলোর দাহন থেকে অন্ধ রেখো কারুকে।

আলোক সরকার

বাণী প্রেরণারূপিনী

আবার! আবার সমুদ্র এলো আমাকে নিয়ে যেতে নৌকোর মতো,
আবার সমুদ্র আমার দিকে ফিরে এলো কোটালের বানে,
আমাকে সে উঠিয়ে নিল, ভারমুক্ত বজরার মতো ঘাট থেকে আমাকে নড়িয়ে দিল,
নৌকোর মতো, একটা রশি ছাড়া যার আর কোনো বাঁধন নেই, যে-নৌকো প্রচণ্ডভাবে নাচে, ঝাপটা মারে, টান দেয়, মাথা ডোবায়, উছলে ওঠে, টলমল করে,
বিরাট তেজীয়ান ঘোড়ার মতো, নাসারন্ধ্র টেনে যাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়, রণরঙ্গিণীর দেহভারে যে দুলে ওঠে যখন সে-রমণী একলাফে পাশ থেকে তার পিঠের উপর চড়ে বসে আর অট্টহাসি হেসে তার লাগাম ধরে হিংস্রভাবে!
আবার রাত্রি এলো আমায় খুঁজে নিয়ে যেতে,
সমুদ্রের মতো, যে নীরবে তার পূর্ণতায় পৌঁছয় সেই লগ্নে যে-লগ্ন অপেক্ষমান পোতে আকীর্ণ মানুষী বন্দরগুলোকে মেলায় মহাসাগরের সঙ্গে এবং আলগা করে দেয় ফটক আর বাঁধের আগল!

আবার যাত্রা, আবার নতুন সংযোগ, আবার দরোজা খোলে!
আঃ, মানুষদের মধ্যে যে-ব্যক্তি আমি সেজে থাকি সে আমাকে ক্লান্ত করেছে! এই তো রাত্রি! আবার জানলা খোলে!
আমি সুন্দর শ্বেত প্রাসাদের জানলায় চাঁদের আলোতে দাঁড়ানো সেই তরুণীর মতো,
যে বেপথু হৃদয়ে শোনে গাছের তলায় উল্লসিত শিস আর অস্থির দুটো ঘোড়ার শব্দ,
এবং গৃহের জন্যে তার আর কোনো মায়া থাকে না, সে যেন শরীর গুটিয়ে ধরা এক ছোটো বাঘ, তার সমস্ত হৃদয় জীবনের প্রেমে আর প্রবল মিলনান্ত শক্তিতে উচ্ছ্রিত!
আমার বাইরে রাত্রি আর আমার ভিতরে রাত্রির শক্তির উৎসার এবং গৌরবের আসব এবং কূলছাপানো এই হৃদয়ের টনটনানি!
আঙুর যে চাষ করে, মদ তৈরির কুণ্ডে প্রবেশ করলে সে যদি বিহ্বল হয়
তাহলে এমন কী করে হবে যে আমার কথার অজস্র আঙুরকে আমি নিষ্পেষিত করব
অথচ তার ভাপে আমার মাথা টলবে না!
আঃ, এই সন্ধ্যা আমার! আঃ, এই বিশাল রাত্রি আমার!
প্রথম নৃত্যোৎসবে তরুণীর কাছে আলোকিত কক্ষের মতো রাত্রির সমগ্র গহ্বর!
রাত্রি সবে আরম্ভ হলো! ঘুমোবার সময় আসবে আরেক দিন!
আঃ, আমি মাতাল! আমি দেবতায় সমর্পিত! আমার মধ্যে আমি শুনতে পাই এক কণ্ঠস্বর এবং দ্রুত দ্রুততর তাল, আনন্দের আন্দোলন।
দৈববাহিনীর আলোড়ন, দিব্য মাত্রায় শমিত পদক্ষেপ!
পৃথিবীর যত মানুষে আমার কী আসে যায় এখন! তাদের জন্যে আমি নির্মিত নই, আমি নির্মিত

এই পবিত্র তালের উন্মাদনার জন্যে!
বন্ধ মুখ শানাইয়ের চিৎকার! উৎসবের ঢাকের উপর ভোঁতা আওয়াজ!
তাতে আমার কী আসে যায়? খালি এই ছন্দ! ওরা আমায় অনুসরণ করুক বা না করুক, ওরা আমায় শুনুক বা না শুনুক, আমার কী আসে যায়?
এই তো কবিতার বিরাট পক্ষবিস্তার
কী বলছ তোমরা সঙ্গীতের কথা? আমাকে শুধু আমার সোনার পাদুকা পরতে দাও।
তার জন্যে যে আয়োজন লাগে তার কোনো দরকার নেই আমার। আমি চাই না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকো।
যে-সব শব্দ আমি ব্যবহার করি
সে-সব প্রতিদিনকার শব্দ, কিন্তু তারা একই শব্দ নয়!
আমার কবিতায় তোমরা মিল পাবে না, কোনো কুহকও না। এ তোমাদেরই বাক্য। তোমাদের এমন কোনো বাক্য নেই যা আমি আমার বলে গ্রহণ করতে পারি না!
এ পুষ্প তোমাদেরই পুষ্প অথচ তোমরা বলছ এদের চেনো না।
এবং এ চরণ তোমাদেরই চরণ, কিন্তু এই দেখো আমি সমুদ্রের উপর হাঁটছি, আমি বিজয়-গৌরবে সমুদ্রের জল মাড়িয়ে চলেছি!

অরুণ মিত্র

এদ্‌ম রস্তাঁ

আলোর ফুল

পায়রা রেগে গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, 'বোকো না, বোকো না, মোটে না, বোকো না।' ঠিক সেই সময় বেড়ার উপরে

ঝুপ করে এসে কুঁকড়ো বসলেন। পায়রা দেখলে মানিকের মুকুট আর সোনার বুক-পাটায় সেজে যেন এক বীরপুরুষ এসে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধ্যার আলো তাঁর সকল গায়ে পলকে পলকে রামধনুকের রঙ ধরে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে স্থির। মিষ্টি মধুর সুরে তিনি ডাকলেন, 'আ-লো। আ-লো। আ-লো।' তারপর তার বুকের মধ্যে থেকে যেন সুর উঠল, 'অতু-ল ফু-উ-ল। আলোর ফুল।' আলো, প্রাণের ফুলকি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এসো ফুলের উপর দিয়ে, এসো পাতায় লতায় ফুলে ঝিক্‌মিক্। আলোতে ঝিক্‌মিক্—দেখা দিক, সব দেখা দিক, ভিতরে থাক তোমার প্রভা, বাইরে থাক তোমার আভা, একই আলো ঘিরে থাক শত দিকে শত ধারে, অনেক আলোর এক আলো, অনেক ছেলের এক মা। বনের তলায় সোনার লিখা, সবুজ ঘাসে সোনার চুমকি, আলোর ফুলকি অ-তু-উ-ল অমূল আলো।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পল ভালেরি

সমাধি সমুদ্রপার্শ্বে

হে আত্মা আমার, তুমি অমর্তের জীবন খুঁজো না;
বরং যা করায়ত্ত, আপূর্ণ সম্ভোগ করো তারি।

—পিণ্ডার

পায়রার আনাগোনায় এই ছাত শান্ত নিরিবিলি,
কবরগুলোর ফাঁকে, ঝাউয়ের আড়ালে ঝিলিমিলি;
সঠিক মধ্যাহ্ন দেখি সেইখানে অগ্নিপুঞ্জ থেকে
সাগর, সাগর এক, নিরবধি অকূল বিস্তার,
একাগ্র চিন্তার পরে একি এ মহার্ঘ উপহার
সুদীর্ঘ প্রহর দেবদুর্লভ লগ্নের স্থৈর্য দেখে।

আলোর সুষমা, একি, পরিশুদ্ধ শ্রমে বিনির্মিত,
যাতে বহুমুখী হীরা সূক্ষ্ম ফেনপুঞ্জে বিচ্ছুরিত !
মনের গভীর শান্তি এইখানে স্বতঃপ্রকাশ,
যখন কিরণমালী সমাহিত সমুদ্রে শয়ান,
সুদীপ্ত সময়, স্বপ্ন হয়ে ওঠে ধ্রুব [illegible],
পরম উৎসের থেকে এ সবই মায়াবী প্রতিভাস ।

অটুট ঐশ্বর্য, বাণীমন্দির সহজ মহিমায়,
মূর্ত সমাহিত এক বাচংযম স্পষ্ট দেখা যায়,
দর্পভরে রহে জল, ঐ বহে ফল্গু অক্ষিপাতে
গভীর গভীর ঘুম অগ্নিময় আস্তরণতলে
হে আমার নীরবতা…অট্টালিকা আত্মার অতলে
সুবর্ণসোপান, ছাওয়া অসংখ্য সোনালি টালি ছাতে ।

কালের দেবায়তন, সংহত একটি দীর্ঘশ্বাসে,
অন্তরঙ্গ আমি এই দুর্গম শিখরে, চারিপাশে
আমার সমুদ্রস্পর্শী দৃষ্টির বিস্তৃত দিগ্বলয় ;
যেন দেবতার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য আমার,
সেইমতো প্রভাস্বর শান্তি আজ উদাসীনতার
রাজকীয় আড়ম্বর রচনা করেছে শূন্যময় ।

ফলের সম্ভোগে ফল যে রকম দ্রব হয়ে মরে,
মুখের বিবরে যথা সে-ফল বিলুপ্তি-অবসরে
জোগায় অপূর্ব রস, তেমনি আমার দ্রবমাণ
এই সত্তা ঘিরে ঘিরে গান গায় সমস্ত আকাশ,
সর্ব সীমা লুপ্ত হয়ে রূপান্তরে অসীম বাতাস,
কি আমার ভবিষ্যৎ, লভি তার বাষ্পিত আঘ্রাণ ।

হে সত্য হে সুন্দর আকাশ হেরো আমি জায়মান
অসহিষ্ণু দাহ শেষে, অদ্ভুত অথচ বলীয়ান্ ।

দীর্ঘ এক আলস্যের অবসানে আমি উৎসর্জন
করেছি নিজেকে এই মহোজ্জ্বল স্বর্লোকের কাছে,
মৃতের স্বপন ছুঁয়ে ছুটে যায় আমার ছায়া যে,
যেন প্রেতচ্ছায়া, প্রেত আমায় ঘিরেছে অনুক্ষণ।

সৌর সমারোহে ঐ উদ্ভাসিত উৎসবে আমার
সত্তা মেলে দেখি তুমি সুসজ্জিত, প্রাজ্ঞ চমৎকার
তোমার অহনা, আমি এই দেখে বিমুগ্ধ অবাক,
তোমাকে ফিরিয়ে দিই নিজ শুদ্ধ আশ্রয়ে তোমার,
তাকাও নিজের পানে···কিন্তু বোলো, দীপ্তিময়তার
অন্যদিকে অন্ধকার, ভয়াল ছায়ার অর্ধভাগ।

আহা, শুধু আমার, আমারই জন্য, গভীর অতলে
হৃদয়ের একান্ত সান্নিধ্যে, কবিতার উৎস-জলে,
শূন্যতা এবং শুদ্ধ ঘটনার অন্তসন্ধিক্ষণে
আমি খুঁজি প্রতিধ্বনি আমার নিহিত মহিমার,
তিক্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন, স্বনন-স্পন্দিত জলাধার
অগোচর আগামীর কথা বলে স্বগতকথনে।

কুঞ্জতলে হে কপট অন্তরীণ বন্দী, তুমি জানো,
লুপ্ত করো ব্যবধান, শীর্ণ এই কারাবাতায়নও,
আমার মুদিত চক্ষে দীপ্ত যেই রহস্যময়তা,
কোন্ দেহ আমাকে নামায় তার অবরোহে, আনে
কার দৃষ্টি আমাকে এ দেহাস্থি-ছড়ানো গোরস্থানে?
একটি স্ফুলিঙ্গ স্মরে আমার স্বর্গতদের কথা।

সংবৃত, উৎসর্গিত, অমূর্ত অনলে উৎসর্গিত,
মর্ত্যের ভগ্নাংশ এক আলোকের উদ্দেশে অর্পিত,
আমাকে ভোলাল অলাতচক্রবেষ্টিত এই মাটি,
স্বর্ণ ও উপলে সুনির্মিত, ঘনচ্ছায় মহীরূহ,

মর্মর প্রস্তরতলে কাঁপছে অগণ্য ছায়া-ব্যূহ,
বিশ্বস্ত সমুদ্র ছায় আমার যেখানে যা সমাধি।

হে দীপ্ত কুক্কুর, দূর করো যত পুতুলবিলাসী ;
যখন একাকী, মুখে লেগে থাকে রাখালের হাসি,
সারাক্ষণ আমি তো চরাই মেষ রহস্যজনক,
আমার তুষারশাদা শান্ত যত কবরের পাল,
যত পারি দূরে রাখি কবুতর ওয়াকিবহাল,
আকাশকুসুম বৃথা, দেবদূতদের প্রশ্ন-চোখ।

একবার এখানে এলে, ভবিষ্যৎ অলস মন্থর!
ধারালো পোকায় আঁচড়ায় শুকনো মাটির ওপর,
সবই দগ্ধ ব্যবহৃত, অবশেষে হাওয়ায় আহৃত
কোনো এক অনিরীক্ষ্য অনির্বচনীয় সমাধানে
জীবন মহাজীবনে ব্যাপ্ত, শূন্যতার সুরাপানে
মত্ত, তিক্ততাও স্বাদু, প্রাণমন স্বচ্ছ, অবারিত!

মৃতেরা শায়িত রয় এইখানে, মাটি অভ্যন্তরে
তাদের জোগায় তাপ, যা-কিছু রহস্য দগ্ধ করে।
ঊর্ধ্বে মধ্যদিন, স্থির মধ্যদিন আপন স্বরূপে
চিন্তামগ্ন, নিজের বিষয়ে আছে প্রকৃতিস্থ নিজে,
মস্তক মণ্ডলাকার পূর্ণায়ত কিরীটে ঝলিছে,
আমিই তোমার মধ্যে পরিবর্তমান চুপে-চুপে।

ত্রিভুবনে একমাত্র আমাকেই আতঙ্ক তোমার!
আমার অনুশোচনা, সংশয়, আমার স্বেচ্ছাচার
সে-ই একমাত্র খুঁত তোমার বিশদ হীরাটিতে,...
কিন্তু ওরা তাদের গভীর রাত্রে, আবৃত-মর্মর,
অস্পষ্ট মানুষগুলি গাছের শিকড়ে ছায়াচর,
তারা এলো ধীরে-ধীরে সবাই তোমার পক্ষ নিতে।

প্রগাঢ় নীরন্ধ্র এক মহাশূন্যে ওরা পরিণত,
লাল মাটি শুষে তাদের গৌরাভ কান্তি যত,
ফুলে-ফুলে চলে গেছে তাদের জীবনী-শক্তি আজ,
মৃতদের কথা বলবার সেই ভঙ্গিটি কোথায় ?
ব্যক্তিগত শিল্প ?   সেই স্বকীয়ত্ব ব্যক্তিসত্তায় ?
ঘনাত যে-চোখে অশ্রু, সেইখানে কীটের স্বরাজ।

কামার্ত রমণীদের উচ্চৈঃস্বরে রতিকলোল্লাস,
চোখ, দন্তরুচি, ঢাকা আঁখিপক্ষ্মে বাষ্পল আভাস
এবং আগুন নিয়ে ক্রীড়ারত বক্ষ মনোহর,
অধরঅর্পণ-ক্ষণে চকিত রক্তের শিহরণ,
আঙুলে-আঙুলে সেই ঘিরে-রাখা পরশরতন,
সবই যায় মৃত্তিকায়, মেতে ওঠে খেলার ভিতর।

হে মহান্ আত্মা, বলো হেন স্বপ্ন আছে কি তোমার,
সোনা কিংবা ঢেউ আনে যেই প্রতিবিম্বের সম্ভার
বর্ণাঢ্য ছলনা এনে মুগ্ধ করে দর্শনেন্দ্রিয়
বাষ্প হয়ে যাবে যবে তুমি কি তখনো গাবে গান ? •
চেয়ে দেখো, ক্ষয় পায় সকলই, আমিও ম্রিয়মাণ
রিপুরন্ধ্রে। এমন কি মরে যায় ঐশী অতৃপ্তিও।

অমরত্ব আসলে বড়োই কৃশ, কৃষ্ণ ও সোনায়
স্তম্ভিত করে সে জয়পত্রসাজে, সান্ত্বনা যে দেয়
মৃত্যুর ভিতর নাকি দেখতে পেয়েছে মাতৃক্রোড়—
সুন্দর বঞ্চনা জানি, বিচক্ষণ ছলাকলা হায় !
কে না জানে এর অর্থ বলো কে বা এড়াতে না চায়
করোটি এবং সনাতন বিদ্রূপের হাসি ওর ?

সমাহিত হে পিতৃপুরুষবর্গ, সেই সব মাথা
পরিত্যক্ত, উপরে লাঙল-চষা জমি আছে পাতা,

যারা এই মাটি হয়ে পায়ে-পায়ে আমাদের টানে,
যে প্রকৃত মাংসভুক, এবং অপ্রতিরোধ্য কীট
সে নেই প্রস্তরতলে সুপ্ত, জীবনেই উপস্থিত,
খায় সে আমার মাংস, লেগে থাকে পিছনে সমানে।

প্রেম? সম্ভবত। নাকি ঘৃণা করে আমার আমিকে
গোপন দংষ্ট্রায় তার ঝুঁকে রয় সে আমার দিকে,
এমন ভঙ্গিতে যেন যে-কোনো নামেই তাকে সাজে!
বস্তুত কি না করে সে, দেখে, ইচ্ছা করে, ছুঁয়ে দেখে,
আমার শরীর তাকে খুশি করে, আমার শয্যাকে
জুড়ে শোয়, সেখানেও সে আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছে।

জেনো, হে নিষ্ঠুর জেনো, এলিয়া-নিবাসী দার্শনিক!
তোমারই চিন্তার শরে আমাকে বিঁধেছ, তামসিক
সেই শর কেঁপে ওঠে, ওড়ে তবু ওড়ে না আবার,
ঐ শব্দে জন্ম নিই, কিন্তু ফের মরি শরাঘাতে,
হায় সূর্য…আমার এ সত্তা কোন্ কূর্মের ছায়াতে
গতি ভোলে, অ্যাকিলিস পদক্ষেপ সত্ত্বেও অসাড়!

না, না…উত্তিষ্ঠত…এসো যাই সমাসন্ন কালান্তরে,
হে দেহ আমার, এই বিষণ্নতা ফেলো চূর্ণ করে!
বক্ষ, তুমি সতেজ বাতাস নাও ঝলকে ঝলকে,
আসে ঐ সাগরের ঠাণ্ডা হাওয়া, আমার আত্মাকে
আমাকে ফিরিয়ে দেয় লবণাক্ত মহাপ্রাণ জাগে,
চলো যাই ঢেউয়ে ঢেউয়ে পুনর্বার ফিরি প্রাণলোকে।

তাই বটে, মহাম্বুধি উন্মত্ত প্রলাপে শক্তি ধরে,
চিতল বাঘের ছালে ডোরাকাটা আঙ্‌রাখার 'পরে,
অজস্র সূর্যের কত চিত্রকল্প প্রগাঢ় ভাস্বর
হে অজরামর সর্প, নিজের নীলাভ মাংসে বুঁদ,

আর এ কেমন তীব্র সংক্ষোভের মতন অদ্ভুত
স্তব্ধতায় নিজপুচ্ছে নিজে তুমি দিচ্ছো কামড় !

হাওয়া লাগে···তবে এসো বাঁচবার চেষ্টা করবই,
আমার বইটা খুলে বন্ধ করে বাতাস অথৈ ;
কোন্ দর্পে ফেনপুঞ্জ পর্বত স্ফারিত করে আসে !
যা উড়ে যা উচ্চকিত আমার পুঁথির পৃষ্ঠা যত !
হে চলোর্মি ! পালগুলি ঠুকরে-দেয়া পায়রার মতো
আকীর্ণ যে-ছাদে তার নিস্তব্ধতা ভাঙো জলোচ্ছ্বাসে ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জনান্তিকে

কী কাজ করো তুমি ?—সবই তো করে থাকি ।
মূল্য কত, বলো ।—মূল্য ? মুশকিল !
যেমন এই ধরো বিরাগ তিল-তিল
পূর্ণ জ্ঞান আর অরুচি দ্বেষ ফাঁকি···
মূল্য কী তোমার ?—তা বলা মুশকিল···
কী চাও ?- কিছু না ; তা সবই তো নিয়ে থাকি ।

কী তুমি জানো, বলো ।—বিরক্তির সীমা ।
করো কী সর্বদা ?—স্বপ্ন দেখি খালি ;
এবং ঘটে আছে বুদ্ধিভরা ডালি—
তা দিয়ে রাতি কম্নি ঊষার রক্তিমা ।
করতে পারো কিছু ?—স্বপ্ন দেখি খালি,
তাতেই দূর হয় মনোরচিত অমা ।

কী চাও, ঠিক বোলো ।—আত্মমঙ্গল ।
জানো কি কোনো পথ ?—তা-ই তো খুঁজি রোজ—

সব যে ঘিনঘিনে নষ্টামির ভোজ,
তাই জ্ঞানের বল খুঁজি অনর্গল।
তাহলে কিসে ভয়?—ইচ্ছে, তার তেজ।
তুমি কে?—অভাজন, কেউ না, দুর্বল।

কোথায় চলেছ হে?—বিলুপ্তির কাছে।
সেখানে করবে কী?—থাকবো পড়ে মৃত;
সেখানে আর নয়, যেখানে অবিনীত
দিনের পর দিন পচব একই নাচে।
যাচ্ছ কোনখানে?—কবরে নিশ্চিত।
কবরে? সেখানে কী?—মৃত্যু জেগে আছে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এমানুয়েল সিনিওরে

ওড়ে ওর দুটি

ওড়ে ওর দুটি কালো ঘোড়া বায়ুপথে
অথচ কেমন দুচোখ, ঝল্‌মলায়
সুভদ্রা ঐ বসেছে রজত রথে,
সে পরিপূর্ণ ষোড়শী এ সন্ধ্যায়!
গোলাপগুচ্ছ, স্বর্গীয় উজ্জ্বল
মুখখানি, জ্বালে আমার শয্যাতল।

রথাগ্রে ঐ বসে আছে, তার মাথা
অরত্নিপরে ঝুঁকে রয় আল্‌গোছে:
ঢেউ এসে ওর ভিজায় চোখের পাতা
বুক দুটি তার অপূর্ব শুভ্র যে।

মধুমাসে অয়ি কৌমুদী ভাস্বতী
অবধান করো চারণ কবির প্রতি ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

মাক্স জাকব

মৌনতার অরণ্যে

মৌনতার অরণ্যে এখনো রাত্রি নামেনি।
বিষাদের তীব্র বায়ুপ্রকোপ হতে পাতাগুলি এখনো অনাহত
মৌনতার অরণ্যে কিন্নরীদল নিরুদ্দেশ। তারা আর ফিরবে না।

মৌনতার অরণ্যে নির্ঝরিণীতে ঢেউ নেই কারণ স্রোতের চলাচল প্রায় জলবিহীন এবং গতিপরিবর্তনশীল।

মৌনতার অরণ্যে এক আঁধারকালো গাছ রয়েছে তার আড়ালে মাথার মতো একটি ঝোপ জ্বলন্ত, জ্বলন্ত সে রক্ত ও সোনার লেলিহান শিখায়।

মৌনতার অরণ্যে, যেখানে কিন্নরীদল আর ফিরে আসবে না, সেখানে তিনটি কালো ঘোড়া উপস্থিত; এগুলি সেই বিজ্ঞ নৃপতিদের তিন কালো ঘোড়া এবং তাঁরা আর ঘোড়াগুলি অধিকার করে নেই, তাঁরা নিরুদ্দেশ, কেবল ঘোড়াগুলি পরস্পর মানুষের মতো কথা কইছে।

উৎপলকুমার বসু

আবার নির্মাণ করি

এই তো যথেষ্ট নীল জামা গায়ে এক পাঁচ বছরের শিশু ছবি আঁকুক অ্যালবামে যেন এক দুয়ার আলোয় খুলে যায়, যেন এক দুর্গ পুনর্গঠিত হয় এবং পাহাড়সানুর শুষ্ক পাটলতা ঢেকে যায় ফুলে।

উৎপলকুমার বসু

স্মৃতিলিখন থেকে

ইন্দ্রজাল ছড়ানো বয়সে : বনের গহীনে বাড়ি চকমেলানো
দেখেছি সেখানে আমি বিয়াত্রিচে
সমান বয়সী দোঁহে জোড়-মেলানো
দেখেছি দান্তে সেই বিয়াত্রিচে
আমার প্রথম কথা শেষ মেলানো
চুলের গহীনে ডোবা বিয়াত্রিচে
ভার হলো সাহস তো তবু মেলানো,
পড়াতে কবিতা তাকে, বিয়াত্রিচে।

যন্ত্রণাবিক্ষত বয়সে : শুধু অভিধান ডিগ্রি পাওয়ার নেশা
টাকার জন্যে হন্যে কীটের দিন
বিয়াত্রিচেও নিয়ে নায়িকার পেশা
রঙ্গালয়ের মঞ্চে বাজায় বীন্
এই কথা আমি ইদানীং অবহিত
মেয়েরা এখন যেন স্ফীংসের মতো,
খাঁচার গরাদ পেরিয়ে নিক্ষেপিত
বাছা বাছা কটি পুরুষ আহারে রত।

শাদা চুলের বয়সে : অলকে কলপ বিয়াত্রিচেকে ফের
আবার পেলাম কেতাদুরস্ত ঘরে

ড্রইংরুমের ঘনিষ্ঠতায় ঢের
শোনালেম ঠোঁটে অমায়িক হাসি ধরে
যুবক বয়স এবং সে সব প্রেম,
"—আহা তাই নাকি ? ভারি কুতূহল জাগে"
নিস্পৃহ স্বরে বল্লে সে তবু ভাবি,
"মাঝে মাঝে বুড়ি, ভারি বোকা তোকে লাগে।"

কবিতা সিংহ

গীওম আপোলিনের

লালচুল সুন্দরী

সকলের সামনে এই আমি কাণ্ডজ্ঞান আছে যার এমন মানুষ
জীবন যে জানে আর মৃত্যুর যা জানা যায় তাও জানে
অনুভব করেছে যে যন্ত্রণা ও প্রেমের পুলক
মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে নিজের ভাবনা
কয়েকটা ভাষা যার জানা
দেশ মন্দ দেখেনি যে
গোলন্দাজ পদাতিক বাহিনীতে যুদ্ধও করেছে
মাথায় জখম হয়ে ক্লোরফর্মের পর কাটাছেঁড়া করিয়েছে
ভয়ংকর লড়াইতে শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের হারিয়েছে
পুরনো এবং নতুনের যতখানি জানা যায় আমি জানি
আজ আমাদের মধ্যে আর আমাদের জন্যে যুদ্ধ এই
এ নিয়ে ব্যগ্র না হয়ে আমি হে বন্ধুরা
ঐতিহ্য এবং আবিষ্কার শৃঙ্খলা দুর্গম খোঁজা এই দীর্ঘ
বিবাদের বিচার সহজে করি।

ঈশ্বরের মুখের ছাঁদে তোমাদের মুখ গড়া
যে মুখ শৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছু নয়

তোমরা আজ আমাদের আর যত শৃঙ্খলার অবতারদের
তুলনা যখন করো আমাদের ক্ষেমাঘেন্না করে নিও
আমরা যারা সর্বত্রই দুর্গমকে খুঁজি।
তোমাদের শত্রু আমরা নই
আমরা চাই নিজেদের দিতে এক বিশাল আশ্চর্য রাজ্য
পুষ্পে পুষ্পে যেখানে রহস্য ফোটে যার ইচ্ছে করবে সে চয়ন
যেখানে নতুন আলো যার রঙ কখনো দেখেনি
হাজার অচিন্ত্য ছায়াচর
তাদের বাস্তবে আনতে হবে
নিত্য আমরা হৃদয় সন্ধান করি সে এক বিরাট দেশ
যেখানে নীরব সব কিছু॥

এবং সময় তাকে বিতাড়িত করা চলে ফিরিয়েও আনা যায়
আমাদের নিশ্চয় করুণা কোরো আমরা যারা সর্বদাই
লড়ে চলি ভবিষ্যৎ আর সীমাহীন এ দুয়ের সীমানায়
আমাদের ভুলভ্রান্তি আমাদের পাপ করুণার চোখে দেখো।

এই তো এসেছে গ্রীষ্ম রুদ্র ঋতু
আমার যৌবন মৃত যেমন বসন্ত মৃত আজ
হে সূর্য এ এক গাঢ় প্রদীপ
যুক্তির অন্তকাল।

আমার প্রতীক্ষা থাকে
অনুগামী হব বলে যতক্ষণ না সম্মুখে স্পষ্টত
সে ধরে অপূর্ব কায়া আমি ভালোবাসি শুধু তাকে
সে আসে আমাকে টানে যেন টানে চুম্বক লোহাকে
তার রূপ মনোহর লাগে
লালচুল সুন্দরীর মতো।

সোনার কুন্তল তার বলা চলে
যেন চিরন্তন বিদ্যুতের প্রভা নভস্তলে
কিংবা যেন আগুনের শিখা ঝলকিত
শুক্‌নো কাঠগোলাপের পাপড়িতে বিধৃত।

আমাকে দেখিয়ে হাসো হাসো
পৃথিবীর যত লোক বিশেষত এখানকার যারা
কারণ কত যে বস্তু রয়েছে যা তোমাদের বলতে ভয় পাই
এত সব বস্তু তোমরা যা আমাকে বলতেই দেবে না
তোমরা কোরো আমাকে করুণা।

অরুণ মিত্র

আমার ছিল সৎসাহস

আমার ছিল সৎসাহস পিছনে তাকাবার
আমার সেই দিনগুলির প্রেত
আমার পথে চরণ রাখে, তাদের নিয়ে কাঁদি
কেউ বা শুয়ে ইতালিয় গির্জেতে অথবা
জামির গাছের ছোটো ছোটো বনানীতে
যে সব গাছে ফুল ফোটে ফল ধরে
একই সঙ্গে প্রত্যেক ঋতুকে
সে সব দিন কেঁদেছিলাম মরার আগে পান্থনিকেতনে
যেখানে সব উদ্দীপিত স্তবের স্তবক শুকিয়ে এসেছিল,
কবিতা যে জুগিয়েছিল সেই মোহিনীর চক্ষের সম্মুখে
বিদ্যুতের গোলাপ যত আবার প্রস্ফুটিত
আমার স্মৃতির মায়াকানন ঘিরে॥

সুপর্ণা সেন

সমতলে চলছে

সমতলে চলছে ঘোড়সওয়ার
তন্বীটির তা দেখে মনে পড়ে
মিতিলেনের সেই যে নৌবহর
লোহার পাতে ঝল্‌মলানি ঝরে

যেমনি তারা গোলাপ হুতভুক
চয়ন করে চক্ষে বিস্ময়
স্মিত মুখে সঞ্চরমাণ মুখ
আহা কেমন স্বর্ষ মনে হয়।

স্বপর্ণা সেন

অনুতাপী গ্রানাদ-রমণীরা

সেইখানে দুইজন গ্রানাদা শহরে
তোমার একক পাশে ক্রন্দন করে
এখানে আমরা ছুঁড়ি বোমা হাতে ধরা
তখনই বদ্‌লে হয় ডিম উর্বরা

যেহেতু মোরগ জন্মে শিশু অকৃত্রিম
পরিপূর্ণ ঘৃণা তারা করে মুক্ত গানে
কেমন মোহন হয়ে আছে সে-ডালিম
আমাদের সকলের ভীষণ বাগানে।

কমলেশ চক্রবর্তী

ধরা

ধরব ঐ সন্ধ্যা আর পাথরের স্থির মূর্তিটাকে,
ধরব ছায়া আপেল ঐ দেয়াল আর রাস্তার সীমাকে !

ঘুমন্ত মেয়ের গ্রীবা ধরব, তার পা-ও মৃদু চাপে,
তারপর হাত খুলব । কত পাখি ছাড়া পেয়ে যাবে ;

কত পাখি হারিয়ে হয় রাস্তা আর সন্ধ্যা আর ছায়া,
দেয়াল আপেল আর পাথরের অচঞ্চল কায়া ।

হাত, তোমরা ক্ষয়ে যাবে ঠিক
বিষম এই খেলায় ।
কাটতে হবে তোমাদের একদিন
তীক্ষ্ণ ছুরির ফলায় ।

ডাগর চোখেরা তোমাদের
বসাল কে বলো না ও-মুখে ?

বলো দেখি কোন্ জাহাজের
তোমরা নাবিক বলো বলো ।
কখন আঘাত লেগে থেমে
অপেক্ষায় রয়েছ এমন
নিষ্পলক খোলা সারাক্ষণ ?
কঠিন আড়াল দিয়ে ঘেরা
কালো শিখা অবাক তাকিয়ে
ঝড়ের কানুন তবু মানো ।

মরীচিকা বন্দী তোমরা শোনো,
যখন নিশুতি রাত হবে
পাতা দুটো একটু নামিও,
আবার সাহস পাবে তবে।

*

তার দিকে এসেছিলে, হে বিশাল প্রান্তরের মেয়ে
কামনার গূঢ় গ্রন্থি, রোদে রোদে বিছানো বিস্তার।

যেই তার মন্থর মুখ অবশেষে হল কাছাকাছি
তোমার দু-ঠোঁট যেন মুহূর্তে তুষার হয়ে গেল।

কথা বলছিলে তুমি অবিরাম, বিবর্ণ কথারা
জমছিল তারই কাছে, মৃতির হাজার লক্ষ কথা।

লোকটাকে তুমি এক পাথরের ভবন বানালে
দেখতে উজ্জ্বল, কিন্তু রাতদিন অন্ধ হয়ে খাড়া

দেয়ালে একটাও ছোটো জানলা সেকি ফোটাতে পারে না,
একটা দরজাও যাতে বাইরে যাবে দুই পা এগুনো ?

আমাকে যখন সবই ছেড়ে চলে যায়
তখনই তাদের ধরা, করি কী উপায় ?
কোন্ হাত দিয়ে ধরব এই ভাবনাকে ?
অবশেষে দিনটার ঘাড় শক্ত করে
ধরব কোন্ হাত দিয়ে ? খরগোসের মতো
ঝটপট দিনটাকে ধরে রাখব বলো
কোন্ হাতে ? আমার কি সেই হাত আছে ?
আয় ঘুম তুই আয়, আমি তোর মিতা,
আমায় সাহায্য কর, আমার জন্যেই
তুই ধরবি যত কিছু আমি এতক্ষণ

ধরেও পারিনি ধরতে। ঘুম, তোর হাত
আমার হাতের চেয়ে অনেক বিরাট।

*

আমার কানের কাছে কোন্ এক মুখ
আয়নার মুখ এক এসে ধীরে ধীরে
সন্তর্পণে ভর দেয় রাতের তিমিরে।
—"ও সুন্দর মুখ, তুমি এইখানে থাকো,
জেগে থাকো অবিচল, ভয় পেও নাকো।
একটি মানুষ আর তার ঘুম এই
রয়েছে তোমার কাছে। এমনটা করো
যাতে দূর সঙ্গী হয়ে তারা দুজনেই
যোজন বিস্তার বনে ঢুকে পড়ে, লাখো
পাতারা যেখানে সব আছে নত হয়ে,
চোখের পাতার মতো বুঁজে আছে সব,
যে-রাজ্যে পাখিরা আছে যারা গান গায়
অন্ধকারে মুড়ে রাখা ডানার তলায়
ভোরের আলোয় যারা জেগেই নীরব
হয়ে যায়, চোখ মেলে দেখে শুধু চেয়ে।"

—"ঘুমোও ঘুমোও তুমি, তোমার শিয়রে
আছি আমি জেগে ঠিক, দেখছি পৃথিবীটা
এখনো রয়েছে কিনা, রাত্রির ভিতরে
গাছগুলো গাছ কিনা, পথেরা এখনো
নির্বিবাদে মানে কিনা খুশির খেয়াল,
আর সেই নক্ষত্রটা যাকে তুমি কাল
আবিষ্কার করেছিলে সেও জ্বলে কিনা
আসে কিনা ক্রমে ক্রমে আমাদের কাছে।
এখন ঘুমোও তুমি, এ দিকে অনেক
বছরের বোঝা বয়ে ক্লান্ত বাড়িগুলো

উপর-নিচের তলা রাজ্যপাট নিয়ে
যাক সব এক মুহূর্ত হাওয়ায় মিলিয়ে।"

—"বিরাট ঘুমের পারে এই যে কথা কয়
সে কি তুমি? পাহাড়ের সারির মতন
যে ঘুম আড়াল করে আছে মাঝখানে
তার পার থেকে শুনি তোমার কথা কি?
আমি সেই পৃথিবীতে আছি কি এখন
যেখানে বিস্তৃত পথ যেন আমাদের
হাতের রেখার মতো, কেউ তো জানে না
কে তাদের জড়ো করে সাজায় এমন?"

—"প্রতি ঘাস প্রতি শীষ চঞ্চল মাছেরা
সবার উপরে আমি রেখেছি নজর,
তাদের টিঁকিয়ে রাখব নিশ্চয় তোমার
মুখ চেয়ে, তারা থাকবে কালকেও জেনো।
আর তুমি খুঁজে পাবে, যাতে এ-পৃথিবী
তোমার দৃষ্টির কাছে উদ্ভাসিত হয়,
খুঁজে পাবে পোকাদের, খুঁজে পাবে তুমি
চোখের গভীর রঙ, সময়ের স্বর।
নামুক নামুক ঘুম তোমার উপর;
তোমার বিছানা আহা এরি মধ্যে ভাবে
একদা সে দোল্না ছিল, স্মৃতি জাগে তার।
তোমার হাতের মুঠো খুলুক এবার
ছেড়ে দিক শক্তি-দুর্বলতার সঞ্চয়,
তোমার মস্তিষ্ক আর তোমার হৃদয়
অবশেষে টেনে দিক ভারী পর্দাগুলো,
তোমার রক্তের স্রোত শান্ত হয়ে যাক
রাত্রি যাতে পার পায় ঘূর্ণির বিপাক।"

অরুণ মিত্র

সারা আকাশ

ছিল একটা ঘোড়া আমার
আকাশের এক মাঠে, আমি
লাগাম খুলে দিতাম যে তার
দারুণ ভরাট দিনের আলোয়।
কেউ থামাতে পারত না সেই
গরঠিকানি দৌড় আমার,
সেই ঘোড়াটা ঘোড়া তো নয়,
সে যেন এক সোনার তরী,
সেই ঘোড়াটা ঘোড়া তো নয়,
যেন সে এক ইচ্ছা আমার,
ঠিক সেরকম দেখোনি কেউ
মাথাটা তার এমনি ঘোড়ার
গায়ের ঢাকনা খেয়াল-বোনা ;
আর যেন তার কণ্ঠকুহর
হাওয়ার মতন আত্মত্যাগী।

আমার অফুরন্ত চলায়
দিতাম আমি এই ইশারা :
"ইচ্ছা যদি হয় তাহলে
চলো আমার সঙ্গে চলো
আমার পথিকবন্ধুরা সব,
রাস্তা যখন খোলা, যখন
সারা আকাশ স্বচ্ছশাদা।
কিন্তু কে এই কথা বলছে ?
আমি খোয়াই আত্মদৃষ্টি
এমন উঁচু আকাশচূড়ায়,
কে বলবে কে আসল-আমি ?
যে-আমি এক পলক আগে

কিছু কথা বলেছি, আর
যে-আমি এই কথা বলছি
দুজনে কি একই মানুষ ?
পথিকবন্ধু তোমরা সবাই
তোমরাও কি একই মানুষ ?
এক মুছে দেয় আরেকজনকে,
অশ্বারোহীর লহর চলে।"

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সাঁ জ্যঁ প্যাস

আমার সিঁথিকাটা

"আমার সিঁথিকাটা যখন শেষ করবে, তোমাকে আমার বিশ্রী লাগারও শেষ হবে।"
শিশু চায় দোরগোড়াতেই তার চুল আঁচড়ানো হোক।
"আমার চুল এমন করে টেনো না। যথেষ্ট হয়েছে, আমাকে ছোঁবার আর দরকার নেই। তুমি যখন আমার চুল আঁচড়ে দিয়েছ তোমাকে আমার বিশ্রী লেগেছে।"
ইতিমধ্যে দিনের প্রজ্ঞা এক সুন্দর গাছের রূপ নেয়
এবং ভারসাম্য করে দাঁড়ানো গাছ
এক মুঠো পাখিকে হারিয়ে
আকাশের লেগুনে বিস্ফারিত করে এক সবুজ এমন সুন্দর যে জলের কীটের চেয়ে তেমন সবুজ আর নেই।
"আমার চুল ধরে অত টেনো না।"

অরুণ মিত্র

আমাকে যেতে দাও

এখন আমাকে যেতে দাও, আমি একা যাচ্ছি।
আমি বাইরে যাব, কারণ আমার কাজ আছে. একটা
পতঙ্গ আমার অপেক্ষায় রয়েছে কারবারের জন্যে। আমার
ভীষণ আনন্দ হয় যখন দেখি সেই পলাকাটা চোখ কোণের
আকার, অভাবনীয়, দেবদারুর ফলের মতো
কিংবা আমার মিতালি আছে নীলশিরা পাথরদের সঙ্গে :
এবং তোমরা আমাকে বসে থাকতে দাও
আমার জানুর অন্তরঙ্গতায়।

অরুণ মিত্র

যারা অতলান্তিকের

যারা অতলান্তিকের মহান ভারত-দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিল
পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে, যারা গহ্বরের তাজা মুখে
নতুন চিন্তার আঘ্রাণ পায়, যারা ভবিষ্যতের দুয়ারে শিঙায়
ফুঁ দেয়
তারা জানে নির্বাসনের বালিতে বিদ্যুতের চাবুকের ঘায়ে
মোচড়ানো উত্তুঙ্গ আবেগ শোঁ শোঁ করে······জ্যৈষ্ঠের লবণ
আর ফেনার নিচে হে অমিতব্যয়ী! আমাদের মাঝে তোমার
গানের ঐন্দ্রজালিক শক্তিকে জীবন্ত রাখো!
তারই মতো যে দূতকে বলে, 'আমাদের স্ত্রীদের মুখ
অবগুণ্ঠিত করো, আমাদের পুত্রদের মুখ তুলে ধরো'; নির্দেশ
এই যে তোমার. দ্বারপ্রান্তের পাথর ধুতে হবে ··· 'আমি
তোমাকে নিম্নস্বরে বলে দেব সেই সব প্রস্রবণের নাম যেখানে
আগামীকাল আমরা এক বিশুদ্ধ ক্রোধকে অবগাহন করাব'।
এই তার বাণী।

হে কবি, তোমার নাম, তোমার জন্ম এবং তোমার জাতির পরিচয় দেবার এখনই সময়।

অরুণ মিত্র

আমাদের ভাবনা

আমাদের ভাবনা ইতিমধ্যেই রাত্রি থাকতে উঠে পড়ে বড়ো তাঁবুর মানুষদের মতো, যারা দিন হবার আগেই বাঁ কাঁধে তাদের জিন বয়ে লাল আকাশের নিচে হাঁটে।
এই আমাদের ফেলে-চলা জায়গা। মাটির ফল আমাদের পাঁচিলের নিচে, আকাশের জল আমাদের চৌবাচ্চায় এবং পাথরের মস্ত জাঁতাগুলো বালির উপর পড়ে।
হে রাত্রি, উপহার কোথায় নিয়ে যেতে হবে, কোথায় রাখতে হবে স্তুতি? আমরা হাতের ডগায়, চেটোর উপরে সদ্য ডানা-গজানো পাখির ছানার মতো তুলে ধরি মানুষের এই অন্ধকার হৃদয়কে যেখানে ছিল আগ্রহ, ছিল উদ্দীপনা এবং কত অপ্রকাশিত ভালোবাসা……
হে রাত্রি, শোনো শূন্য প্রাঙ্গণে এবং নির্জন তোরণের নিচে, পবিত্র ধ্বংসস্তূপ আর চূর্ণ প্রাচীন বল্মীকের মাঝখানে গুহাহীন আত্মার প্রবল রাজ-পদক্ষেপ,
যেন ধাতুর চত্বরে সিংহের বিচরণ।

অতি বৃদ্ধ বয়স, এই তো আমরা। মানুষের হৃদয়ের পরিমাপ নাও।

অরুণ মিত্র

পিয়ের রেভের্দি

ঘণ্টাধ্বনি

সব নিবে গেছে
হাওয়া মর্মর শব্দে বইছে
আর গাছগুলো শিউরে উঠছে
জন্তুরা মরে গেছে
কেউ আর নেই
দেখো
তারারা আর জ্বলছে না
পৃথিবী আর ঘুরছে না
একটা মাথা ঝুঁকে পড়েছে
তার চুল রাতের উপর দিয়ে ছড়ানো
শেষ গির্জাচূড়ার ফলক দাঁড়িয়ে
রাত বারোটা বাজল।

অরুণ মিত্র

অনেক রাতে

রাত্তির রঙ ভেঙে ছড়িয়ে দেয় চারপাশে
টেবিলটা যেখানে ওরা বসে
চিমনির কাঁচ
আলোটা এক হৃদয় যা ক্রমাগত শূন্য হয়
আরেক বছর এটা
এক নতুন বলিরেখা দেখা দেয়
তুমি কি এর আগে ভেবেছিলে এ কথা
জানলা এক চৌকোনা নীল ঢালে
আরো অন্তরঙ্গ দরজার পাট
এক বিচ্ছেদ
অনুশোচনা আর অপরাধ

বিদায় আমি পড়ে যাই
বাহুর কোমল কোণে তারা আমায় ধরে নেয় পলকে
অপাঙ্গে আমি দেখি পানরত মানুষগুলোকে
আমি নড়তে সাহস পাই না
ওরা বসে আছে সবাই
টেবিলটা গোলাকার
আমার স্মৃতিও তাই
প্রত্যেককে মনে পড়ে আমার
এমন কি যারা চলে গেছে তাদেরও এই মুহূর্তেই।

অরুণ মিত্র

হারানো পথ

আমি ভস্মের স্তম্ভের নিচে শায়িত হয়েছি
এবং তুমি উঠেছ সোনার মিনারে
দুর্ভাগ্যের গহ্বরে আমি আর নামতে পারি না
আকাশ অতিক্রান্ত হয়েছে
সে মৃত্যুর উপর আনত
অত্যন্ত অস্পষ্ট রেখাগুলোকে এড়িয়ে আমি চলে এসেছি
আমি আর ফিরতে পারি না
আমার মুখের চিহ্ন আমি লবণে ঢেকেছি
যে-জগৎ থেকে আমি পালিয়ে এসেছি সেখানে
আর আমার জায়গা নেই
সূর্যের ভিতরে খোঁজো
অন্ধকারের ভিতরে খোঁজো
এবং তোমার হৃদয়ের ভিতরে খোঁজো এক অসম্ভব প্রতিধ্বনিকে
নিজের মধ্যে নির্বাসনের বিতৃষ্ণার কুণ্ডলীর দিকে
আরো উপরে।

অরুণ মিত্র

দয়িতা

তার পদপাত আমারই আঁখির পাতায়
আমার চুলেই মেশে তার গোছা চুল
আমার হাতের আকারে সে প্রাণ পায়
আমার চোখের তারার রঙ সে মাখে
আমার ছায়ায় আবৃত সে যে আঢুল
আকাশের গায়ে পাহাড় যেমন থাকে

সে তার নয়ন সর্বদা খোলা রাখে
আর সে আমার ঘুম রাখে কেড়ে নিয়ে
স্পষ্ট দিবার স্বপ্নের তার ডাকে
কত না সূর্য শূন্যেই যায় শুকিয়ে
আমাকে হাসায় কাঁদায় হাসায় ওই
কথাও কওয়ায় বিনা বক্তব্যেই ॥

বিষ্ণু দে

কেউ আমায় চেনে না

কেউই আমায় চেনে না
তোমার চেনার চেয়ে ভালো

তোমার নয়নে যেখানে আমরা ঘুমাই
আমরা দুজনে রচেছি
আমার মানবিক দীপের জন্যে
বিশ্বের যত রাত্রির চেয়ে অনেক ভালো এক ভবিষ্যৎ
তোমার নয়ন যেখানে আমার অভিযান
যত পথের যাওয়া-আসাকে দিয়েছে
এক অমর্ত্য তাৎপর্য

তোমার নয়নদুটি যারা উন্মোচিত করে
আমাদের অনন্ত নৈঃসঙ্গ্য
তারা নিজেদের যা ভেবেছিল আর তা রইল না।

কেউই তোমায় চেনে না
আমার চেনার চেয়ে ভালো ॥

বিষ্ণু দে

খোলা হাওয়া

সামনে তাকাই, দেখি
জনতার ভিড়ে তুমি
দেখেছি তোমায় ফসলের বনে যেন
অথবা একটি বৃক্ষের তলে তোমাকে দেখেছি আমি
সব পথ অবসানে
সকল ব্যথার শেষে
ফিরে ফিরে সব হাসিতে
যেন জল আর আগুন উৎসারিত

শীতে কি গ্রীষ্মে দেখেছি তোমায় আমি
গৃহকোণে আমি দেখেছি তোমায়
বাহুডোরে আমি দেখেছি তোমায়
তোমাকে দেখেছি স্বপ্নে আমার
ফিরতে তো আমি দেব না তোমাকে আর।

অশোক মুখোপাধ্যায়

কবিকর্ম

১

কী ভালো অপরের সঙ্গ
ঘাসচাপড়ের উপর গ্রীষ্মে
শাদা মেঘের তলায়

কী ভালো রমণীর সঙ্গ
গূহ, ধূসর আর উষ্ণ
স্বচ্ছ চাদরের তলায়

কী ভালো সঙ্গ নিজের
শাদা পাতার সমুখে
অক্ষমতার শঙ্কায়
দুই স্থান দুই কালের মধ্যে

বিরক্তি ও বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায়

২

কী এসেছ নিতে
অভ্যস্ত ঘরে

একটি পুঁথি যা খোলা হয়নি

কী এসেছ বলতে
তাকে, এমন যুক্তিহীন

যা বলা যাবে না দু'বার

কী এলে দেখতে
এমন অনাবৃত

অন্ধে যা দেখে

৩

পথ সংক্ষিপ্ত
অচিরে কেউ এলো।
যেখানে বর্ণময় প্রস্তর
তারপর
ফাঁপা।

অচিরে কেউ এল
যেখানে শব্দগুলি মসৃণ
শব্দগুলি নির্ভার
তারপর
অর্থযোগশূন্য

কোনও বাণী নিয়ে নয়, কথা বলা।
ভোর হয়ে গেছে কখন
এখন দিনও নয়
রাত্রিও
কিছুই না—এক শেষহীন যাত্রার প্রতিধ্বনি

সিদ্ধেশ্বর সেন

মার্ক শাগাল

(অংশ)

বাহুবন্ধে আমার বাহুবন্ধে হাসি আর কান্না
আমার অশ্রুতে তোমার আর্দ্র ওষ্ঠের জল।
আমি ঘুরিয়ে দিলাম জগৎকে তোমার মুখের চারপাশে
তোমার মুখের আদল ঘিরে আমার বাগান ঝলমল

আমরাই প্রথম স্বপ্ন খুঁজেছি উধাও হবার, উধাও
দুইজনে এবং বিশ্ব
আমাদের অনুসারী, বঁড়শিতে গাঁথা মাছের পিছনে নৌকা,
আর, আলো তো প্রতিবন্ধহীন

যেমন তুমি সুন্দরতমা আর সবচেয়ে বিশ্বস্ত
আমি সুন্দর, বিশ্বস্ত, আমি
একই উৎস থেকে একই অগ্নিশিখা

এই স্নিগ্ধ ধারাজল ঝড়ের ভিতর
কোনও বাতায়ন নেই আমাদের বাতায়ন ছাড়া
যেখান থেকে প্রাণের উৎসার, আর যেখানে সমস্ত বস্তু মিলায়
সমস্ত জুড়েই যেখানে প্রেমের কেন্দ্র
অন্তবিহীন সেই প্রথম দৃষ্টিপাত

আমাদের জন্ম চিরন্তন ॥

সিদ্ধেশ্বর সেন

লুই আরাগঁ

পারী

ঝড়ের বুকেও কী যেন ভালো
রাতের আকাশে কী যে অপরূপ ঝলমলালো
বাতাস মাতাল উদ্ধত হলো দুঃসময়
ভাঙা শার্সিতে ঝিল্‌কিয়ে ওঠে আশার আলো
চূর্ণ প্রাচীর হতে ওঠে গান আকাশময়।

নেভে না আগুন নবজন্মে এ বহ্নিমান
পৌয়া ত্যুজুরের সীমান্ত হতে পেঅর লাসেস
জন্মভূমির শাশ্বত জ্যোতি অনির্বাণ
গ্রীষ্মের রাঙা গোলাপবনের সুরভি মাঝে
পারীর রক্ত এখানে ওখানে জড়িয়ে আছে।

পারীর গর্ভে যেন অনন্ত বিস্ফোরণ
কপালে তাহার পবিত্র ঢেউ চিরোন্নত
বহ্নির চেয়ে বজ্রের চেয়ে কী কম্পন
আমার পারী যে তুচ্ছ করেছে বিঘ্ন শত
পারিজাতও নয় সুন্দরী এতো পারীর মতো।

হৃদয় আমার কখনো এমন নাচেনি আগে
হাসি অশ্রুতে মেলেনি কখনো এ অনুরাগে
জয়ধ্বনি যে দেশের হাজার কণ্ঠে জাগে
কী বিরাট এক শবাচ্ছাদন গিয়েছে উড়ে
স্বাধীন পারী সে মুক্ত পারী সে আকাশ জুড়ে।

দিনেশ দাস

দ্বিতীয় রিচার্ড চল্লিশ

এদেশ আমার হালভাঙা এক নাও
বহু পুরাতন নাবিক গিয়েছে ছেড়ে
আমি যেন আজ সেই রাজা অসহায়
বন্ধুরা গেছে ভেঙেছে সুখের হাট,
তবু তো সে তার দুঃখের সম্রাট।

ধূর্তামি ছাড়া বেঁচে থাকা আজ দায়
বাতাসও মোছে না আমার অশ্রুপাত
প্রেম কি আজকে ঘৃণায় ঢাকব হায়

হারানো মানিক ফিরে দিতে হবে তাও
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

শীতল শিরায় রক্ত বইবে তবু
হৃদয়ে যদি-বা মরণও ফোটায় দাঁত
দুয়ে আর দুয়ে এখন হয় না চার
অন্ধের সাথে ডাকাতেরা খেলে পাশা
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

সকাল সন্ধ্যা দগ্ধ দিনদুপুর
আকাশটা কী যে বিবর্ণ পাণ্ডুর
ফুলের দোকানে ফাল্গুন মরে যায়
উজ্জ্বল দিনের পারী গো দাও বিদায়
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

বনঝর্নার সংগীত ভুলে যাও
লুকাও লুকাও কাকলিমুখর মাঠ
বন্দীশিবিরে বন্দী তোমার গান
কিরাত ব্যাধেরা এখন এদেশে রাজা
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

সইতেই হয় জীবনে দুঃখতাপ
ফ্রান্সকে তোদের খান্‌খান্‌ করে কাট
জীন্দার্ক গেছে যেই দিন ভকুল্যর
সেইদিনও ছিল পাণ্ডুর উষাকাল
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট॥

দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

আয়নার সামনে এল্‌সা

আহা সে আমাদের বেদনামথিত দিনের দ্বিপ্রহর
সারাটা দিন ধরে আয়নার সামনে বসে
ও তার সোনালি চুল আঁচড়েছিল, আর আমার মনে হলো
যেন শান্ত হাতে এক পাবকশিখাকে ও শান্ত করল
তখন আমাদের ব্যথার যুগের মধ্যদিন।

সারাটা দিন ধরে আয়নার সামনে বসে
ও তার উজ্জ্বল সোনালি চুল আঁচড়েছিল, মনে হলো যেন
ভরসাহীন মনে, আমাদের ব্যথার যুগের মাঝখানে
দীর্ঘ প্রহরগুলো কাটিয়ে দেবার জন্য ও সোনার বীণা বাজাচ্ছে
আয়নার সামনে বসে সারাটা দিন।

ও তার উজ্জ্বল সোনালি চুল আঁচড়েছিল, মনে হলো,
যেন তার স্মৃতিকে শহীদ করে দিল স্বেচ্ছায় ;
সারাটা দিন ধরে আয়নার সামনে বসে
দাহনশেষের অবশিষ্ট ফুলকটিকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য
ও মৌন হয়েছিল, ও ছাড়া অন্য কেউ নীরব থাকত না।

ও স্বেচ্ছায় শহীদ করে দিল ওর স্মৃতিকে
তখন আমাদের বিয়োগান্ত সময়ের মধ্যকাল
ওর আঁধার আয়নাটা যেন পৃথিবীর মুখ
ওর চিরুনিটা বহ্নিশিখার মতো রেশমী চুলগুলোকে ভাগ করে দিল
আর আলোকিত করে দিল আমার স্মৃতির অন্ধকার গুহা।
সপ্তাহের মাঝে বৃহস্পতিবারের মতো
আমাদের বেদনার মধ্যদিনে
ও তার স্মৃতির মুখোমুখি বসে
কী দেখেছিল আয়নাতে (কিন্তু বলেনি কিছুই)।

এক এক করে আমাদের বিয়োগান্ত নাটকের যে অভিনেতারা
মরল, তাদের আমরা প্রশংসা করি এই অন্ধকার দুনিয়ায়

তাদের নাম আমার বলার প্রয়োজন নেই, তুমি তো জানো
কোন স্মৃতি দাউ দাউ করে জ্বলছে, এই মিলিয়ে আসা দিনের চিতায়

আর ওর সোনালি চুলের গুচ্ছে, ও যখন ওইখানে বসে
প্রতিফলিত পাবকশিখাকে নীরবে শান্ত করে চলেছে।

দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

আঁরি মিশো

গোলকধাঁধা

গোলকধাঁধা, এই জীবন, মৃত্যু গোলকধাঁধা,
অশেষ গোলকধাঁধা বলে হো দলের প্রভু।

সব কিছু যায় চূর্ণ হয়ে দেয় না কিছুই ছেড়ে।
আত্মহনন জন্মায় ফের নতুন ব্যথার ঘোরে।

লৌহকপাট না ফুরাতেই লৌহকপাট আরো।
আঁধার দরদালান খোলে আঁধার দরদালানে :

যে ভাবে তার জীবনের জট প্রায় খুলে ফেলেছে
সে আসলে কিছুই খুলছে না।

কোথাও কিছুই ঘটে না রে শতক শতাব্দীও
ভূগর্ভে প্রোথিত, বলে হো দলের প্রভু॥

সুপর্ণা সেন

বুদাপেস্তের যুবতী

আমি এই তরুণীর শ্বাসবাষ্পে আশ্রয় নিয়েছি।
প্রত্যাহার করেও দাঁড়িয়ে আছি একই জায়গায়।
নির্ভার এর বাহুযুগ সংস্পর্শে জলের মতো যেন।
যা বিবর্ণ ওর সামনে থেকে মিলায়। শুধু জেগে থাকে ওর চক্ষুদুটির সর্বস্বতা।
দীঘল নয়নজুড়ানো ঘাস, বড়ো বড়ো ফুলগুলি ধরেছিল আমাদের মাঠে।
আমার বুকে লঘু প্রতিবন্ধকের ভার, যখন তুমি ঝুঁকে পড়ো আমার 'পরে
এতো বেশি ঝুঁকেছ যে মনে হয় তুমি বুঝি নেই॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জাক প্রেভের

রু দ্য সেইন

রু দ্য সেইন
রাত সাড়ে দশটা
আর-এক রাস্তার মোড়ে
টলছে একটি মানুষ···একটি যুবা
মাথায় টুপি
গায়ে বর্ষাতি
আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে
ঝাঁকুনি দিচ্ছে
আর কী যেন বলছে সেই ছেলেকে
ছেলেটি মাথা নাড়ছে
টুপিটা একপাশে হেলানো
আর মেয়েটির টুপিও আর-একটু হলেই খসে পড়বে
ফ্যাকাশে মুখ দুজনের
ছেলেটি নিশ্চয়ই চলে যেতে চায়

পালাতে চায়···কিংবা মরতে
অথচ মেয়েটির মধ্যে জ্বলছে বাঁচবার এক দারুণ ইচ্ছা
আর তার কণ্ঠস্বরে
তার চাপা কণ্ঠস্বর
এ তো যে-কেউ বুঝবে
যেন স্বর নয় গোঙানি
যেন আদেশ ··
যেন আর্তনাদ ··
ঠিক তেমনই ব্যগ্র···
আর করুণ
আর জীবন্ত···
শীতার্ত কবরখানায় কোনো সমাধির উপরে
ঠাণ্ডা হাওয়ায় শিউরে উঠছে এক নবজাতক···
দরজার পাল্লায় আঙুল চেপটে গিয়ে যেন ককিয়ে উঠেছে কেউ
যে-গানের যে-কথার
কোনোও পরিবর্তন নেই
তারই পুনরুক্তি ··
কেউ তাতে বাধা দেয়নি
উত্তরও দেয়নি কেউ
মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেই ছেলে, দৃষ্টি বিস্ফারিত
যেন অথই জলের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে কেউ
আর ডুবতে-ডুবতে শুনছে সেই কথা
সেই একই কথার পুনরুক্তি
রু দ্য সেইন আর-এক রাস্তার মোড়ে
মেয়েটি কথা বলছে
প্রশ্ন করছে বারবার
সেই একই উৎকণ্ঠ প্রশ্ন
সেই একই বেদনা যার উপশম নেই
পিয়ের, সত্যি করে বলো
পিয়ের, সত্যি করে বলো

সবকিছুই আমি জানতে চাই
সত্যি করে বলো···
টুপি খসে পড়েছে সেই মেয়ের
পিয়ের, সবকিছুই আমি জানতে চাই
সত্যি করে বলো ··
সেই নির্বোধ শাশ্বত প্রশ্ন
পিয়ের যার উত্তর জানে না
সে এখন সর্বস্বান্ত
অর্থাৎ সেই ছেলেটি পিয়ের নামে যে তার পরিচয় দিয়ে থাকে
মুখে তার অল্প-একটু হাসি
যে-হাসি আর-একটু মধুর হলেই হয়তো শোভন হতো
সে বলছে
ও-রকম করতে নেই লক্ষ্মীটি, শান্ত হও, পাগলামি করে না
অথচ সে নিজেই যে অভ্রান্ত এমন বিশ্বাসও তার নেই
এমন বিশ্বাসও তার নেই
হাসতে গিয়ে তার মুখখানা তাই বিকৃত হয়ে উঠছে
দম আটকে আসছে
বিশ্বপৃথিবীর পায়ের তলায় যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সেই ছেলে
সেই ছেলে
নিজেরই প্রতিশ্রুতির শিকলে সে এখন বন্দী ··
এবারে তার জবাবদিহির পালা
ওই যন্ত্রের কাছে
প্রেমপত্র রচনার ওই যন্ত্র
দারুণ দুঃখের ওই যন্ত্র
যে তাকে বন্দী করেছে···
যে তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করে চলেছে
পিয়ের, সত্যি করে বলো।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

উদ্যান

হাজার হাজার বছরেও ফুলোবে না
যদি বর্ণনা করতে যাই
চিরন্তন কালের সেই ছোট্ট মুহূর্তটা
যখন তুমি আমাকে চুমু খেলে
যখন আমি তোমাকে চুমু খেলাম
শীতের এক সকালের আলোয়
মঁস্যুরি পার্কের ভিতরে পারীতে
পারীতে
পৃথিবীর উপর
পৃথিবী সে এক নক্ষত্র।

অরুণ মিত্র

পারিবারিক

মা করে উলের জামা
ছেলে করে যুদ্ধ
তা খুব স্বাভাবিক মনে করে মা
আর বাবা কী করে ? বাবা ?
সে করে ব্যবসা
তার স্ত্রী করে উলের জামা
তার ছেলে যুদ্ধ
সে ব্যবসা
তা খুব স্বাভাবিক মনে করে বাবা
আর ছেলে সেই ছেলে
কী মনে করে সেই ছেলে ?
সে কিছুই মনে করে না কিছুই না সেই ছেলে
তার মা করে উলের জামা তার বাবা ব্যবসা সে যুদ্ধ
সে যখন যুদ্ধ শেষ করবে
তখন ব্যবসা করবে বাবার সঙ্গে

যুদ্ধ টিঁকে থাকে মা টিঁকে থাকে সে উল বোনে
বাবা টিঁকে থাকে সে ব্যবসা করে
ছেলে মারা পড়ল সে আর টিঁকে থাকে না
বাবা আর মা যায় গোরস্থানে
তারা তা খুব স্বাভাবিক মনে করে বাবা আর মা
জীবন টিঁকে থাকে জীবন উলের জামা যুদ্ধ ব্যবসার সঙ্গে
ব্যবসা যুদ্ধ উলের জামা যুদ্ধ
ব্যবসা ব্যবসা আর ব্যবসা
গোরস্থানের সঙ্গে জীবন।

অরুণ মিত্র

তোমার জন্যে ও আমার প্রিয়া

আমি গেলাম পাখির বাজারে
কিনলাম পাখি
তোমার জন্যে
ও আমার প্রিয়া
আমি গেলাম ফুলের বাজারে
কিনলাম ফুল
তোমার জন্যে
ও আমার প্রিয়া
আমি গেলাম লোহার বাজারে
কিনলাম শিকল
ভারী ভারী শিকল
তোমার জন্যে
ও আমার প্রিয়া
তারপর আমি গেলাম বাঁদীর বাজারে
সেখানে তোমাকে খুঁজলাম
কিন্তু তোমাকে পেলাম না
ও আমার প্রিয়া।

অরুণ মিত্র

রহঃসখী

টেবিল সাজিয়ে রেখেছে, মন জুড়ে এনেছে পূর্ণতা, ওর
মুখোমুখি বসে থাকা প্রেমিক, মুখের দিকে
তাকিয়ে সেই পূর্ণতা সাড়া দেবে নম্রভাবে।
বাঁশির ছিদ্রের মতো খাদ্য।
টেবিলের তলায়, ওর নগ্ন গোড়ালি দিয়ে প্রেমিকের
উষ্ণতাকে ও আদর করছে, যদিও সে সব স্বর যে আদৌ
শুনছে না, ওকে নন্দিত করছে। দীপালোকের রশ্মি এলোমেলো,
ওর ভোগবিলাসের ইন্দ্রিয়জাল বুনে দিল।
অনেক দূরে একটি শয্যা স্থির আর অস্থির ওর
সুগন্ধি আস্তরণের নির্বাসনে, যেন একটি পাহাড়ি হ্রদ যা
কোনোদিন পরিত্যক্ত হবে না।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ধূম্রকেশর জোয়ান ঘোড়া

সুন্দর তুমি, যেন বসন্ত, ঘোড়া,
কেশর পুচ্ছে তোলপাড় করো আকাশ,
ঊর্মি ছড়াও তীরে-তীরে শরবনে !
সব ভালোবাসা সংহত তোর বুকে
আফ্রিকার সে শুভ্র ললনা থেকে
মুকুরে মূর্ত সোহিনী বিম্ববতী,
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রতিমা, ধ্যানের জ্যোতি ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জার্মান কবিতা



ফ্রিডরিখ গৎলিব ক্লপস্টক

গোলাপ-ফুল ডোর

আমি তাকে পেয়েছিলুম বসন্তের মধুরিমায় ;
বেঁধেছিলুম গোলাপ-ফুল ডোরে।
দেয়নি সাড়া ভাঙেনি তার ঘুম।

চেয়েছিলুম তারই দিকে একটি পলকেই
আমার প্রাণ গ্রথিত তার প্রাণে।
বুঝেছিলুম, করিনি অনুভব।

কানে-কানে ভাষাবিহীন গুঞ্জরণ করেছিলুম
মর্মরিত গোলাপ-ফুল ডোর :
নিদ্রা হতে তখন জাগরিত।

চেয়েছিল আমার দিকে একটি পলকেই
তাহার প্রাণ গ্রথিত মোর প্রাণে,
চতুর্দিক সহসা স্বর্গীয়।

আলোক সরকার

মাতিয়াস ক্লাউদিয়েস

প্রথম দাঁত ওঠার পর

জয়ধ্বনি করো।
ছোট্ট দুধে দাঁতটি উঠেছে।

এসো মা, এসো বাড়ির ছোটো বড়ো সবাই,
মুখের ভেতর চেয়ে দেখো শাদা ঝিলিকটুকু।
দাঁতটির নাম দেব সেকেন্দর।
লক্ষ্মী সোনা আমার
তোমার এ দাঁতটি ঠাকুর যেন রাখেন।
আর তোমার কচি মুখটি ভরে
সাজিয়ে দেন দাঁতের পাটি।
সে দাঁতে কাটবার কিছু যেন
চিরকাল তিনি যোগান।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

য়োহান ভোলফগাঙ্গ ফন গ্যেটে

প্রমিথিউস

মেঘ বাষ্পে তোমার আকাশ আবৃত করো, জিউস,
আর ছোটো ছেলে যেমন করে ওক গাছে আর পাহাড়ের ওপর
কাঁটা গাছের মাথার ফুলের গোলক কেটে বেড়ায়
তেমনি করে তোমার গায়ের জোর ফলাও।
তবু, আমার এই পৃথিবী আর এই কুটীর
তোমায় দিতেই হবে রেখে।
এ কুটীর তোমার তৈরি নয়, আমার এই অগ্নিকুণ্ডও
যার উত্তাপ তোমার ঈর্ষা জাগায়।

হে দেবতারা,
সৌরলোকে তোমাদের চেয়ে হতভাগ্য
আর কিছু আছে বলে আমি জানি না।
পূজার নৈবেদ্য আর প্রার্থনার নিশ্বাসই তোমাদের
রাজগৌরবের ঠাটের যৎসামান্য সম্বল।

শিশু আর ভিক্ষুকেরা অমন আশার ছলনে ভোলা
মূঢ় না হলে তোমরা থাকতে উপবাসী।

ছেলেবেলায় অকূলে পড়লে
উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমি সূর্যের দিকে চেয়েছি
যেন সেখানে কেউ কান পেতে আছে
আমার বিলাপ শোনবার জন্যে।
আমারই মতন কোনো হৃদয় সেখানে আছে
আমার দুর্দশায় আমায় করুণা করতে।

দাম্ভিক দৈত্যরাজদের বিপক্ষে
কে আমার সহায় হয়েছে ?
কে আমায় রক্ষা করেছে মৃত্যু আর দাসত্ব থেকে ?
হে আমার দীপ্ত পবিত্র হৃদয়
তুমি কি একাই এই অসাধ্য সাধন করোনি ?
যৌবনের সরলতায় প্রবঞ্চিত হয়ে
উর্ধ্বাকাশের সেই সুপ্তিমগ্নকে
তোমার পরিত্রাণের জন্যে কৃতজ্ঞতা কি
তুমি বিকিরণ করোনি ?

তোমায় আমি শ্রদ্ধা করব ? কেন ?
বেদনায় আমি যখন কাতর
তখন আমায় তুমি কি কখনো সান্ত্বনা দিয়েছ ?
যখন আমি শঙ্কাতুর তখন মুছে দিয়েছ আমার অশ্রুধারা ?
তুমি ও আমি যাদের অধীন
সেই সর্বশক্তিমান সময় আর শাশ্বত নিয়তিই কি
আমাকে গড়ে তোলেনি মানুষ করে ?

তুমি কি ভেবেছিলে জীবনকে আমি ঘৃণা করব ?
আমার কুসুমস্বপ্ন সব সফল হয়নি বলে

পালিয়ে যাব অরণ্য গহনে ?
এইখানেই আমি থাকি আর মানুষ গড়ি আমার আদলে
গড়ি এমন এক জাতি যারা আমারই মতো দুঃখ পাবে
আর কাঁদবে আর সুখী হবে উপভোগ করবে
আর তোমায় করবে অস্বীকার।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সুরাত্রি

প্রাণপ্রতিমার কুঞ্জকুটীর ছেড়ে
নৈশ, নিরালা কান্তারে দিই পাড়ি ;
অপার ব্যবধি পায়ে পায়ে যায় বেড়ে
কিন্তু এখনও রভসে বিবশ নাড়ী ॥

বনস্পতির জটায় বন্দী বিধু ;
দিশারী মলয় আত্মঘোষণা করে ;
বকুলবনের সুরভি এবং সীধু,
লাস্যলীলায়, ছড়ায় বনান্তরে ॥

মধুমাধবের সুন্দর শর্বরী
স্নিগ্ধ প্রসাদে কী অনির্বচনীয় !
এ-মহামৌনে অশোভন মাধুকরী,
ভূমা-সমাহিত চেতনারই রচনীয় ॥

শত সহস্র এমন রজনী তবু
মূল্যহিসাবে কেড়ে নিও যথাকালে ;
আমি চাই পরিবর্তে আবার, প্রভু,
মতিচ্ছন্ন ক্ষণিকার মায়াজালে ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ফাউস্টের পাঠ-কক্ষ

[অংশ]

ফাউস্ট—করাঘাত ? ঘরে এসো ! শান্তিভঙ্গ কে করলে আবার ?

মেফিস্টোফিলিস—এই আমি !

ফাউস্ট—ঘরে এসো !

মেফিস্টোফিলিস—ডাকতে হবে তিনবার।

ফাউস্ট—ঘরে এসো তবে !

মেফিস্টোফিলিস—এম্‌নিই অভ্যর্থনা ঈপ্সিত আমার।

আশাকরি, আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে গাঢ়তর,
তোমার মনের তাপ আমি দূর করব অতঃপর ;
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বেশে তাই আমি এলাম এবার
সোনার জরিতে মোড়া লাল একটা জামা গায়ে দিয়ে
সোনার চুমকি দেয়া রেশমের উত্তরী উড়িয়ে,
এসেছি মাথায় একটা পালকের মস্ত টুপি পরে
তীক্ষ্ণ তলোয়ারখানা ঝুলিয়ে কোমরে,—
সংক্ষেপে স্থপরামর্শ দিই, এম্‌নিতর
তুমিও উজ্জ্বল, রাঙা পরিচ্ছদে অঙ্গসজ্জা করো।
নির্মুক্ত স্বাধীন হয়ে বাইরে আসবে এই কক্ষ তবে,
বুঝতে পারবে জীবনের কী যে অর্থ বিশাল জগতে !

ফাউস্ট—পৃথিবীর এ জীবন বেদনা তো দেবেই আমাকে

যে-বেশ পরি না কেন যদি চলি অভ্যাসের বশে।
আজ সে বয়স নেই যাতে আঁকড়ে থাকি কামনাকে ;
বাসনা বর্জন করি আসেনি তো আজো সে বয়স।
পৃথিবীতে কোন বস্তু লভ্য আছে আর ?
ছেড়ে এসো, ভুলে যাও, ত্যাগ করো—এই তো সংসার !
এই এক সনাতনী গীতি
বাজে যেন সর্বদাই সবার শ্রবণে
সারাটা জীবন ভরে, শুধুই অতৃপ্তি।
প্রতিটি প্রহর যায় গান গায় বেসুরো ধরনে !

আমি তো প্রতিটি ভোরে জেগে কাঁপি ত্রাসে,
তাকাতে সূর্যের পানে চোখে নামে কান্না পারাবার।
জানি, যতক্ষণ জেগে থাকবে সে আকাশে
একটি আকাঙ্ক্ষাও তৃপ্ত বুঝি হবে না আমার,
আমার সুখের প্রতি উন্মেষের একান্ত প্রয়াস
সন্দেহের ক্ষতে দুষ্ট, বিপর্যস্ত হয় ছলনায়,
মহত্তম সৃষ্টিগুলি পূর্ণতা না পায়
জীবন-যন্ত্রণাগুলি হৃদয়কে করে পরিহাস।
যখন গভীর রাত্রি চারিদিকে নামে,
পরিপূর্ণ শান্তি খোঁজে আমার হৃদয় ;
কিন্তু নিদ্রা আসে না তো কাঙ্ক্ষিত আরামে
ভয়াল স্বপ্নের নানা উপসর্গ যেন জেগে রয়।
যে-দেবতা অধিষ্ঠিত হৃদয়ে আমার
মনের গভীর উৎসে আনতে পারেন আলোড়ন,
আমার শক্তির পরে অধিষ্ঠান যাঁর
তাঁর পক্ষে অসম্ভব প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন।
সময়ের গুরুভারে নির্যাতিত হয়ে
মৃত্যু বরণীয় আজ, জীবন বেড়াই বয়ে বয়ে।

মেফিস্টোফিলিস—তথাপি মৃত্যুই বলো অভিপ্রেত কার?

ফাউস্ট—আহা, সেই সুখী, যার বিজয়ী ললাটে
সে পরায় রক্তাপ্লুত জয়মাল্য—জয়ীর সম্মান,
কিংবা উল্লসিত নৃত্যে ভাগ্য তাকে দেখে
প্রিয়তমা আলিঙ্গনে তার আত্মদান।
হায়, যদি জানতেম অপদেবতার সেই অমিত শক্তিতে
সঁপে দিতে হৃদয় অনন্ত রাত্রি!

মেফিস্টোফিলিস—তবু সেই মধ্যরাত্রে সুযোগ হারাল একজন
পানীয় অধরে তুলে করল সে বর্জন।

ফাউস্ট—তোমার সর্বজ্ঞ সত্তা গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যাপৃত?

মেফিস্টোফিলিস—না, আমি সর্বজ্ঞ নই, তবু কিছু কিছু অবহিত।

ফাউস্ট—যদিও সেদিন কোনো পরিচিত সঙ্গীত-আবেশ

আমাকে বিভ্রান্তিকর চিন্তা থেকে টেনে নিয়ে করেছে চালিত,
এবং মধুর স্পষ্ট প্রতিধ্বনি এসে
প্রতারিত করেছিল যে-প্রত্যয় আশৈশব সযত্নে লালিত ;
তথাপি বিনষ্টি চাই তাদের এখন
যারা এ-আত্মাকে জাদু করে ;
উজ্জ্বল মধুর সম্মোহন
পেতে বন্দী করে রাখে গ্লানির গহ্বরে।
এখনই সে-উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধ্বংস হোক তবে
যা-দিয়ে নিজেকে মন করে বিমোহিত !
মোহিনী মূর্তিরা লুপ্ত হয়ে থাক সবে
যারা সূক্ষ্ম চেতনাকে করে প্রভাবিত।
ধ্বংস হোক ধনের দেবতা, তার ধন
অশান্ত কর্মের নেশা এনে করে ভাগ্যরে চালিত !
ধ্বংস হোক, যেহেতু সে মসৃণ আরাম প্রদক্ষিণ
এনে করে আমাদের শয্যায় শায়িত।
ধ্বংস হোক দেবতার ভোগ্য সুধা দ্রাক্ষার নির্যাস,
প্রণয়ের প্রসাদ পরম,
ধ্বংস হোক আশা ও বিশ্বাস
মহতী বিনষ্টি পাক ধৈর্য শ্রেষ্ঠতম।

(অলক্ষ্যে অন্তরীক্ষে দেবযোনিদের ঐকতান)

হায়, হায়, আহা, নিজে
ধ্বংস করলে তুমি যে
সুন্দর এই বস্তু-পুঞ্জ-বিশ্ব,
প্রবল আঘাতে হায়,
হয়ে গেল সবই ধ্বংস,
হলো চুরমার আসুরিক ক্ষমতায় !
ছিন্নভিন্ন অংশ
বহন করছি অসীম শূন্যতায়।

সেই আমাদের কষ্ট,
সুন্দর ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্ট।
হে মহাশক্তিধর
তুমি ধরণীর নবজাতকের জন্য
আরো ঢের ভাস্বর
পুনর্ণব অনন্য
অন্তর্লোকে আবার সৃষ্টি করো।
নূতন মহাজীবন
হোক আরম্ভ হোক
সাথে-সাথে তার নূতন দেখার চোখ
নূতন উদ্দীপন
হর্ষোদ্বেল সে-গান সম্মেলক।

মেফিস্টোফিলিস—ছোটোখাটো এই দানটি—এরা পরিজন,
আমার সেবায় এরা আছে সর্বক্ষণ।
দুরূহ কঠিন কাজে কিংবা এলে আনন্দ উদ্দেশ
শুনবে এদের কাছে প্রবীণ সুতীক্ষ্ণ উপদেশ;
নির্জন জীবন থেকে প্রমুক্ত তোমায়
জনারণ্যে কর্মব্যস্ত ওরা দেখতে চায়।
এখন বঞ্চিত আছো তুমি যে আনন্দে
তোমায় আহ্বান করছে সনির্বন্ধে।
যা তোমার বুক কুরে কুরে খাচ্ছে শকুনির মতো
সেই যন্ত্রণার থেকে তুমি ত্রাণ পাবে;
অপকৃষ্ট সমাজের লোকেরা জানাবে
তুমিও তাদেরই মতো মানুষ অন্তত।
তা বলে ভেবো না মনে আমরা তোমায়
এ ভাবে নিক্ষেপ করছি গড্ডলিকা মনুষ্যসমাজে,
আমি অন্যতম নই মহত্তম মানুষের মাঝে,
তথাপি আমায় যদি বিশ্বাস করতে মন চায়,
জীবনের পথে, তবে তোমাকে দেখাব পথ আমি,—
স্বেচ্ছায় তোমার আমি হব অনুগামী,—

এখনই এবং চিরদিন সেবা করব তোমার
যতদুর সাধ্য আর ক্ষমতা আমার,
এতে যদি তোমার আগ্রহ,
ভৃত্য ক্রীতদাস হয়ে রবো আজ্ঞাবহ।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

য়োহান ফন শিলার

বসন্তের প্রতি

স্বাগত, নম্র তরুণিমা
প্রকৃতির প্রিয়া তুমি
পূর্ণ পুষ্পসম্ভারে
স্বাগত জানাই স্বাগত।
আহা এতোদিনে এলে ফিরে
জানাই হৃদয়ী সম্ভাষণ।
অপরূপ তুমি সুন্দরী
মিলেছি আবার আনন্দে।

আছে কি আমার প্রিয়ার নাম
তোমার মনের শ্যামলিমায়
আমি ভালোবাসি সেই মেয়ে
এঁখনো আমার প্রণয়িনী।
তার সজ্জার প্রয়োজনে
ফুল চেয়ে আমি পেয়েছিলাম
এসেছি আবার ভিক্ষাপাত্র
জানি ভরে দেবে ভালোবাসায়।

স্বাগত, নম্র তরুণিমা
প্রকৃতির প্রিয়া তুমি
পূর্ণ পুষ্পসম্ভারে
স্বাগত জানাই স্বাগত।

আলোক সরকার

ফ্রিডরিখ হেল্ডারলিন

নিয়তির গান : হাইপেরিঅন

তোমরা আলোয় ঊর্ধ্ববিহার করো
প্রান্তর রহে নিম্নে নম্র, যতেক ভাগ্যবান!
ঈথারীয় হাওয়া তোমাদের
অঙ্গ জুড়ায় আদরে,
যেন কুমারীর অঙ্গুলিতলে
স্বর্গীয় বীণা কাঁপে অণোরণীয়ান্।

নিয়তিবিহীন, যেন ঘুমন্ত
স্তন্যপ শিশু, তোমরা সৌরপ্রাণ
তেমনি চিন্ময়তার আস্তরণে
অপ্রতিহত পাপড়িতে যেন
প্রস্ফুট করো ক্লান্তিশূন্য
সতেজ মনোবিতান,
দীপ্র নেত্রে যতেক দেবতা
তাকাও শান্ত, চিরন্তন
দৃষ্টিতে অম্লান।

অথচ কেবল আমরা পাইনি
জুড়োবার মতো, হায়, এতোটুকু স্থান,

পতন নিয়তি নিয়ে মুছে যাই,
সন্তাপে জ্বলি, নশ্বর—তাই
প্রহরের পর প্রহর অন্ধ
অজ্ঞান ধাবমান,
যেমন গড়ায় জল
পাথরে পাথরে অবিবেকী, অবিরাম,
আমরাও ছুটি বছরে বছরে, জানি না দিব্যধাম।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বাড়ি

সুখী নাবিকের মন সুদূর দ্বীপের শস্য সংগৃহীত করে
যবে বাড়ি ফিরে যায় শান্ত নদীপথে ;
আমিও তাদের মতো বাড়ি ফিরে যেতে চাইতুম
কিন্তু কী এনেছি বলো, যন্ত্রণা ব্যতীত।

প্রিয় নদীতীর তুমি লালন করেছ কত স্নেহছায়া দিয়ে,
পারো কি প্রেমের দুঃখ মুছে দিতে ? বলো
ওগো শৈশবের বনভূমি, যখন বাড়িতে ফিরে যাব,
দেবে কি আমাকে শান্তি আর একবার ?

এখনি তোমার পাশে, শান্ত নদী, লহরী মুখর
এখনি তোমার পাশে আমি যাব। শ্লথগতি জাহাজের চলা
দেখেছি বিস্মিত চোখে, ওগো নদী ! প্রিয় শৈলশ্রেণী
একদিন আশ্রয় দিয়েছ যারা, শ্রদ্ধেয়, নিশ্চিত

জন্মভূমি তার প্রান্তরেখা, আমার মায়ের সেই ঘর
ভাইবোনদের প্রিয় আলিঙ্গন, এখনি আবার
সম্ভাষণ জানাব সবারে, আমার হৃদয় ক্ষত
সুস্থ হবে তোমাদের প্রিয় আলিঙ্গনে

চিরদিন বিশ্বাস রেখেছি। তবু আমি জানি আমি ঠিক জানি
প্রেমের বেদনা কেউ সহজে ভোলাতে পারবে না,
আমার বুকের পরে ভালোবাসা যে দুঃখ এঁকেছে
কেউ শান্ত করবে না তাকে, মানুষের কোনো
ঘুমপাড়ানিয়া গান।

কারণ ঈশ্বর যিনি আমাদের স্বর্গীয় আলোক
দিয়েছেন, পবিত্র বেদনা তার অন্য উপহার।
তবে তাই হোক, আমি ধরণীর মাটির সন্তান
জেনেছি নিশ্চিত প্রেম, যন্ত্রণা নিশ্চিত।

আলোক সরকার

যাও ডুবে যাও সূর্য

যাও ডুবে যাও সূর্য, অপরূপ, ওরা সব তোমার শ্রদ্ধায়
সামান্যই অবনত, হে পবিত্রতম, কেউ তোমার মহিমা
বোঝেনি যেহেতু তুমি এসেছিলে শ্রমহীন সহজ নীরব,
পরিশ্রমী মানুষের আকাশের বুকে।

কেবল আমার কাছে আসো-যাও বন্ধুর মতন। অনির্বচনীয় আলো
আমার নয়ন আনে অভ্যর্থনা প্রদীপ্ত উজ্জ্বল
যেহেতু শিখেছি আমি, অনুপম, বিনত শ্রদ্ধায় আরাধনা
উন্মাদ হৃদয় আজ দিয়োতিমা প্রশান্ত করেছে।

ভালোবাসা! দিয়োতিমা! স্বর্গীয় বারতা!
কী মধুর ধ্বনি শুনি, তোমার মুখের আভা নিয়ে
দুই চোখ মেলে দেখি প্লাবিত উজ্জ্বল এই সোনালি দিবস।
কৃতজ্ঞতা দুইটি নয়নে উদ্ভাসিত। আরো প্রাণময়

মর্মরে প্রবহমান ছোটো নদী, বিষাদমগন
পৃথিবীর ফুলদল ভালোবেসে সঘন আমার।
রুপোলি মেঘের ঊর্ধ্ব হতে
সমস্ত আকাশ যেন আশীর্বাদ হয়ে নেমে আসে।

আলোক সরকার

নোভালিস

রাত্রির স্তোত্র

অতিক্রান্ত হব উপেক্ষায়
তারপর সকল যন্ত্রণা
রূপান্তরে এক উত্তেজনা
আনন্দের পটভূমিকায়
কয়েক মুহূর্ত মাত্র আমি,
মুক্ত হব, হব সমর্পিত
সুনিবিড় সন্তোষে শায়িত
প্রেমের অঞ্চল অনুগামী
অনন্ত জীবন ক্ষমতায়
তরঙ্গিত বক্ষের ভিতর
পাহাড়ের অনেক উপর
থেকে দেখব একাগ্র তোমায়
তোমার মহিমা হবে ম্লান
সেই গিরিশিখরের বুকে
আনবে একটি ছায়া চুপে
সুকোমল মালার সম্মান
নাও প্রিয়া দু-বাহু বিস্তারি
নাও গাঢ় উষ্ণ আলিঙ্গনে
যেন আমি নিদ্রার গহনে

ডুবে গিয়ে ভালোবাসতে পারি
অনুভব করি বৈতরণী
উন্মোচিত নবীন যৌবন
রক্ত মেশে ইথারে গহন
চন্দনের শীতল লেপনী
দিবসে বিশ্বাস উজ্জীবন
প্রতিরাত্রে পবিত্র মরণ।

তুমি সেই যুবা, থাকো চিরকাল ধ্যানমগ্নতায়
আমাদের সমাধির পাশে, অন্ধকারে সান্ত্বনার
বার্তা বহে আনো—দীপ্ত সূত্রপাত আনন্দ-আভায়
শুভ্র মানবিকতার। যা কিছু একদা যন্ত্রণার
গভীর বিষাদে মগ্ন করেছিল, ডেকে নিয়ে যায়
আমাদের অতঃপর মধুর সৌরভে আকাঙ্ক্ষার।
শাশ্বত জীবন দেখো মৃত্যুর ভিতরে স্বপ্রকাশ,
তুমি মৃত্যু তোমাতেই আমাদের সম্পূর্ণ বিকাশ।

আলোক সরকার

যোসেফ ফন আইখেনদর্ফ

আমার শিশুর মৃত্যুতে

ঘড়ি বাজে কোন্ দূরে
এখনি অনেক রাত,
প্রদীপটা মিটিমিটি,
তোমার শয়ন পাতা।

আলুথালু হাওয়া ঘোরে
বাড়িটার চারিপাশে,

আমরা নিরালা ঘরে,
সে-শব্দ কানে আসে।

মনে হয় তুই বুঝি
টোকা দিচ্ছিস্ দোরে,
পথ ভুলে গিয়ে ফের
ফিরলি শ্রান্তিঘোরে।

মূঢ় আমরাই, আজো
দিই অফুরান্ পাড়ি
আঁধার ধাঁধায়, তোর
আগেই মিলেছে বাড়ি॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শুক্লা রজনী

অম্বর যেন বিনম্র বৈভবে
চুমা দিয়েছিল দয়িতা ধরিত্রীকে,
ধরিত্রী তাই মঞ্জরীগৌরবে
স্বপ্নে তাকেই দেখছিল অনিমিখে।

ঝিরিঝিরি হাওয়া বহেছিল মাঠে-মাঠে,
স্থির চলোর্মি ফসলের কানে-কানে,
বনমর্মর ছেয়েছিল, সেই রাতে
নক্ষত্রের স্বচ্ছতা সবখানে।

সত্তা আমার ব্যাপ্তপ্রসর ডানা
মেলে ধরে যেন দিয়েছিল দূর পাড়ি,
সমাহিত যত মহকুমা পরগণা
পার হয়ে বুঝি ফিরে আসছিল বাড়ি॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ফুলের মতো

তুমি একটি ফুলের মতো মণি,
এমনই মিষ্টি, এমনই সুন্দর !
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর !

শিরে তোমার হস্তদুটি রাখি
পড়ি এই আশিস মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এমনই মিষ্টি, এমনই সুন্দর !

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এই লীলা !
দিবারাত্রি আহার নিদ্রা ছেড়ে,
তপিস্যে আর লড়াই করে শেষে
বশিষ্ঠের গাইটা নিলে কেড়ে !
বিশ্বামিত্র তোমার মতো গোরু
দুটি এমন দেখিনি বিশ্বে !
নইলে একটি গাভী পাবার তরে
এতো যুদ্ধ, এতো তপিস্যে !

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবিশ্বাসী

পাব আমি আজ তোমাকে আলিঙ্গনে !
সুখের উৎস, অবরোধ টুটে,

বারে বারে তাই বুকে নেচে উঠে ;
তাই বিমোহন স্বপনের রং ধরেছে মনে।
সত্য পাব কি তোমাকে আলিঙ্গনে ?

পাব আমি আজ তোমাকে আলিঙ্গনে !
শিথিল কবরী সহসা বিরলে
ভরে দিবে মুঠি সোনার ফসলে ;
কাঁধে মাথা তুমি রাখিবে অবাধ সমর্পণে।
সত্য পাব কি তোমাকে আলিঙ্গনে ?

পাব আমি আজ তোমাকে আলিঙ্গনে !
বাস্তবে মিশে যাবে কল্পনা ;
পূরিবে অমিত মনস্কামনা ;
অমরা আসিবে নেমে মর্ত্যের আকর্ষণে।
সত্য পাব কি তোমাকে আলিঙ্গনে ?

বলো বিধি তাকে পাব কি আলিঙ্গনে !
ভাগ্যে তখনই বিশ্বাস হবে,
টমাসের মতো, অঙ্গুলি যবে
ইষ্ট ক্ষতের রহসে পশিবে পরম ক্ষণে।
মানিব তখন বাঁধা সে আলিঙ্গনে ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

স্মৃতিবিষ

বয়স আমার অন্তত পঁয়ত্রিশ,
পনেরো বছরে পা দিয়েছ তুমি সবে ;
তবু গূঢ় ক্ষতে চোয়ায় স্মৃতির বিষ
তাকালে তোমার তরুণ মুখাবয়বে ॥

ভালো লেগেছিল আঠারো শ সতেরোতে
যে-কিশোরীকে, সে হুবহু তোমার জোড়া ;
আকারে-প্রকারে এলানো খোঁপার স্রোতে,
তোমার মতোই অপরূপ আগা-গোড়া ॥

গেলুম শহরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে,
বললুম, "দেরি হবে না, স্মরণে রেখো।"
জবাব দিল সে, "তুমি ছাড়া এ-হৃদয়ে
আর কেউ নেই, কেবল তুমিই থেকো ॥"

বছর-তিনেকে টীকাটিপ্পনীসহ
ধর্মশাস্ত্র কিছু সড়গড় হলে,
নব ফাল্গুনে কে এক বার্তাবহ
দরদ জানাল, সে পরঘরণী ব'লে ॥

সে-দিন পহেলা ফাল্গুন : ঘাটে মাঠে
মদনসখার বিস্মিত অভিযান ;
বালারুণপ্রতিবিম্বিত পাথসাটে
নাচে পতঙ্গ, গায় বিহঙ্গ গান ॥

শুধু পেয়েছিল আমাকে মুমূর্ষাতে ;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে, মিশেছিলুম শয়নে আমি।
সয়েছি তখন যে-যাতনা প্রতি রাতে,
তা আমি জানি ও জানে অন্তর্যামী ॥

কিন্তু ধরল মরা ডালে ফের শীষ।
স্বাস্থ্যে কি আমি অক্ষয়বট তবে ?
তবু গূঢ় ক্ষতে চোয়ায় স্মৃতির বিষ
তাকালে তোমার তরুণ মুখাবয়বে ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

তত্ত্বকথা

ডঙ্কা পিটে শঙ্কা বিসর্জন,
পসারিনীর সুলভ সোহাগ কাড়া,
সেই তো সকল উপদেশের সার,
বেদ-বেদান্তে নেই কিছু তার বাড়া ॥

হাতের সুখে ঢাকের কাঠি নেড়ে,
পাড়ায় পাড়ায় ঘুম ভাঙিয়ে যাওয়া—
গুণী-জ্ঞানী তার বেশি কী করে,
যথেষ্ট নয় ঢাকের পিছু ধাওয়া ?

যা বলেছেন শঙ্করাচার্য, তা
বরঞ্চ কম সার্থকতায়, দামে,
জন্মাবধি ঢাকের মতো বেজে,
শিখেছি এই সত্য পরিণামে ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

গোধূলি

মাঝি-মাল্লার বৈকালী সভা :
আকাশ, বাতাস গোধূলি মাখে :
তার পাশে বসে, বাহিরে তাকাই,
যেখানে সিন্ধু অসীমে ডাকে ॥

জ্বলে একে একে দিশারী প্রদীপ,
আলোকমঞ্চ অভয়ে ভাসে ;
দূর দিগন্তে বিবাগী জাহাজ
এখনও দৃষ্টিগোচরে আসে ॥

আলোচনা হয় নাবিক জীবন :
তুফানে কী করে নৌকা ডোবে ;
শূন্যে ও জলে ঘেরা কাণ্ডারী,
দ্বিধাটলমল খুশিতে, ক্ষোভে ॥

অভাবনীয়ের লীলানিকেতন
অবাচী, উদীচী, প্রতীচী, প্রাচী :
আচারে, বিচারে বিপরীত মতি,
মানবসমাজ সব্যসাচী ॥

স্রোতে প্রতিভাত লক্ষ মানিক,
মত্ত মলয় বকুল বনে,
গঙ্গার তীরে সৌম্য পুরুষ
সমাধিমগ্ন পদ্মাসনে ॥

ল্যাপ্‌দেশীয়েরা বামনের জাতি,
নোংরা, হাঁ বড়ো, চ্যাপ্টা মাথা,
আগুন পোহায়, মাছ সেঁকে খায়,
কথা কয় না তো, ঘোরায় যাঁতা ॥

যে যা বলে, সে তা কান পেতে শোনে,
তার পরে মুখ খোলে না আর ;
দেখা যায় না সে-বিবাগী জাহাজ
বাহিরে গভীর অন্ধকার ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

এডুয়ার্ড মোরিকে

উৎসর্জন

হে প্রভু, তোমার যা ইচ্ছা তুমি দেবে
হোক প্রার্থিত হোক অনভীপ্সিত,
সেই দুটি ধারা নেমে আসে তোমারি তো
করপুট থেকে, সুখী আমি এই ভেবে।

যেন বা হর্ষপুলকে
অথবা দুঃখশোকে
সমাচ্ছন্ন কোরো না এ চিত্তকে !
মধ্যপথেই ঝরকে ঝরকে
অজস্রতায় শ্রেয়স্ রয়েছে জেগে।

সুপর্ণা সেন

হেমন্ত-সকাল

পৃথিবী এখনো সুপ্ত কুহেলীবিলীন ;
এখনো স্বপ্নের ঘোরে প্রান্তর বনানী।
অনতিবিলম্বে হবে উন্মোচিত এ অবগুণ্ঠন
অপাবৃত নীল নভ তোমার দু-চোখে দৃশ্যমান
নিস্তব্ধ পৃথিবী এই হেমন্ত আগুনে
যেন তপ্ত কাঞ্চনসন্নিভ।

মানস রায়চৌধুরী

থিওদোর স্তোর্ম

নিশীথে

দিবস বিগত হলো। এইক্ষণে করো অনুমতি
বাধাহীন পূর্ণশান্তি বর্তমানে উপভোগ করি !

এখন আমরা দোঁহে দুজনার ; পৃথিবীর প্রতি
আঘাত মোদের থেকে ভিন্ন করে পবিত্র শর্বরী ।

দুচোখ বোজার আগে হোক তব বিভা সে প্রেমের
প্রজ্বলন্ত পুনরায় একবার সঞ্চয়বিহীন ;
অনুভব করি আমি তব প্রিয় কণ্ঠস্বর ফের
তোমার স্বপ্নের মাঝে হবে বলে এ-স্বর বিলীন ।

কী আর সেখানে আছে ?   সুশীল সে বালক ইশারা
বারংবার করে তটে বন্ধুভাবে আর প্রলোভনে ;
বক্ষ তব কম্পমান শ্বাসাঘাতে হয় দিশাহারা,
নিদ্রার তরঙ্গে ভাসি ধীরে ধীরে আমরা দুজনে ।

কমলেশ চক্রবর্তী

ক্লাউস গ্রোৎ

বিদায়

এতোই শ্রান্ত এমনই নম্র, ধীর, ছিল সে মেয়েটি ছেলেটির খুব প্রিয়,
বুড়ো বাপ তার ঘোরে গম্‌গম্‌ রাগে, বলে 'ও হলো কী ?
নিজেকে ভেবেছে কী ও ?'

মেয়েটি তল্পি তুলে নিল বাহুমূলে, অশ্রুর ভারে ঝল্‌মল্‌ দুটি চোখ ;
ধীর পায়ে এসে বুড়োটিকে বলে 'বিদায়', ছেলেটিরে তার বলে যায়
'ভালো হোক !'

ফিরে চলে যায় প্রাঙ্গণকোণে, দূরে, পথের পাথরে বসে থাকে অবিরল,
বুড়ো ঘুরে ঘুরে গম্‌গম্‌ করে রাগে, ছেলেটি নিথর, চোখে নামে ধারাজল ।

শঙ্খ ঘোষ

কনরাড ফার্দিনান্দ মেয়ার

রোমের ফোয়ারা

ঊর্ধ্বে উঠেই নিচে নামে ও-ফোয়ারা,
ভরে দেয় গোল মর্মর জলাধার ;
প্রথম আধার থেকে সেই বারিধারা
দ্বিতীয় আধারে দ্রুত নেমে আসে। আর
দ্বিতীয় আধার ভরলে সে-জল গিয়ে
তৃতীয় আধারে নামে। এক, দুই, তিন—
মিলিত লীলায় জল দিয়ে, জল নিয়ে
বিশ্রামভরে ওরা বহে সারাদিন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ফ্রিডরিখ নীৎসে

অগ্নিশিখা

জানি, আমি জানি, কোথায় উৎস মম !
আমি লেলিহান অগ্নিশিখার সম,
তারই মতো আমি আত্মদাহনকামী যে।
আমি যাকে ছুঁই, জ্বলে সে তখনি। আর
যা-কিছুকে ছাড়ি, পড়ে থাকে অঙ্গার।
তৃপ্তিবিহীন আগুনের শিখা আমি যে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পথিক, তার ছায়া

ফিরতে কি আর পারব না আমি ? এগোতেও পারব না ?
এমন-কি ওই পাহাড়ি হরিণ, ওরও পথ নেই খোলা ?

তবে এখানেই থেকে যাই আর স্থির ধরে রাখি সবই—
দুহাতে আমার দুচোখে আমার যা-কিছু পরশ লভি।

সামনে ছড়ানো পাঁচ ফুট জমি, এবং উষসী, আর
নিয়ে আমার ভুবন, মানব এবং মরণভার!

শঙ্খ ঘোষ

আর্নো হোলৎস্

বিগ্রহ

নিশীথে আমার এই মন্দির-প্রাঙ্গণে
ধাতুময় সপ্ত ধেনু জাগে,
বিচিত্র পাষাণদীপ জ্বলে সারারাত
মিট্ মিট্ মিট্ লাখে লাখে!

আমি লীলাভরে,
গভীর মন্দির গর্ভে বসি গুপ্ত ঘরে,
রত্ন-বেদী 'পরে!
চন্দনের কড়িকাঠ সারি, সারি, সারি,
সারারাত চেয়ে চেয়ে দেখি;
বসে থাকে তারাগুলি ঘুলঘুলি জুড়ে,
মিট্ মিট্ মিট্ করে আঁখি।

আমি যদি দাঁড়াইয়া উঠি একবার!—
গুঁড়া হয়ে পড়ে যাবে ছাদ;
ডিম্বাকার হীরকের তৃতীয় নয়ন
ঠেকে ভেঙে ফেটে যাবে চাঁদ।
উঠিব না,—থাক!
স্থূলোদর পূজারীরা ডাকাইয়া নাক
নিশ্চিন্তে ঘুমাক্!

যোগাসনে, তার চেয়ে বসে এক মনে
নিজের নাভিটি ধ্যান করি ;
পদ্মরাগ-বিমণ্ডিত নাভিপদ্ম, আহা !
কিবা শোভা ! কিবা কারিগরি !

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

স্তেফান গেয়র্গ

তাঁর মধ্য দিয়ে

যা কিছু অচিন্তনীয়, সে সব ভেব না মনে আর
যত ডুব দাও ততো প্রতিবিম্ব প্রবাহ নিটুট ;
যে অনমনীয় হাঁস খুঁজে ফিরেছিলে, ডানা যার
আলুথালু আদর করেছ, কাছে ঘিরেছে তোমার করপুট
বলেছিলে তার মধ্যে হৃত প্রতিরূপ আছে তোমার সত্তার
সেও প্রত্যর্পিত দেখি ধন্যবাদ না দিয়ে তোমাকে,
কিন্তু ঘৃণাশূন্য চোখে মৃত্যুমুখে ছড়ায় বিস্ফার
সর্বশেষ চাহনিতে তোমার উদ্দেশে তিরস্কার
তাঁর মধ্য দিয়ে খুঁজতে গিয়েছ অন্য জীবন প্রমা-কে ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কেন নিমজ্জিত রও

"কেন নিমজ্জিত রও বাঁশরী ও উন্মুক্ত বিষাণে
যৌবনের দিনগুলি ওড়াও তাথৈ অপব্যয়ে ?"
কিন্তু প্রভু, এ কেমন প্রতিষেধ পুত্রদের কাছে ?
তোমার বন্দনা গানে বরং অশান্তি চাই আরো,
নিরন্তর তীর্থযাত্রা উপজীব্য সেই তো আমার,
তোমাকে শিকার করে ফিরি যেন, যদ্যপি না পাই ।

দিনরাত্রি রাত্রিদিন এ ছাড়া করিনি আর কিছু
চোখ মেলে যেইদিন জাগ্রত হয়েছি, তদবধি
তোমাকে খুঁজেছি শুধু, তোমাকেই, প্রতি বাঁকে বাঁকে ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রত্যাবর্তন

ফিরে এলো আত্মজ আমার।
চুলে তার কবেকার সমুদ্র-বাতাস আছে লেগে।
বিভীষিকা ঢেকে রাখে যেন
ভ্রমণের স্ফূর্তি আর চপল গতির ভঙ্গ তার।

কপোলের বাদামী বিভায়
আজো যেন লেগে আছে লবণছটার কত দাহ,
যেন কোনো তীব্র এক ফল,
অচেনা সূর্যের তাপে বন্য ঘ্রাণে দ্রুত পরিণত।

দৃষ্টি তার মন্থর, আতুর,
কিসের গোপন ভারে আমি কোনোদিন জানব না।
ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন যেন
ও' ওর বসন্ত থেকে এলো আমাদের বৃষ্টিদিনে।

এতো দীর্ঘ খুলে গেছে কলি
যেন আমি তার দিকে চেয়ে দেখি বড়ো ভয়ে ভয়ে
ওই মুখ থেকে থাকি দূরে
ও-মুখ নিয়েছে খুঁজে অন্য কোনো চুম্বনের মুখ।

দুই বাহু দিয়ে রাখি ঘিরে
কিন্তু সে নিঃসাড়ে কবে চলে গেল আরেক ভুবনে
সরায়ে নিয়েছে তারে দূরে—
আমারই সে বটে, তবু আমার অসীম ব্যবধানে ॥

শঙ্খ ঘোষ

আউগুস্ত স্ত্রাম

পেত্রো

পাথরগুলি বৈরিতায়
জানলা দেখায় প্রবঞ্চক দাঁত
বৃক্ষশাখা রুদ্ধ করে শ্বাস
পাহাড়ি ঝোপ মর্মরিত আরোহী তান
মৃত্যু
আর্তনাদে

মানস রায়চৌধুরী

বিষাদ

পদক্ষেপ বিপুল প্রয়াসের
জীবন অভিলাষী
ভয়কম্পন সারাক্ষণ
দৃষ্টি বাসনায়
মৃত্যু ক্রমে প্রসারিত
আর্তনাদ ওইতো কাছে আসে
গভীর তলদেশে
আমরা
তবু
মূক !

মানস রায়চৌধুরী

হুগো ফন্ হোফ্‌মান্‌স্তাল্

অবসান

উজ্জ্বল রূপালি বাষ্পে আলোকিত সারা উপত্যকা,
মেঘ-চোয়া জ্যোৎস্না যেন ; যদিও এখন রাত্রি নয় ।

আমার সমস্ত মৃদু ভাবনা যে গন্ধে গন্ধে মেশে
রূপালি রহস্যে এই। জীবনের তীর ছেড়ে আমি
ধীরে ধীরে ডুবে যাই সেই স্রোতে—স্বচ্ছ সাগরের।
সেইখানে ফুলগুলি জ্বলন্ত হৃদয়ে অপরূপ।
দাঁড়িয়ে ওষধি ঘন, তা থেকে নির্গত আলো এক,
গলানো ধাতুর মতো সোনালি রক্তিম,
উষ্ণ এক ব্যথা হানে। প্রান্ত হতে প্রান্তের অবধি,
শোনো, সেই উপত্যকা ভরে আছে বিষণ্ণ সঙ্গীতে।

সেই গান জানি আমি,
কী মর্ম বুঝি না সে-গানের, তবুও সে-গান জানি :
সেই গানই স্বয়ং মরণ। মরণই তো গান হয়,
অতি সূক্ষ্ম অসাধ্য বুননে, অন্ধকারে ভরা, তবু উজ্জ্বল মধুর,
গাঢ়তম দুঃখের মতন।

তবু কী অদ্ভুত—
অনামী প্রতীক্ষা এক কাঁদে কেন আমার হৃদয়ে
নিঃশব্দে তা কাঁদে শুধু, জীবনের ঘরে যাবে ফিরে,
তাই কাঁদে, কাঁদে একা; নীল সন্ধ্যা নেমে আসা অনন্ত সাগরে
বিশাল সোনালি পাল-দেওয়া অতিকায় পোতে চড়ে
কোনোদিন আপন দেশের পাশ দিয়ে যেতে যেতে
যে-রকম কেঁদে ওঠে কেউ তার প্রিয়, অতি প্রিয় :
তার আর পিতৃপুরুষের :
জন্মভূমি পানে চেয়ে। তার চোখে ভেসে ওঠে ফের
সে সব পুরনো পথ;
ফের বুঝি ভেসে আসে সে নদীর মর্মধ্বনি, লাইলাক-ঘ্রাণ;
দেখে সে আবার, ছোট্ট শিশু হয়েছে নিজেই,
শিশুর আশ্চর্য চোখে বেলাভূমে রয়েছে দাঁড়িয়ে,
একটু-বা ভীত আর কেঁদে কেঁদে লাল। দেখে সে আবার
খোলা জানালাটা তার, আলো-জ্বলা তার ছোটো ঘর।

তবু সেই অতিকায় বিরাট জাহাজ ভয়ংকর নির্বিকারে
ভাসিয়ে নিয়েই যাবে তাকে
দানবিক পাল নেড়ে কালো নীল জলের উপরে ॥

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

বহির্জীবনের গাথা

এবং শিশুরা ক্রমে বেড়ে ওঠে আয়ত নয়নে
নিষ্পাপ, জানে না কিছু, বেড়ে ওঠে আর ঝরে যায়
এবং সকল লোক চলেছে তাদের পথে পথে।

এবং কষায় থেকে ফুটে ওঠে মধু ফলগুলি
এবং নিশীথবেলা ঝরে যায়, যেন মৃত পাখি
এবং ধুলোয় তারা থেকে থেকে শুকায় ক-দিন।

এবং বাতাস ঠিক বহে যায় যেমন সতত
আমরাও শুনে যাই বলে যাই কত কথামালা
এবং শরীরে কত অনুভব, স্ফূর্তি অবসাদ।

এবং ঘাসের বুকে কত পথ গিয়েছে, কত-না
এখানে-সেখানে সব মশালে পুকুরে গাছে ভরা
যেন বিভীষিকা, যেন মৃত্যুর মতন শীর্ণ লাগে···

কী জন্য রচিত ওরা? কেউ কারো অনুরূপ নয়?
কেন এতো সংখ্যাতীত? কেন এতো বিপরীতক্রমে
হেসে ওঠা, কেঁদে ওঠা, মলিন বিবর্ণ হয়ে যাওয়া?

এতে আমাদের কী-বা আসে যায়, অথবা ঘাসের,
আমরা বয়সী যারা, চিরন্তন অনুভব একা,
আমরা কি ঘুরে যাব, লক্ষ্যহীন ঘুরে যাব শুধু?

এর কোনো অর্থ আছে, এতো সব দৃশ্য দেখে যাওয়া ?
এবং তথাপি সে তো বেশি বলে যে-বলে 'বিদায়'
সেই শব্দ, বুকে যার বিষাদ-মহিমা ক্ষরে পড়ে

যেমন মৌচাক থেকে ঝরে মৃদু ঘন মধুধারা।

শঙ্খ ঘোষ

কার্ল ক্রাউস

বসন্ত

তোমার ভুবন আজ ঝরিয়ে এসেছ জীর্ণ মঠে
হেমন্তের স্বর, তুমি চাঁদের ধূসর সহোদরা,
তুমি তীব্র বাতাসের যেন অতি নম্র বধূলতা,
ধাবমান নক্ষত্রের তলে একা নির্বাসিত তুমি—

তোমারে ফিরায়ে দিল সে কি মনে অতল আহ্বান ?
সে তবে প্রলয় ঝড় ফিরে দিল জীবন তোমার ?
যেন ঠিক সেইমতো, দেখো আদি মানবমানবী
সুচারু দ্বীপের বুকে দেবতারে ফিরে এনে দেয়।

এই তো বসন্ত আজ। শিহরিত আনন্দের দূতী,
বিশ্বের তুহিন ভেঙে ছুটেছে সোনার প্রজাপতি !
নত করো জানু, স্তব, শোনো কত শান্ত বসুন্ধরা,
কেবল তো সে-ই জানে, কারে বলে ত্যাগ, অশ্রুজল।

শঙ্খ ঘোষ

হেমন্ত

পাতা ঝরে, পাতা ঝরে, ঝরে পাতা যেন দূর থেকে
যেন ঊর্ধ্বে ঝরে যায়, দূরতম প্রান্তের কানন।
আরো, আরো ঝরে যায়, ভঙ্গিতে জানায় প্রত্যাখ্যান।

আর ধীর রাত্রির গহনে পৃথিবীর ভার ঝরে যায়
তারার শৃঙ্খল থেকে নিঃসঙ্গ আঁধারে।

আমরাও ঝরে যাই। এই হাত– তাও ঝরে পড়ে।
চরাচরে এই রোগ সংক্রমিত, মুক্তি নেই কারো।

তবু আছে একজন—তার হাত নির্ভার নির্ভরে
যত ঝরে, ধরে থাকে, তার ফাঁকে কিছুই ঝরে না।

বুদ্ধদেব বসু

অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট

তা পারে দেবতা। কিন্তু মানুষ কেমনে
করে সেই সূক্ষ্ম-তার বীণার অনুসরণ ?
চেতনা দ্বিখণ্ড তার। আপোলোর মন্দির তোরণ
ওঠে না, দ্বিধায় ভরা হৃদয়ের পথের সংগমে।

•

তুমি যে-গানের গুরু, সে তো নয় বাসনা, প্রয়াস,
নয় কোনো অন্তিম লব্ধেরে পাওয়া, ফিরে ফিরে সাধা ;
অস্তিত্ব—তা-ই তো গান। দেবতার তাতে নেই বাধা।
কিন্তু কবে আমাদের হবে ? কবে এই নক্ষত্র, আকাশ,

আর পৃথিবীরে, আমাদের ফিরিয়ে দেবেন তিনি ?
শোনো, ছেলে, সে তো নয় প্রেমে পড়া, যাতে আকস্মিক
আবেগে বাঁধন ছিঁড়ে মৌন মুখে ঠেলে ওঠে বাণী :

ভুলে যাও কোনোদিন গিয়েছিলে। সে-গান ক্ষণিক।
সার্থক গানের উৎস অন্য এক অলক্ষ্য নিশ্বাস।
নিশ্বসিত শূন্য এক। ঈশ্বরে শিউরে ওঠা। একটি বাতাস।

বুদ্ধদেব বসু

সনেট

হে মহানীরব বন্ধু দূরাশ্রিত, অনুভব করো
সীমারে অসীমা করে এখনো তোমার পুণ্যশ্বাস,
গম্ভীর ঘণ্টার ঘর তোমার স্বননশব্দে ভরো,
যা-কিছু তোমাকে নেয় হয়ে ওঠে স্পন্দিত বিকাশ :

যার অধমর্ণ, দেখি, তারো চেয়ে সামর্থ্যে সুঠাম।
পরিবর্তনের সঙ্গে হও তুমি ম্লান ও উজ্জ্বল।
সব চেয়ে দুঃখী যাতে বলো বলো সে দুঃখের নাম।
তিক্ত সুরাপান যদি, নিজে হও সুরা অনর্গল।

হও, এ অমেয় রাত্রির আকাশতলে
তোমার মায়াবী নানা ভাবনার জটিল বিদ্যুতে
সে-অভিসারের তলে সঙ্কেতের জটিল মৌমাছি :

আর, যদি এই মাটি তোমাকেই ভোলে,
ধীরা ধরণীকে বলো : আমি চলি ছুটে—
অস্থির ধারাকে বলো : ওরে, আমি আছি, আমি আছি।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পৃথিবী যদিও

পৃথিবী যদিও দ্রুত পরিবর্তনে
লঘু মেঘ সঞ্চয়,
তবু অক্ষয় শাশ্বত নিকেতনে
পূর্ণ জ্যোতির্গময়।

জনতাজটিল গর্জন পার হয়ে
উদাত্ত স্বরাঘাতে,
রণিত তোমার আবাহনী স্তোত্র-এ
ঈশ্বর বীণা হাতে।

আমরা এখনো ভুল বুঝি বেদনারে
আমাদের প্রেম শুরুই হয়নি ওরে,
মৃত্যুও যত রহস্য তার ভিতরে
পর্দায় আজো ঢাকা,
জাগো শুধু গান ধরণী কেন্দ্র করে
জ্যোতির আরতি আঁকা॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শোকগাথা

প্রত্যেকটি দেবদূত দুর্বিষহ। তবু হায় সে কথা জেনেও
আবাহন করি আমি তোমাদেরই, সত্তার দুর্ধর্ষ পক্ষিকুল;
তোমাদের, সব জেনে, ডাকি। হায়, কোথায় সে টোবিয়ানকাল
যবে কোনো দীপ্তিমান দাঁড়াত সহজ দেহলিতে,
যাত্রায় উদ্যত কিন্তু ঈষৎ প্রচ্ছন্ন, নয় সে তো নয় ভয়াবহ,
(যুবার সকাশে যুবা, সে যখন কৌতূহলে বাহিরে তাকিয়ে)।
হয় হোক দেবদূত ভীষণ ভীষণানাং নক্ষত্রলোকে পার হতে

তবু নামো একস্তর আমাদের অভিমুখে, উর্ধ্বে উর্ধ্বস্পন্দন বুকের
আমাদের হৃদয় লঙ্ঘন করে আমাদেরই। কিন্তু, কে, তুমি কে ?

আদি সার্থকতাপুঞ্জ, সৃষ্টির যতেক সমাদৃত ;
গিরিশ্রেণী, গিরিচূড়া, উষা আরক্তিম শৈলমালা
প্রারম্ভের, মঞ্জরিত পরমেশ্বরের পুষ্পরেণু,
আলোর দুয়ারে গ্রন্থি, দীঘল বারান্দা, সিঁড়ি, সিংহাসন যত,
অস্তিত্বের পরিসর, মাধুর্যের আচ্ছাদন, ঝঞ্ঝা উন্মুখর
দিব্যোন্মাদ অনুভূতি, কিন্তু অকস্মাৎ, দূর করে
মায়াবী মুকুর, ওরা নিজেদের
সৌন্দর্যপ্রবাহ করে নিজ নিজ বয়ানে সংহৃত।

অথচ আমরা, যবে অনুভব করি, কর্পূরের মতো যাই মুছে।
নিজেদের সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিই, নিঃশেষেই ; স্তিমিতাভ অঙ্গারে অঙ্গারে
ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ গন্ধ রেখে যাই অবশ্যই, আমাদের কেউ বলতে পারে,
"ওগো তুমি মিশেছ আমার রক্তে, এই ঘরে এই চৈত্রমাস
তোমারি মায়ায় প্লুত" ...
তাতেই কি ? সে কি আর ধরে রাখতে পারে ?
আমরা মিলিয়ে যাই, তাকে ঘিরে। উপরন্তু, যা-কিছু সুন্দর
কে তাকে ধরে রাখতে পারে বলো ? নিত্য নব স্রোত
তাদের মুখের পরে আসে যায়। প্রাতে যথা ঘাসের শিশির
তেমনি সে আমাদের সব-কিছু নিয়ে যায়, অথবা যেমন
ধূমায়িত পিরিচের থেকে ভাপ। সে-হাসি কোথায় ? ঐ প্রাঙ্‌মুখ ঈক্ষণ
সদ্য, উষ্ণ, হৃদয়ের লীয়মান ঢেউ— কিন্তু হায়,
আমরা ততোটুকুই, তার বেশি নই। আমরা অন্তরীক্ষ বিশ্বচরাচর
নিজেদের আস্বাদনে পরিণত করি তবে ? সত্যই কি যত দেবদূত,
নিজ নিজ সর্বস্ব অটুট রাখে যা গেছে তাদের থেকে বয়ে, কখনো বা
যা এড়িয়ে গেছে, তা-ও। কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের
কোনো প্রত্যংশের পক্ষে তা কি সাধ্য ? নাকি আমাদের
ভিতরে মিশেছে সে-ই অস্পষ্ট চাহনি গর্ভবতী

নারীদের মুখে যা ছড়িয়ে থাকে, তারা কি দেখেছে! তারা ঘূর্ণাবর্তনে
ফিরে-ফিরে নিজেদেরই কাছে (ওরা কি করে দেখবে ?)

প্রেমিকেরা, বুঝি ঠিক, যদি পারে তারাই তো পারে
মধ্যরাতে উচ্চারিতে আশ্চর্য সংবাদ। ভাবি, সবই আমাদের
প্রচ্ছন্ন করতে চায়। ঐ দেখো, বৃক্ষঅস্তি ; দেখো আমাদের
বাসস্থল যেখানে বস্তুত ছিল, সেখানেই অদ্যাপি। তা হলে
আমরাই সরে যাই বাতাসের মতো ছন্নমতি।
সবই যেন আমাদের দমন করতে চায়, বুঝি
অংশত লজ্জায়, অনির্বচনীয় আশায় অংশত।

পরস্পর পরিতৃপ্ত প্রেমিকেরা, তোমাদের কাছে আমাদের
প্রশ্ন উত্থাপন করি। তোমরা দৃঢ় আবদ্ধ, প্রমাণ পেয়েছ ?
অবধান করো, আমার দুখানি হাত মাঝে-মাঝে
পরস্পর সচেতন হয়ে ওঠে, কখনো আমারি খিন্নজীর্ণ মুখ
তাদের ভিতরে খোঁজে, মাথা গোঁজে। আমাকে ঈষৎ প্রাণোত্তাপ
জোগায় তা। কিন্তু শুধু সেটুকুর সৌজন্যে কে বাঁচে ?
যদিও তোমরা বেড়ে ওঠো
অন্যোন্যের উন্মাদনে, যে পর্যন্ত পর্যাপ্তির ভারে
প্রেমিকটি বলে ওঠে 'আর নয়' ; দোঁহে দোঁহাকার করতলে
ফসলবেলার আঙুলের চেয়ে আরো যে প্রচুর ;
থেকে-থেকে মূর্ছিত যেহেতু অন্যজনে
অতখানি বিস্তারিত। আমাদের বিষয়েই আমি সমুৎসুক ;
জানি কেন মহানন্দে স্পর্শ করো : আদরেই ধরে রাখা যায়,
কেননা যেটুকু ছাউনি ঘিরে থাকো পরম যতনে
মোছে না তা ; তারি নিচে উপলব্ধি করো
শুদ্ধ স্থিতি। তোমাদের আলিঙ্গনে এই দিল বুঝি
অনন্তের প্রতিশ্রুতি, কিন্তু বলো, সেই যে পেয়েছ
সচকিত সন্দর্শন বাতায়নে তীব্র জাগরণ,
প্রথম সেই দুজনে, একবার, বাগানের পথ হেঁটে-যাওয়া,

বলো, তোমরা কি আজো আছো সেই ? যবে উর্ধ্বে তোলো
এ ওর অধরে ওষ্ঠ—পুলকে অধর পান করো :
যেই জন পান করে সে কেমন দায়িত্ব এড়ায় !

অ্যাটিক স্মৃতি-ফলকে মানবিক তীব্র সে ভঙ্গিমা
তোমাকে কি অবাক করেনি ? প্রেম এবং বিদায়
অংসদেশে কেমন্ সহজে ন্যস্ত, সেকি আমাদের
অচেনা ধাতুতে গড়া নয় ? ভেবেছ, কি করে হাত
ভারসাম্যে রহে আরোপণ ছাড়াই, ধড়ে যদিও-বা শক্তি ছিল ;
আত্মস্থ পুরুষদের প্রজ্ঞা ছিল এই : আমাদের সেই উত্তরাধিকার ;
আমরা-ও এ অন্যকে এইভাবে যেন ছুঁই ; দেবতারা আমাদের প্রতি
হয়তো অধিকতর ক্ষিপ্রগামী, কিন্তু সে দেবতাদের কথা
যথেষ্ট, আমরা যদি পেয়ে যাই শুদ্ধ, অনুস্যূত
সীমায়িত, মানবিক, নিজেদের একখণ্ড ফলের বাগান,
জল আর পাহাড়ের মধ্যভাগে ! কারণ আর সবার মতো
আমাদের হৃদয় এড়িয়ে যায় আমাদের, আমরা-ও আর
সে সব প্রতিমা আর দেখি না যা জুড়ায় হৃদয়,
দেখি না চিদ্‌ঘনমূর্তি যাতে ঘটে নিবৃত্তি মহান্ ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এপিটাফ

পরিশুদ্ধ অসংগতি, হে গোলাপ, সবাকার চোখের পাতায়
বিরাজো অথচ নও কারো নিদ্রা নও, সেই সুখ ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ফুল, গাছ, পাখি

উজ্জ্বল হও একাই হৃদয়
সময়ের অনুকূল।
সে-নারী ছায়ায় দিন গুনে যায়
যন্ত্রণা, নীল ফুল।

দুঃখের গাছ এখন বাড়ায়
চারিদিকে তার ডাল,
তাতে গান গায় সবুজ পাতায়
পাখি, বহমান কাল।

যন্ত্রণা, ফুল, নীরব নিঝুম
কথা তার লোপ পায়,
গাছ বেড়ে ওঠে স্বর্গের তটে,
পাখি গান গেয়ে যায়।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

রাত্রি

আমি আমার মোমের আলো নিভিয়ে দিলাম, এখন
রাত্রি আসে, প্রচুর রাত, সীমানাহীন
সাঁত্‌রে আসে, আলিঙ্গনে জড়ায় আমায়, ডাকে
সোদরপ্রতিম, বন্ধু আমার, বলে।

নম্র ব্যথার সঙ্গী আমি, আমরা দু'জন
স্বপ্ন যত দীর্ঘায়িত পাঠিয়ে দিলাম, বেড়াক ভেসে,
ফিস্‌ফিসিয়ে পরস্পরে আলাপ করি : অন্য সময়—
যখন ছিলাম পিতার ঘরে সম্মিলিত।

দিব্যেন্দু পালিত

হান্স্ কারোসা

তারার গান

আকাশে কাল অনেক তারা জ্বলবে ;
আমার জন্যে কাঁদবে তুমি শোকে ;
তাকাবে মৃত জানালা দিয়ে, ক্লান্ত।
তখন তোমার দৃষ্টি অনেক দূরে,
ছুটবে শেষ তারার পিছু পিছু।
এবং হাজার হাজার ছোটো তারা
দেখবে তুমি সূর্য যেমন বড়ো,
চোখের জলের ভিতর দিয়ে সব।

দিব্যেন্দু পালিত

এরনেস্ত স্টাডলার

গ্রীষ্ম

আমার হৃদয় ঋজু দাঁড়িয়েছে ফসলের উজ্জ্বল হলুদে
গ্রীষ্মের আকাশতলে যেন ক্ষেত, শস্য তোলা হবে
এখনই কাস্তের গানে বেজে উঠবে এই সমতল
গভীর আনন্দে প্লুত রক্ত আছে কান পেতে, দুপুরবেলার উষ্ণতায়—
হে আমার জীবনের শস্যাগার রিক্ত বহুকাল
তোমার সমস্ত দ্বার উন্মোচিত হবে যেন ঢেউ এসে খুলে দেবে
সেতুর কপাট
খামারের শূন্যতাকে ভাসিয়ে সমুদ্র যাবে তরঙ্গিত হিরণশস্যের।

মানস রায়চৌধুরী

রূপ-ই আনন্দ

প্রথমেই ছাঁচ এবং শিকল ভেঙে ফেলা চাই
এই জগতকে নিয়ে চলো খোলা ছিদ্রপথে :

রূপে আনন্দ, শান্তি এবং স্বর্গীয় সন্তোষ,
কিন্তু আমার লক্ষ্য ভূমিতে লাঙলের ব্যবহার।
রূপ তো চেয়েছে আমাকে পিষ্ট করতে রুদ্ধশ্বাস
কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা, হব প্রসারিত দশদিকে—
জেনেছি তো রূপ করুণাবিহীন স্পষ্টই কঠিনতা
তবুও আমাকে ছুটে যেতে হয় যেখানে অভাব, জড়তা
আর যেই আমি নিজেকে ছড়াই সীমাহীনতায়
জীবন আমার পিপাসা পূর্ণ করে সাফল্যে।

মানস রায়চৌধুরী

গটফ্রীড বেন

ক্যান্সার ওয়ার্ড দিয়ে

অনেক প্রসূতির স্ফীত মৃতদেহ সারি সারি হয়েছে এখানে বিগলিত,
এবং তাদের মধ্যে অনেক পীনস্তনী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে জীর্ণ হয়েছে,
পাশাপাশি সাজানো শয্যাগুলি বিবর্ণ, দুর্গন্ধ ছুঁড়ে দেয়,
ওরা তা বদল করে করুণাকাতর হাতে।

এসো, শুশ্রূষার মমতা সঙ্গে নিয়ে, ধীরে ধীরে উন্মুক্ত চাদরটাকে তুলে
দেখতে পাবে হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে কিংবা আতঙ্কে,
ত্রাসে, মাংসপিণ্ড বিস্তৃত শরীরে
শুয়ে আছে; তাকে একদিন মূল্যবান মনে হয়েছিল কোনো পুরুষের কাছে,
বিকিরণ করেছিল প্রেম স্নেহও, এবং উত্তাপ, এক গৃহে।

এসো, এখন দেখতে পাবে ভীষণ সেই ক্ষত, আঁকা তার বুকে।
সার্জনের করস্পর্শেও কাতর হয় না হায় গোলাপি নরম শিরাগুলি,
রেশম দড়ির মতো জটাযুক্ত; ভয় পাও নাকি? মাংস গলে পড়ে নরকে।

দেখবে ওইখানে একজন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বিপন্ন, যেন
ত্রিশটি শরীর থেকে রক্ত ঝরে, এতো রক্ত ঝরে ;
ওরা অবশেষে অপসারিত করতে পেরেছিল এক নবজাতক,
মাতৃগর্ভ থেকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রোপচারে, ক্ষত থেকে।

এখন ঘুমোক ওরা, দিনে, রজনীতে, দীর্ঘ অন্ধকারে, কিংবা আলোতে।
ওরা নবাগতদের কানে মন্ত্রপড়ার মতো বলে : এখানে ঘুমালে
শরীর ভালো হবে। কিন্তু রবিবারে
খুঁচিয়ে জাগায় ওরা, সুপ্তি থেকে সহসা উত্থিত, দারুণ স্বপ্ন ভেঙে
পর্যবেক্ষক চক্ষুতে ধরা পড়ে রক্তহীন দেহগুলি।

একটু খাবার খায় হয়তো সেদিন ওরা কবরখানায়, বিভীষিকা
যাদের বন্দী করে রেখেছে। পৃষ্ঠে কারো ক্ষত ; মাছি ঘুরছে।
কখনো বা সিস্‌টার ধুয়ে দেয় এমন নিস্পৃহ অভ্যাসে ঘা,
যেন কেউ বেঞ্চ ধুচ্ছে।

এখানে এলেই মনে হয় বিষাদ মাখানো সব, কবর উঠেছে যেন
প্রতি শয্যাপার্শ্বে, নতজানু হয়ে কাঁদে কেউ কাতর প্রার্থনায়
প্রাণের আগুন জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

দিলীপ রায়

শস্যখেতের সামনে

শস্যপ্রান্তরের উপান্তে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল :
ঘাসফুলের আনুগত্য আর বায়বীয়তা
রঙিন মহিলাদের কাছে চমৎকার এক নকশার মতো।
আমি কিন্তু বেছে নেব আফিম ফুলের গভীর গানের গলা,
তা জমে-যাওয়া রক্ত আর রজঃস্রাবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়,
মনে পড়ায় চাপ, শ্বাসকষ্ট, ক্ষুধা আর পটল তোলার কথা—
অর্থাৎ, পুরুষের ধূমল পথটাকে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি শব্দ, একটি বাক্যবন্ধ

একটি শব্দ, একটি বাক্যবন্ধ :—শূন্যের মধ্য থেকে উঠে আসে
অনুভূত জীবন, আকস্মিক চেতনা,
সূর্য নিশ্চল, স্তব্ধ বৃত্ত,
কেবল সব-কিছু এগিয়ে আসছে একটি শব্দের কেন্দ্রে।

একটি শব্দ—আলোর এক ঝলকানি, পাখা-মেলা এক
উৎক্রান্তি, এক আগুন,
আগুনের এক ঘোরানো শিখা, ছিটকে-বেরিয়ে-আসা
একটি নক্ষত্র,—
এবং অন্ধকার আবার, বিশাল আর দানবিক,
পৃথিবীর আর আমার চারপাশের শূন্য প্রান্তরে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গেয়র্গ ট্রাক্‌ল্‌

শীতের সন্ধ্যা

তুষারপাতে ঢাকে যখন এই বাতায়ন
সান্ধ্য ঘণ্টা দীর্ঘ ধূলিময়
পূর্ণ টেবিল বহুজনের তরে
অন্তরালে প্রচুর আয়োজন।

•

অনেকে আসে ভ্রাম্যমাণ, অন্ধকার
পথের শেষে বহির্দ্বারে,
ধরিত্রীর শীতল রসের উৎস থেকে
লাবণ্যের বৃক্ষ ফোটায় হিরণ্যাভা।

ঘরে প্রবেশ করে পথিক শান্ত পদপাতে,
যন্ত্রণায় ভস্মীভূত হয়েছে তার সীমা।
অপার্থিব দ্যুতিতে যেন রুটি এবং সুরা
জ্যোতির্ময়, টেবিলে ওইখানে।

মানস রায়চৌধুরী

ইঁদুর

শরতের শ্বেতচন্দ্র উজ্জ্বল উদ্যানে,
অলৌকিক ছায়া সব নামে ছাদ থেকে।
জানালার শূন্যতায় ছুঁড়লে নৈঃশব্দ্য,
তারপর শব্দহীন ইঁদুরেরা আসে।

ধ্বনিময় ছোটাছুটি এখানে সেখানে
আর যেন ভয়ানক গন্ধ কম্পমান
আসে তার পিছুপিছু শৌচাগার থেকে
চন্দ্রালোক ভূত হয়ে নীরব বিমূঢ়।

পুনরায় লোভে করে প্রমত্ত চিৎকার
ভরে তোলে গৃহ আর সব গোলা"র
স্তূপ করা ছিল ফল এবং ফসল।
কেঁদে ফেরে অন্ধকারে শীতল পবন।

কমলেশ চক্রবর্তী

গেয়র্গ হেইম

যুদ্ধ (১৯১১)

ছিল দীর্ঘ সুপ্তিতলে, বহুদিন, যুগযুগান্তর,
আজ উঠে দাঁড়াল সে ছেড়ে শূন্য অতল গহ্বর।

শালপ্রাংশু পরিব্যাপী সে অচিন, গোধূলিছায়ায়,
দুই কৃষ্ণ করতলে চন্দ্রকলা চূর্ণ করে যায়।

মুছে যায় নগরীর সান্ধ্য কলতান চারিধারে
বিরূপ আঁধার থেকে ঝরে-পড়া ছায়ায়, তুষারে।
বিপণির ঘূর্ণ্যতাল চকিতে তুহিন, নীরবতা ;
পরস্পর মুখপানে তাকায়, বোঝে না কোনো কথা।

পাশের গলিতে যেন কে মৃদু রেখেছে কাঁধে হাত,
কী শুধায়। সব চুপ। কোন্ মুখে পাংশু বর্ণপাত।
কোথায় ঘণ্টার ক্ষীণ রিনিরিনি শিহরায় দূরে
তীক্ষ্ণ চিবুকের প্রান্তে ভয়ে যেন কাঁপায় শ্মশ্রুরে।

এদিকে তো সে উদ্দাম পাহাড়ে পাহাড়ে নৃত্যরত,
বিকট চিৎকার—'ওঠো, যোদ্ধদল, ধাও শত্রুযত' !
আর সে নিকষ মাথা যখন ঝাঁকায় ঝন্‌ঝন্
সহস্রকরোটিমালা ঘিরে তোলে সুতীব্র স্বনন।

সে যেন মিনার, মুছে নিয়ে যায় শেষতম জ্যোতি
যেথা দিন ধাবমান, শোণিত প্রবাহে ভরে নদী,
আর অগণন দেহ পড়ে থাকে পরিত্যক্ত বনে—
মৃত্যুর বিশাল পাখি ঢাকে তারে শ্বেত-আস্তরণে।

নিশীথে সে গ্রামময় লেলিহান আগুনের শিখা,
লোহিত শ্বাপদ' যেন, দারুণ মুখের বিভীষিকা।
অন্ধকার দীর্ণ করে ছুটে আসে রাত্রির ভুবন
প্রান্তে তার দাউ দাউ যেন অগ্নিগিরি-হুতাশন !

আর, সমতলে কীর্ণ কত-না শাণিত দীর্ঘাকার
কম্পমান শিরস্ত্রাণ। আন্দোলিত পথের দু-ধার

পলায়নে শঙ্কাতুর সবারে সে আচম্বিতে ধরে,
ছুঁড়ে ফেলে গর্জমান তরঙ্গিত শিখার ভিতরে।

আর শিখা জ্বলে যায় জীর্ণ করে বনবনান্তর
পীতাভ বাদুড়গুলি লীন দগ্ধ পাতার উপর,
সে তার ঘূর্ণিত দণ্ডে ছিন্ন করে তরুশাখাদলে
যেন অবিরাম তীব্র, তীব্রতর শিখা তার জ্বলে।

ধূসর ধূম্রের জালে বিরাট নগর গেল ভরে,
শব্দহীন আত্মাহুতি যেন কোন্ পাতালজঠরে।
জ্বলন্ত ধ্বংসের স্তূপ, উপরে সে অব্যাহত স্থির,
প্রত্যাহত জ্যোতির্ময় ঝঞ্ঝাছিন্ন মেঘমেঘালির

উপরে আকাশ মত্ত, মরুহিম বিষম আঁধার,
সব দিকে ঘোরায় সে জ্বলন্ত মশাল তিন বার,
দাবদাহে শুষ্ক করে দিতে হবে রজনী-শীতল—
নষ্ট নগরীর বুকে ঢালে তাই গন্ধক, অনল ॥

শঙ্খ ঘোষ

বের্তোল্দ্ ব্রেখ্‌ৎ

তালগাছ

উঠোনে দাঁড়িয়েছিল ছোটো তালগাছ
এতো ছোটো ভাবতে পারবে না
যেহেতু রয়েছে বেড়া চারদিক ঘিরে
কেউ তাকে মাড়িয়ে যাবে না।

কোনোদিন আরো বড়ো হবে না যদিও
হতে চায় বড়ো হতে চায়।

কোনো সম্ভাবনা নেই, সেই তালগাছ
এতো কম আলো কাছে পায়।

তাকে তালগাছ ভাবা খুব কষ্টকর
কোনো ফল হয়নি কখনো।
যদিও সে তালগাছ-ই, বলে দিতে পারো
পাতা তার দেখলে যে-কোনো।

আলোক সরকার

কিন্তু আমিও

কিন্তু আমিও, সবশেষ নৌকোতে
দেখতে পেলাম রশারশি ছেয়ে ভোরের হর্ষরাশি,
আর আচম্‌কা ধূসরবর্ণ শুশুকের পিঠ দেখো
জাপানি সাগর থেকে।

ছোটো ছোটো ছোটো ঘোড়ার গাড়িতে গিল্টি করা বাহার
পাটল রঙের ঝোলা আস্তিন বউরানীদের জামার,
শাপভ্রষ্ট ম্যানিলা শহরে পোড়ো সেই গলিটাতে
দেশত্যাগীর চোখে এ-দৃশ্য অপরূপ ঠেকেছিল।
তৈলভারোত্তোলন যন্ত্র তৃষিত বালিকা লস্‌ এঞ্জেল্‌স্‌-এ
সন্ধ্যাবেলায় পাহাড়িয়া পথে ক্যালিফোর্নিয়া আর সে ফলের বাজার
ভগ্নহৃদয় ভাগ্যহীনকে স্পর্শ না করে পারেনি, স্বীকার করি।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শয়তানের মুখোশ

দেয়ালে আমার এক জাপানি খেলনা ঐ
চারিদিকে সোনাখচা শয়তানের দানবী মুখোশ।
গভীর করুণাভরে আমি দেখি ওর

ললাটের স্ফুরিত ধমনী—
পাপে কী কঠিন শ্রম বেশ বোঝা যায় !

শঙ্খ ঘোষ

হান্স্ এগন্ হোল্ট্‌হুজেন্

মৃত্যুর সময়

আজও তবু পৃথিবীই আমাদের চোখ জুড়ে আছে।
আরও আছে হেমন্ত—সন্ধান উৎসৃষ্ট ও অনাগত
কালের শোণিতে, এবং প্রচুর পাত্রে পীতাম্বর
প্রাঙ্গণপাদপ। অতএব এক বাক্যে সকলেই
বলি, কী সুন্দর উদ্বাস্তুবিহার ! এবং যে-শিশু
উপনীত বর্ষ চতুষ্টয়ে, বর্তমান মুহূর্তে সে
পায় যে আস্বাদ, তা সদা লোভাবে, কিন্তু ধরা দিয়ে
খেদ মেটাবে না : হেমন্ত ও অবস্থিতি, এ-নিবাস
যার অবলম্ব ধরিত্রীর ধূলি, ভূপঞ্জরে ঠেকে
জীবনযাপন, তথা নিসর্গের সচিত্র জাতক—
পার্বত্য প্রদেশ, মালভূমি, উপত্যকা বালুকায়
আমগ্ন, অথবা মসিবিন্দু উজ্জ্বল সৈকতে, আলে
শিলা, ভূর্জ, তুনিপার রিক্ত পথ প্রান্তরে তির্যক
পশমের কালো মোজা দাসীর দু-পায়ে, বহির্বাসে
ছাগের উৎকট ঘ্রাণ···বয়স্থের এই তো শৈশব ॥

•

আশর্বরী ধারাপাত সমাপ্ত ক্রমশ নিরঞ্জন
সুপ্রভাতে, সর্বঘটে ক্ষয়ের মাধুরী, দিঙ্‌মণ্ডলে
প্রভাস্বর কার্তিক আসীন, আরিয়াদনি-থীসিয়ুস,
মোৎসার্তের সুবর্ণ সঙ্গীতে —আবর্ত কোমল সুরে,
সমে সমে সোনা ; এবং এ-হেন দিনে স্থানান্তরে

সে-যুবতী, যার চিঠি পেয়ে উত্তর দাওনি তুমি,
নিজেকে নিক্ষেপ ক'রে রাস্তার প্রস্তরে, আলিসার
নিষেধ না মেনে। কেউ কি সন্ধান রাখে আকাশের
রং সে সময়ে চটে গিয়েছিল, কাচের আড়ালে
একে একে হাড়হিম জানেলার সারি ঢেকেছিল
হতভম্ব মুখ? কেউ জানে কেন বিশেষত আজ
রবিবারে প্রহত হিরণ্যগর্ভে মৃত্যুর মাদল?

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ইতালীয় কবিতা



অসীম

এই নির্জন পাহাড় আমার চিরকালের প্রিয়
আর এই বন যা দৃষ্টিকে আড়াল করেছে দূর দিগন্ত থেকে।
এখানে বসে তবু দূরে তাকাই
মনে মনে ভাবি অনন্ত প্রসারিত মহাকাশ আমার সামনে
অপার্থিব মৌন, অতল প্রশান্তি,
যেখানে এলে মুহূর্তের জন্য হৃদয় থেকে ভয় নিভে যায়
এই বৃক্ষশাখার মধ্যে যখন বাতাসের শব্দ শুনি
সেই শব্দকে অসীম নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে মিলাই ;
চিরন্তন বিগত ঋতুগুলি স্মরণ করি, আর
বর্তমান প্রাণবন্ত ঋতুর স্বর শুনি।
বিরাট অসীমের মধ্যে আমার চিন্তা নিমগ্ন হয়।
এই সমুদ্রে ভরাডুবি আমার প্রিয়।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

নিজের প্রতি

এখন অনন্তকাল শুয়ে থাকো,
ওগো ক্লান্ত হৃদয় আমার। যারে ভেবেছিলে তুমি মৃত্যুহীন
সেই ছলনাও আজ ঘুচে গেছে। মিথ্যা হয়ে গেছে।
ভালো লাগে, এই আশা আমাদের বাঞ্ছিত বিভ্রম ঘিরে এই
অদম্য বাসনা, আজ সমস্ত নিঃশেষে নিবে গেছে।
এখন অনন্তকাল শুয়ে থাকো। ঢের
শ্রমার্ত হয়েছ। সেই শান্তিহীনতার বিনিময়
কোনো প্রতিদানে হয় না, তা ছাড়া পৃথিবী সে তোমার

ওই দীর্ঘনিশ্বাসের যোগ্য নয়। আর ওই জীবন ভরে শুধু
তিক্ততা, যন্ত্রণা, আর কিছু নয়, চারিদিকে পঙ্কিল মেদিনী।
তুমি স্থির হও। তুমি শুধু শেষবার
নিরাশানিমগ্ন হও। দেখো দেখো মরমী নিয়তি
অমৃত-পুত্রের তরে রেখেছেন শুধু স্থির মৃত্যুর বিধান।
এখনও ধিক্কার দাও ওই প্রকৃতিরে, ওই পাশবশক্তিরে,
ক্ষত আপামর ক্ষত আর অপরিসীম দম্ভেরে
যে লালিত রাখে একই সাথে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জোস্যুয়ে কার্দুচ্চি

প্রাচীন শোক

তোমার কচি হাত বাড়িয়েছিলে
যে-গাছটির দিকে
সেই সবুজ ডালিমের ডাল
খাসা লাল লাল কুঁড়িতে ছাওয়া।

দেখো নির্জন রিক্ত উঠোনে আবার
সেই ডালিমের ডাল সবুজ হয়ে উঠেছে,
গ্রীষ্মের মাস আলো দিয়ে তাপ দিয়ে
আবার তাকে জীবন্ত করে তুলেছে।

আমার আর্ত জলরিক্ত গাছের
তুমি কুসুম, শেষ কুসুম
আমার জীবন ব্যর্থ নিরর্থক
তার একমাত্র পুষ্প তুমি।

তুমি মাটির শীতলে শুয়ে আছো
তুমি কালো মাটির নিচে শুয়ে আছো,
সূর্য তোমাকে খুশিতে ভরে দেয় না আর
ভালবাসাও পারে না তোমার ঘুম ভাঙাতে।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আনত বিদায়

তিনরঙা ফুল, ওরে,
অস্ত গেল তারাপুঞ্জ সমুদ্র ভিতরে,
বুকে আমার গীতিগুঞ্জ গুম্‌রে গুম্‌রে মরে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আল্প্‌সের সকাল

বৃহতী ঐ বৃত্ত ঘিরে অপ্রভ স্ফটিকে,
জলদর্চি হিমশিলায় মধ্যদিন রাজে,
সৌম্য আর তীব্র গাঢ় অনন্তের দিকে
ব্যাপ্ত তার নিস্তব্ধতা যে।

বায়ুশ্বাসে অকম্পিত ইন্দ্রদারু ঝাউ
মর্মভেদী সূর্যপানে দাঁড়িয়ে রয় ঋজু
একটি শুধু জলের ধারা প্রস্তরে উধাও
মন্দ মৃদু বীণার স্বরে কলহ করে কিছু।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জোভান্নি পাস্কোলি

তখন

তখন···সেই সেকাল, সেই সেকাল
ছিলাম সুখী চরম সুখী এখন নয় তখন,

সেকথা ভেবে এখনও পাই এখনও সুখ মনে
সেই যে সেই সেকাল সেই সেকাল।

সেই যে সেই বছর, কত বছর গেল কেটে
আরও অনেক বছর যাবে আরও অনেক বছর,
তবু, হৃদয়, তোমার কাছে একটি শুধু দামী
অন্য কোনো বছর নয়, শুধুই সেই বছর।

সেই আমার একটি দিন সঙ্গীহীন দিন
আসে না আর ফিরে সেদিন আসে না আর ফিরে
আগেও জীবন ফাঁকা ছিল পরেও হলো তাই
মাঝখানে এক ক্ষণস্থায়ী তুলনাহীন দিন।

বিন্দু অতি ক্ষণস্থায়ী, এতোই ক্ষণিকের
যায়নি তাকে ধরা তাকে যায়নি যেন ছোঁয়া,
তবু দিলাম সুখী আমার বিন্দু ছুঁয়ে ছুঁয়ে
ক্ষণস্থায়ী বিন্দুলীন সেই যে সেই সেদিন।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

ধোপানী

সেইখানে অর্ধেক ধূসরবর্ণ অর্ধেক কালো এক খেতে
পড়ে আছে লাঙল বলদবিহীন
মনে হয়, বিস্মৃত লঘু বাষ্পের সাথে।

এবং পুকুর হতে শব্দ আসে উজ্জ্বল চকিত প্রহার
ধোপানী কাপড় কাচে কখনো উছলে ওঠে জল
কখনো নৈঃশব্দ্য দীর্ঘ।

বাতাস চলেছে বয়ে, শাখা হতে ঝরেছে বরফ
এখনো আসোনি ফিরে তোমাদের গ্রামে
তুমি চলে গেলে আমি কী ভাবে ছিলাম!

যেন প্রান্তরের মাঝখানে সেই সে লাঙল।

উৎপলকুমার বসু

গাব্রিয়েলে দান্নুৎসিও

বৃষ্টি পাইনের বনে

থামো। আজ বনানীর
প্রান্তদেশে, শুনিতে না পাই
কোনো কানাকানি কোনো
মানবের স্বরে। শুনি শুধু
দূরে কোন্ কথা
বৃষ্টি-ফোঁটা, পল্লবেতে
বলাবলি করে।
শোনো, বৃষ্টি ঝরে
খণ্ড মেঘ হতে।
শোনো, বন্ধ্যা টামোরিকো 'পরে
বৃষ্টি পড়ে ঝরি।
কণ্টকিত পাইনের 'পরে
বৃষ্টি পড়ে ঝরঝর ধারে।
মিরটোরে নাড়া দিয়ে
বৃষ্টি ঝরে পড়ে।
মঞ্জরিত জিনেস্ত্রোর 'পরে
বৃষ্টি এসে নামে।
জিনেপ্রোর ফলে-ভরা শাখায় থমকে
বৃষ্টি বারে বারে।

বৃষ্টি ঝরে ঝর ঝর
মুখে আমাদের
বৃষ্টি পড়ে অনাবৃত
আমাদের হাতে।
বৃষ্টি পড়ে ফুরফুরে
বসনের 'পরে।
বৃষ্টি ঝরে খুলে-ধরা
মনের চিন্তায়।
বৃষ্টি ঝরে কণ্ঠের ধ্বনিতে।
যে কণ্ঠের স্বরে
কাল তুমি ভুলেছিলে, আজ আমি ভুলেছি ছলনে,
অয়ি এরমিওনে।

শুনিতে কি পাও? বৃষ্টি ঝরে
সঙ্গীহীন
তৃণ'পরে।
বৃষ্টিধ্বনি কমে বাড়ে
বদলায় বায়ু-পথে
নির্ভরিয়া পল্লবের
ঘনতার 'পরে।
শোনো, ঐ বৃষ্টির কান্নায়
উত্তর দিতেছে
সংগীত ঝিল্লীর।
যে ঝিল্লী
দখিনের বর্ষার বিলাপে
নাহি পায় ভয়।
ধূসর গগন হেরি যার নাহি ভয়।
পাইনের তরু
এক স্বরে গান গায়। অন্য স্বরে
গাহিছে মিরটো। জিনেপ্রোও

গেয়ে চলে আপনার স্বরে।
নানা যন্ত্র যেন
বেজে ওঠে শত শত অঙ্গুলি পরশে।
মোরা দোঁহে ডুবে গেছি
বনানীর
প্রাণপূর্ণ অন্তরের তলে।
তব মুখ বৃষ্টি পিয়ে
হয়েছে মাতাল, সিক্ত সুকোমল
পল্লবের মতো।
হে ভুবন-বালা
যে নামেতে সবে তোমা জানে,
সে যে—এরমিওনে।
শোনো, শোনো,
বাতাস-ঝিল্লির গান
মূক হয়ে আসে
বর্ষণের বেড়ে চলা
ক্রন্দনের তলে।
তারি সাথে মেশে এসে
নিম্নে ঐ উপত্যকা হতে
দূরের ছায়ার সুর
ভগ্ন কণ্ঠে।
ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর,
শেষে থেমে যায়।
শুধু এক সুর
কেঁপে' ওঠে পুনঃ, নিবে যায়,
জ্বলে ওঠে, কেঁপে মরে, শেষে যায় নিবে।

সিন্ধুধ্বনি শোনা নাহি যায়।
শুধু শুনি পল্লবের 'পরে
বৃষ্টি পড়ে ঝরে।

বৃষ্টি সে রূপালি।
বৃষ্টি সে নির্মল।
বৃষ্টি-ধ্বনি ক্রমে বাড়ে
নির্ভরিয়া পল্লবের
ঘনতার 'পরে।
শোনো,
মূক এবে বায়ুর বলয়।
কিন্তু ঐ সুদূরের
জলার নন্দিনী
দাদুরী সে
গায় ঘন ছায়াতল হতে।
সে কোথায়? সে কোথায়?
নয়নপল্লবে তব নামে বরিষণে,
অয়ি এরমিওনে।

বৃষ্টি পড়ে তব কালো আঁখিপত্র 'পরে
যেন তুমি কাঁদিতেছ
সুখভরে, শুভ্র অশ্রু নয়।
যেন প্রায় কালো অশ্রু-রূপে
বাহিরিয়া আসিয়াছ তব দেহ হতে।
বিশ্বভরা প্রাণ আছে আমাদের
নবীন দেহেতে।
বক্ষোমাঝে প্রাণ আছে
অখণ্ড ফলের মতো।
আঁখি-পাতা মাঝে আঁখি দুটি
যেন তৃণমাঝে ঝরনার ধারা।
ওষ্ঠ মাঝে দন্তপংক্তিগুলি
যেন তিক্ত বাদামের মতো।
হাতে হাতে ধরে মোরা চলি।
কভু চলি দূরে, সরে, কভু কাছে ঘেঁসে।

মালিওলো
সবুজ শক্তির স্পর্ধা ভরে
জড়াইয়া ধরে
জানু।
কী কহে সে? কী কহে সে?
বৃষ্টি পড়ে ঝরঝরে
মুখে আমাদের।
বৃষ্টি পড়ে অনাবৃত
আমাদের হাতে।
বৃষ্টি পড়ে ফুর্‌ফুরে
বসনের 'পরে
বৃষ্টি পড়ে খুলে-ধরা
মনের চিন্তাতে।
বৃষ্টি ঝরে কণ্ঠের ধ্বনিতে।
যে কণ্ঠের সুরে
কাল তুমি ভুলেছিলে,
    আজ আমি ভুলেছি ছলনে,
অয়ি এরমিওনে॥

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনো কাম্পানা

রহস্যময়ী

তোমার বিবর্ণ মুখ কোথায় দেখেছি, পাহাড়ের মধ্যে কিনা, মনে নেই –
হয়তো বা না-জানা দূরের হাসি তুমি,
আনত শ্বেত ললাট তোমার দ্যুতিময়, অথচ
পৌরাণিক ধূসরিমায় তুমি বিবর্ণা, মৃত বসন্তের রানী
যুবতী, দেবী, সম্রাজ্ঞী।

সম্ভোগ এবং দুঃখের এক দুরূহ দুর্জ্ঞেয় কবিতা তোমার মধ্যে,
এক সংগীত, তুমি নীরক্তা, কিন্তু তোমার
কুঞ্চিত ঠোঁটের বৃত্তে রক্তের আভা,
তুমি সুরের সম্রাজ্ঞী।
তোমার আনত কুমারী মুখের জন্য আমি এক নিশীথের কবি
আকাশের গভীরে জ্বলজ্বল তারাগুলির দিকে চেয়ে ছিলাম,
তোমার কোমল রহস্যকে পাব বলে
তোমার শোভন নীরবকে ছোঁব বলে,
জানি না অস্পষ্ট অগ্নিশিখা তার পাণ্ডুর করবী-চিহ্ন কি না,
জানি না হয়তো বা কোমল এক কুয়াশা
আমার বেদনার উপর ধীর, যেন রাত্রির মুখের উপর মৃদু হাসি।
শ্বেত পাহাড়গুলির দিকে চোখ ফেরাই
বাতাসের মূক ঝরনাগুলির দিকে
নিথর আকাশ দেখি, অশ্রুময়ী কূলপ্লাবী নদী দেখি,
বরফ-ঢাকা পাহাড়ের বাঁকে মানুষের শ্রমের ছায়া পড়েছে দেখি,
নরম আকাশে স্বচ্ছ ছায়াগুলি ঘোরে ফেরে
আর আমি তোমাকে ডাকি, রহস্যময়ী, ডাকি।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

শরতের বাগান

বিদায় ছায়া-ধূসর বাগান, চির-বিদায়,
নির্বাক লরেল বৃক্ষ, সবুজ পত্রালি, শরতের পৃথিবী, বিদায়!
অস্তায়ী সূর্যরাঙা কঠিন বন্ধ্যা সমতল, চির-বিদায়।
কর্কশ কোলাহলে রত দূরের জীবন
মুমূর্ষু সূর্যের কাছে চিৎকার করছে
যে-সূর্য ফুলের কেয়ারির উপর রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছে।
তূর্যধ্বনি উঠছে, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছে আকাশ,
সোনালি বালুর মধ্যে নদী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে;
নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শ্বেত মূর্তিগুলি দাঁড়িয়ে

সেতুর প্রান্তে ওদের মুখ ঘোরানো—
অতীতের কিছুই আর নেই।
দূর থেকে কোরাসের মতো মৌন উঠে আসছে
কোমল অথচ রাজকীয় এক মৌন,
আমার উঁচু বারান্দায় তার নিশ্বাস শুনতে পাচ্ছি।
লরেলের গন্ধে, তিক্ত ক্ষীয়মাণ গন্ধে,
সূর্যাস্তের রঙ্‌লাগা অমর মূর্তিগুলির মধ্যে
সেই নারী আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আকাশী আলো

গ্রীষ্মের ধূসর বিকেল
উজ্জ্বল আকাশী আলোর গায়ে ছায়া মাখায়
আর আমার হৃদয়ে আঁকে
তপ্ত ছাপ।
কিন্তু কে (নদীর উপর উঁচু সড়কে একটা বাতি জ্বালছে)
কিন্তু কে জ্বালিয়েছে—সেতুর জন্য, যেন
এক ম্যাডোনার জন্য—কিন্তু কে সে ?
কে জ্বালিয়েছে এই প্রদীপ ?
ঘরের মধ্যে একটা ক্ষয়ের গন্ধ,
একটা লাল বিবর্ণ ক্ষত ঘরের মধ্যে।
তারাগুলি যেন মুক্তোর বোতাম
আর সন্ধ্যার গায়ে ভেলভেটের জামা।
মায়াবী সন্ধ্যা কাঁপছে
এই সন্ধ্যা—মায়ামুগ্ধ—কাঁপছে ;
কিন্তু তার হৃদয়ে জ্বলছে
একটা লাল বিবর্ণ ক্ষত।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

জোনায়া রমণী

তুমি চুলে চুলে বয়ে এনেছিলে সমুদ্রশৈবাল
আর অতিদূর হতে বয়ে আসা হাওয়া,
উত্তাপে যে ভার হয়ে আসে, সেই হাওয়ার নিশ্বাস
তোমার আতাম্র ওই শরীরে শরীরে ভরেছিল :
—আহা অপরূপ
অমল তোমার সারা অঙ্গে ওই দৃপ্ত সরলতা—
প্রেম নয়, অতর্কিত অস্থিরতা নয়, যেন নিশি,
প্রয়োজনীয়ের ছায়া, যে ঘোরে মন্থর
চোখের শাসনে বাঁধা হৃদয়ে হৃদয়ে যে বেড়ায়
আর তারে বিগলিত করে দেয় আনন্দে আনন্দে,
অভিভবে অনাসক্ত যাতে সেই আতপ্ত বাতাস
অনন্তের মধ্য দিয়ে তারে বয়ে নিয়ে যেতে পারে।
কত ছোটো পৃথিবী যে আর ওই আলোকধারা ছ-হাতে তোমার !

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

‘এস. এ.-র জন্যে চারিটি লিরিক’ থেকে

১. সেতুর খিলান নদীর উপর

সেতুর কাঠামো নদীকে সাজায় আরো সুশোভন
খিলানগুলিও আকাশকে করে আরো সুদৃশ্য
খিলানে তোমার অবয়ব
নীলিমায় ওই শুভ্র রূপালি আলো
আরো সুন্দর গঠন তোমার
আরো মধুরিমা খিলানছায়ায় রূপালি রশ্মি
শস্যের দেবী সিরিজ-এর চেয়ে আরো সুন্দর গঠন তোমার।

২. উজ্জ্বলতম দৃশ্যকে নিয়ে

উজ্জ্বলতম দৃশ্যের 'পরে
হেঁটে চলে গেলে স্মরণ, তোমার
চিতাবাঘিনীর-তুল্য পা ফেলে
উজ্জ্বলতম দৃশ্যের 'পরে
চরণ তোমার যেন মখমল
এবং তোমার চোখের তাকানো লাঞ্ছিত কুমারীর
তোমার নীরব চরণ যেনবা স্মৃতি
চেয়ে আছো তুমি ছাদের প্রাচীরে
বহমান এই জলের উপরে
নয়ন তোমার আলোয় প্রখর।

মানস রায়চৌধুরী

জুসেপ্পে উন্‌গারেত্তি

পাঁচটি কবিতা

চিরন্তন

নিয়েছ যে সব ফুল আর যা দিয়েছ, তার মাঝে
ব্যর্থ গ্লানি অনির্বচনীয়

যন্ত্রণা

বরং ধ্বংস হয়ে যাও যথা সিন্ধুসারস
মরীচিকা সন্ধানে
কিংবা যেমন ভারুই পাখিটি
সাগর পেরিয়ে
পড়ে গিয়ে শুরু ঝোপের সারিতে
কারণ চায় না সে তো
আবার উড়তে আর

তবু না কভু না কান্নায় বেঁচে থাকা
সোনালি অন্ধ গাইয়ে পাখির মতো

এই সন্ধ্যা

বাতাসের থামে গড়া বারান্দা
যেখানে হেলেছে আমার দুঃখ
এই সন্ধ্যায়

জাহাজডুবির সুখ

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ফের
সাগরযাত্রা
যেন
জাহাজডুবির পর
জলজ্যান্ত বেঁচে এক
সাগরনেকড়ে

সকাল

নিজেকে সন্দীপন
করেছি মহাগগন

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সব হারিয়ে গেছে আমার

সব হারিয়ে গেছে আমার ছেলেবেলার
কান্নাতে কান্নাতে আমি আর
হারাতে পারব না আমার স্মৃতি।

রাতের গহন নিবিড়তায়
সমাহিত রেখেছি শৈশব,
সে আজ সকল কিছুর থেকে, অদৃশ্য কৃপাণ,
আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

মনে পড়ে কবে যেন গরবদীপ্ত হয়েছিলাম তোমায় ভালোবেসে,
আর আজ আমি এখানে এই
হারিয়ে গেছি রাতের নিঃসীমতায়।

বিষাদ যেন সমাপ্তিহীন উঠছে জমে
গলায় আমার বিঁধে আছে জীবন এখন
কিছু না হায় কিছু না আর শুধু
নিরবধি রোদনধ্বনির দোলা।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সায়াহ্ন

সায়াহ্নের সঙ্কটমূলে ছুটে চলে
অমল জলধারা ছুটে চলে
জলপাইবরণ তার রঙ,

ক্ষণিক বহ্নির কূলে সে পৌঁছে যায় স্মরণরহিত

কুহেলীর মধ্যে শুনি ঝিঁঝি শুনি ব্যাঙ ডাকছে,

আর সেই ঘাসে ঘাসে যেন মৃদু কাঁপন।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাক মহাকাল

মহাকাল বাক্যহারা সে-অনড শরের বিপিনে···

অবরোহ স্থান থেকে বহুদূরে ভ্রমে নৌকো এক ·
পরিশ্রান্ত, অলস-সে মাঝি যেন···গগন মণ্ডল
এখন খসিয়া পড়ে বাষ্পময় অতল নিরয়ে

বৃথাই বিস্তৃত হও স্মৃতিদের বাহার বলয়ে
সম্ভবত পতনের অর্থ ছিল ক্ষমা

জানে না সে

একমাত্র ভ্রান্তি এই মায়াময় পৃথিবী ও মন,
আপন তরঙ্গ মধ্যে যেমন সে রহস্য বিরাজে,
তাতে প্রতি কণ্ঠস্বর যেন হয় অর্ণবপতন।

কমলেশ চক্রবর্তী

উজেনিও মন্‌তালে

এলবামের জন্য

ভোর ভাঙবার আগেই ছিপ ফেলেছিলাম জলে
তোমার জন্য (বড়শির নাম দিয়েছিলাম 'প্রিয়তমা')
ঘোলাজলে কোনো মৎস্যকন্যার পুচ্ছ দেখতে পাইনি
'মনফেরাতো' পাহাড় থেকে কোনও হাওয়া
তোমার অভিজ্ঞান বয়ে আনেনি।

সারাদিন আমার কেটেছে অন্বেষণে
তোমার জন্য খুঁজেছি শুককীট, ব্যাঙাচি, লতানো গাছের বেড়া,
ধূসর পাখি, হরিণ, বৃষ, জেব্রা, কালোমেঘ, শিলা,
সুরার ঋতু শুরু হবার আগেই আমি এক কুড়ুনী
ভিজে দ্রাক্ষাবনে হেঁটে গিয়েছি,
তোমায় দেখতে পাইনি।
অনেক রাত পর্যন্ত খুঁজেছি, ভাবিনি
রান্নাঘরের বালি, সোডা, সাবানের পাত্রগুলির ঢাকনা
একা আমাকেই খুলতে হবে।
এই পায়রার খোপে আমি একা, তুমি উড়ে গেছ।

ওই অস্পষ্ট আকাশরেখার মধ্যে তুমি অদৃশ্য।
বিদ্যুৎকে বেঁধে রাখা যায় না মনে,
কিন্তু সেই আলো একবার যে দেখেছে সে বিদ্যুৎ থেকেও
বঞ্চিত হবে না।
তোমার চেরীগাছের তলায় আমি শরীর বিছিয়েছিলাম,
আমার সেই সম্পদ অতুলনীয়, তাই
জীবন্ত তোমাকেও আবার ধরে রাখব তা আমার অসাধ্য।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

ম্যাগনোলিয়ার ছায়া

জাপানি ম্যাগনোলিয়ার ছায়া ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর,
কারণ লালচে কুঁড়িরা ঝরে ঝরে গেছে,
টিলার ওপর থেকে একটা ঝিঁঝি পোকা থেকে থেকে
কেঁপে উঠছে।

এখন আর স্বরে স্বর মেলাবার কাল নেই, ক্লিৎসিয়া,
অসীম দেবতা ভক্তকে উদরসাৎ করে
নতুন রক্তে আবার তাকে বাঁচিয়ে তুলবে, সেকাল আর নেই।

ফুরিয়ে যাওয়া অনেক সহজ ছিল,
প্রথম ডানার ঝাপটায় মৃত্যুকে বরণ করা,
শত্রুর সঙ্গে প্রথম মোকাবিলার খেলায়।

এখন সময় বড়ো কঠিন,
কিন্তু তুমি নেই,
সূর্যের আগুনে দগ্ধ, দীর্ঘ প্রোথিত তুমি,
কোমল গান-গাওয়া পাখিটা
তোমার নদীর জেটির মাথায় উঁচুতে উড়ছে,
হিমের কাঁপুনিতেও তুমি অনড়, ক্ষীণ পলাতকা,

তোমার কাছে আকাশ পাতাল, কর্কট ও মকরক্রান্তি
একাকার হয়ে গিয়েছিল,
সংগ্রাম দানা বেঁধেছিল হয়তো তোমার মনে,
হয়তো বা তারও মনে যে তোমার মধ্যে বধূর চিহ্ন
দেখতে চেয়েছিল
অন্যেরা পিছিয়ে পড়ে, পথ ছেড়ে দেয়,
উখোর ধার ফুরালে সহজভাবে কাটে না আর,
যে গান গেয়েছিল তার শূন্য খোলস অচিরেই
ভাঙা কাচের মতো পায়ের তলায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।
ছায়া এখন ম্লান—হয়তো শরৎ, হয়তো শীত;
ওপারের অসীম তোমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে,
ওই অসীমের মধ্যেই আমাকে ছুঁড়ে দিলাম,
সমুদ্রের মাছ জল থেকে উঁচুতে লাফিয়ে উঠল
নতুন চাঁদের মধ্যে। বিদায়।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

সমুদ্র-সৈকত

আরো উদ্দাম হাওয়া ছেড়ে এই তমসাকে শতচীর
এবং তোমার বিস্মিত ছায়া, আলোকিত বেষ্টনী
ক্রমশ দীর্ণ— এতো বেলা হলো আর

ফিরতে পারো কি নিজের গভীরে, একটি ইঁদুর সহসা
তালগাছ থেকে লাফ মেরে নামে, বিদ্যুৎ খেলা করে
বারুদে, তোমার গহীন দীর্ঘ চোখের পাতায় বিদ্যুৎ।

মানস রায়চৌধুরী

ক্ষীণচন্দ্রে বাতাস

বিশাল সেতু যে যায় না তোমার পানে।
তোমার আদেশে জলের প্রণালী পেরিয়ে

নৌকা আমার ঠিক পৌঁছাত তোমাতে, কিন্তু আমার
শক্তি ক্রমেই ফুরায়, যখন এই অবেলায়
সূর্যকিরণ অলিন্দে, জানালায়।

ক্ষীণ শশাঙ্কে যে-জন ধর্মপ্রচারে নিরত তিনি
শুধালেন : তুমি জানো কি, কোথায় ঈশ্বর?
আমি যা জেনেছি বললাম তাঁকে। মাথা নেড়ে যেন তিনি
ঘূর্ণি বাতাসে মিলিয়ে গেলেন, আর সে ঘূর্ণি ঝড়ে
উড়ে গেল কত মানুষ, বসতি, শিখর-চূড়ায় শেষে ঘোরতর
কালিমায়

মানস রায়চৌধুরী

সালভাতোরে কোয়াজিমোদো

বের্গামোর পাহাড়-দুর্গ থেকে

বাতাসে ভেসে আসছিল মোরগের ডাক
দেওয়ালের ওপার থেকে, অলক্ষ্য আলোয় তুহিনাভ দুর্গ—
তার ওপার থেকে ; তুমি সেই ডাক শুনেছিলে।
সেই ডাকে স্পন্দিত—জীবনের স্বর,
অন্ধ কুঠুরির গহ্বর থেকে ভেসে-আসা মর্মরধ্বনি,
আর, প্রাক্-প্রত্যূষে প্রহরী-পাখির আওয়াজ।

•

তোমার নিজের জন্য তুমি কিছুই বলোনি,
তোমার গতি তখন কচি কচি সূর্যকিরণের গতিপথে,
বিশ্রী ধোঁয়ায় দম্‌কায় আচ্ছন্ন কৃষ্ণসার তখন মূক,
সারস স্তব্ধ, প্রত্যাসন্ন পৃথিবীরই মায়া-প্রতীক যেন।

শীতের নগ্ন চাঁদ চলে গেল
পৃথিবীর উপর দিয়ে—পৃথিবী তো নয়
যেন আপন নৈঃশব্দ্যে উদ্ভাসিত
কোনো স্মৃতির শরীর।

তুমিও এখন চলেছ
দুর্গাপ্রাকারে সাইপ্রেস-তরুশ্রেণীর ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে।
এখানে সব ক্রোধ মৃত তরুণদের শ্যামলিমায় শান্ত,
আর দুরান্ত শোক, সে তো সুখেরই অনুরূপ।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

প্রাচীন শীত

শিখার আলোছায়ায় তোমার স্বচ্ছ হাতের তৃষ্ণা :
যেন ওক গাছের গন্ধ, যেন গোলাপ। মৃত্যুর।

প্রাচীন শীত এলো।
শস্য চাইতে না চাইতেই পাখিরা হলো তুষার ;
তেমনি সব শব্দ ; ছোট্ট এক সূর্য, দেবদূতের মহিমা ,
তারপরেই কুয়াশা, আর গাছ—
আর আমরা
সকাল বেলায় হাওয়ায় হাওয়ায় তৈরী॥

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

হঠাৎ সন্ধ্যা

প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে আছে একা। প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে আছে
একা, একটা আলোয় এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাওয়া
পৃথিবী, তার বুকের ওপর প্রত্যেকে।

আর
হঠাৎ
সন্ধ্যা ॥

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

তোমার গর্ভের থেকে
উন্মোচিত আমি বিস্মরণময়
এবং আছি ভরা শোকে।

দেবদূতেরা হাঁটে, নীরব
আমার পাশে পাশে ; কোথাও নেই শ্বাস ;
সকল স্বর হয় পাথর,
কবর দেওয়া যেন আকাশে নীরবতা।

তোমার আদিতম মানুষ
বোঝে না কিছু, পায় কেবলি দুঃখ।

কমলেশ চক্রবর্তী

আন্‌তোনিও পোস্‌সি

অঘ্রানের সন্ধ্যা

তারপর—যদি দূরে যাই চলে—আমার কিছু না কিছু থাকে
আমার পৃথিবী হতে কিছু থেকে যায়

একটি সরল ঢেউ স্তব্ধতার, শত কণ্ঠস্বরে
সরু শ্বেত গুল্ম এক নীলিমার হৃদয়ের মাঝে।

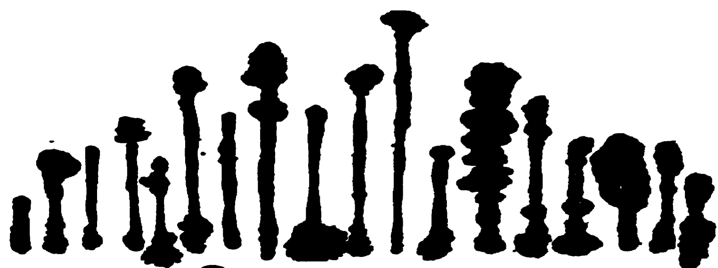
অঘ্রানের সন্ধ্যা যেন কৃশ এক বালিকা পথের
নিয়ে আসে বিক্রয়ের ফুলগুলি চন্দ্রমল্লিকার

এতো ফুল।   সেইখানে দেখা দেয় দূরের নক্ষত্ররাজি শীতার্ত, শীতল
কেউ বুঝি রেখে দেবে, কোনোখানে, কেউ বুঝি চন্দ্রমল্লিকার

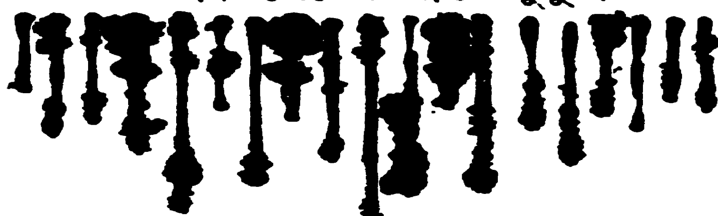
সন্ধানে ফিরেছে, পৃথিবীতে আমারই কারণে
যদি যেতে হয় দূরে—অনন্ত যাত্রায়।

উৎপলকুমার বসু

স্পেনীয় কবিতা



দিনশেষের রাঙা মুকুল



ব্যাপ্ত প্রাণ

শুধু স্মৃতি…শুধু ক্ষমা…ভালো যে বেসেছি তার স্মৃতি…
এক মুহূর্তের সুখ, আর সেই একান্ত প্রতীতি
আর তারপরে শুধু পুঞ্জ অবসন্নতার ভারে
ঝুঁকে পড়া বিস্মৃতির শুভ্র তুষারাদ্রির কিনারে।

আহা, চিরদিন যদি যৌবনের তীব্র এ সুষমা
অনুভব করা যেত, যা অনুরণিত, মনোরমা
তোমার আমার বুকে! কোনো বরাঙ্গনা ঘরে এলে
যেরকম, সৌভাগ্য এলে আসুক সেই আলো জ্বেলে।

সবচেয়ে ঈপ্সিত যা নিরবধি প্রচ্ছন্ন সে রয়;
আমাদের ওষ্ঠাধরে স্মিতহাস্যে ক্ষমার বিনয়;
হে ধরিত্রী, সব জেনে তোমার কাছেই যাব শেষে,
অজেয় নিদ্রার মন্ত্র চোখে নিয়ে ক্লান্তির আবেশে।

সে যেন সতত বাঁচে যে সতত যা দেখুক তার
নশ্বরতা মনে রেখে অনুধ্যান করে বারংবার,
এবং নিবৃত্ত হয়, গভীর প্রজ্ঞায় সততই
তোমার অকূল ব্যাপ্ত সিন্ধুতীরে, ওগো মিথ্যাময়ী!

তাই সে কুড়ায় ফুল, ফুল যতক্ষণ ফুল থাকে,
অনায়াসে ক্ষমা করে গোলাপের অপ্রীত কাঁটাকে…
হয় যদি আকাশ হোক না কালো, নিরয় আকাশে
গভীর সন্তাপে যদি পঙ্গপাল প্রজাপতি আসে।

সে তবুও ভালোবাসে, ক্ষমা করে, সুতীব্র সাহসে
অসঙ্গতি তুচ্ছ করে হীনম্মন্যের বিরুদ্ধে সে

নিয়ত সংগ্রামরত। কত দুঃখে, কত বেদনায়
নতমুখী সন্ধ্যা নামে অপরূপা, স্তব্ধতা ঘনায়।

যখন দুঃখের ছায়া পুঞ্জীভূত আমার হৃদয়ে
আমি উজ্জ্বলতা খুঁজি শিখরে শিখরে। শুরু হয়
করুণা, করুণা ঝরে অমিতাভ সে-নয়নপাতে
আমার সত্তার আর্দ্র হিমাচলে মগ্ন ভোর-রাতে॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

মিগুয়েল দ্য উনামুনো

বেলাথ্‌কেথ্‌-এর যীশু

'আমার প্রিয়তম শুভ্র……'

(পরমগীত ৫।১০)

[প্রথম খণ্ড থেকে]

ঈশা, মৃত আমার, কী ভাবছ তুমি?
কেন তোমার ললাটে লুটিয়ে আছে
নির্মল য়িহুদির কালো কেশরাশি, শর্বরীর
ওই ভারি আবরণ? যেখানে ঈশ্বরের রাজ্য, যেখানে
উজ্জীবিত সত্তার স্নাতন সূর্যোদয় দীপ্যমান, তোমার সেই অন্তস্তলে-
তোমার সেই অন্তরের দিকে তুমি তাকিয়ে আছো! শুভ্র
তোমার শরীর, যেন সূর্য, সঞ্জীবনী, আলোয় জনয়িতার
দর্পণ; শুভ্র তোমার শরীর
যেমন এই ইন্দুলেখা, সেই প্রাণহীন…
যে আপন জননী এই শ্রান্ত ভ্রাম্যমাণ ধরিত্রীর
চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণ্যমান; শুভ্র তোমার শরীর, যেন
অভিষেক-রজনীর গগনমণ্ডল, যাকে ছেয়ে আছে

তোমার ওই নিষ্কলুষ য়িহুদির পুঞ্জ পুঞ্জ কালো
চুলের মতো কালো গুণ্ঠন।

কারণ তুমি ঈশা, মৃত আমার,
তুমিই সেই অদ্বিতীয়, স্বেচ্ছায় যে মেনে নিলে মৃত্যু,
জিতে নিলে যে মৃত্যুকে, আর যার ভিতর দিয়ে
প্রাণ উদার হলো। তার পর থেকে
তোমারই মধ্য দিয়ে তোমার ওই মৃত্যু, আমাদের প্রাণ দিয়েছে,
তোমারই মধ্য দিয়ে আমাদের জননীরূপে স্বীকৃতি পেল মৃত্যু,
তোমারই মধ্য দিয়ে মৃত্যু হয়ে উঠল সেই স্বাগত সমাদর,
সেই আমন্ত্রণ, সেই সদয় সাহায্য, যা প্রাণের সব তিক্ততাকে
মাধুর্যে ভরে দেয়;
তোমারই মধ্য দিয়ে—
হে ঈশা, যে তুমি মৃত, যে তুমি অবিনশ্বর, যে তুমি ধবল
রাতের ইন্দুলেখা। জীবন তো সুষুপ্তি,
ঈশা আমার, এবং মৃত্যু—সে জাগরণ। যেকালে
বসুন্ধরা একাকিনী ও নিদ্রাতুরা, ধবল চাঁদ সারাক্ষণ
জেগে থাকে সাবধানী ও সতর্ক,
যে-কালে সর্বজন সুপ্তিবিলীন, তাঁর ক্রুশ থেকে
অতন্দ্র তাকিয়ে জেগে থাকেন রক্তহীন মানবপুত্র, যিনি
কালো শর্বরীর স্নিগ্ধ বিভার মতো শুভ্র; প্রহরী তিনি,
যিনি তাঁর সব রক্ত ঢেলে দিলেন যাতে লোকে
নিজেদের মানুষ বলে জেনে নিতে পারে। তুমি,
তুমিই উদ্ধার করলে মৃত্যুকে, যে-তুমি
সেই বিভাবরীর জন্য উন্মুক্ত ও উৎসুক বাহু বাড়িয়ে আছো
যে সুন্দরীতমা ও কৃষ্ণা—কেননা
তার দিকে বহ্নিমান চোখে তাকিয়ে জীবনের সূর্য,
কেননা সূর্য তো এই ভাবেই এই কালো শর্বরীকে
সুন্দরীতমা ও পরমা করে রচনা করেছে। আর ওই ইন্দুলেখা,

একা, শাদা চাঁদ— সেও তো রূপে ভরে আছে, এই তারা-জ্বলা
রাতে যা পুণ্যময় য়িহুদির কালো চুলের মতো অজস্র।
ক্রুশবিদ্ধ মানবের মতোই, শুভ্র এই ধবল ইন্দুলেখা—
প্রাণসূর্যের সে দর্পণ,
যে প্রাণসূর্য চিরন্তন, মৃত্যুঞ্জয় ও অবিনশ্বর।
প্রভু, এই জগৎব্যাপী কালো রাতে
তোমার ওই শান্ত ও জ্যোতির্ময় রশ্মি আমাদের চালনা করুক,
শক্তি দিক আমাদের, দিক শাশ্বত দিনের
দুর্মর ও প্রবল আশা। রজনী, আমার লাবণ্যের বন্যা,
স্নিগ্ধ স্বপ্নের প্রসূতি আমার, আমার আশার জননী,
স্তোকনম্রা রজনী, হে আমার সত্তার কালো রাত
পরিত্রাতা ঈশার ভিতরে আমাদের সব আশাকে
তুমি লালন করো!

[দ্বিতীয় খণ্ড থেকে]

'এই তবে অবসান!' সহস্র প্রপাতের মতো
রণক্ষেত্রের যোদ্ধার মতো
জলদমন্দ্রে গর্জন করে উঠল তোমার চিৎকার
—তুমি, মৃত্যুকে তুমি দিতে চাইলে মৃত্যু—আর তোমার ওই মেঘমন্দ্র
উৎপাটন করে দিল
পৌত্তলিকদের দাম্ভিক জেরিকোর
দেয়াল, গ্রীসদেশের জ্ঞানী তালীবন, দেহচ্যুত আলেকজান্দ্রিয়া, আর
অমনি তোমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল রোমের তোরণ।

স্তব্ধতা এল তার পিছনে—অপরিমেয়, অতীন্দ্রিয়, বিপুল;
যেন তোমার সঙ্গেই অবসান ঘটল ইন্দ্রনীলের, আর তার পরে
অপার্থিব ধ্বনিমালার মধ্য থেকে উপচে উঠল নতুন গান,
আকাশের গহ্বরে ও অবসরে যা ঝড়ের মতো আছড়ে পড়ল
তোমার সংরক্ত ও সন্তপ্ত বিলাপে। তোমার ক্রুশের করুণ
কাঠের বীণার তারের মতো

পেশিবন্ধ ও মাংসল কোষ টান করে
বাড়িয়ে দিল তোমার সেই ভীষণ নিগ্রহ ও নির্যাতন—
—ভালোবাসার স্পর্শে আকুল ও উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তোমার সর্বাঙ্গ—
বাধাবন্ধহীন প্রেম—জীবনের পরাক্রান্ত জয়গান !
এই তবে অবসান ! অবশেষে মৃত্যু হলো মৃত্যুর !

শুধু তুমিই ছিলে পরম পিতার সঙ্গে, আর তিনি ছিলেন
মুখোমুখি—পরস্পরের দৃষ্টি অন্তর্মিশ্রিত, যেন
আকাশের নীল মিশে গেছে নয়নতারার নীলে ;—
বিপুল ও অসংবৃত চাপা কান্নায় তাঁর বুক—আত্মার
সীমাহীন সিন্ধু—কেঁপে কেঁপে উঠল, আর
ঈশ্বর—মানব বলে বোধ হলো তাঁর নিজেকে—
নিলেন তিনি মৃত্যুর স্বাদ, গ্রহণ করলেন দিব্য একাকিত্ব।
মরে যেতে কেমন
লাগে, তা জানবেন বলে আকাঙ্ক্ষা করলেন তোমার পিতা—
মুহূর্তকালের একা দেখলেন তিনি নিজেকে,
এমন-কি আপন সৃষ্টি লুপ্ত ও অপহৃত হলো—যখন বিনতি করে
তুমি তোমার মানবনিশ্বাস সমর্পণ করে দিলে দিব্য
নিশ্বাসের। দূরে, দূরান্তে, কোন করুণার
পারাবারে কেবল সাড়া তুলল
তোমার সেই শেষ আর্তনাদ।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রুবেন দারিও

ভবিতব্য

সেই বৃক্ষ সুখী যার কদাচিৎ জাগে অনুভব,
আরও সুখী সে-পাষাণ লেশমাত্র অনুভূতি বিনা,

কারণ বেঁচে থাকার অধিক যন্ত্রণা অসম্ভব।
আর চেতনার চেয়ে বিড়ম্বনা কোথাও জানি না।

শুধু বেঁচে থাকা, আর কিছুই না জানা, কোনো সুচিহ্নিত
সড়ক না-মানা,
আর অতীতের ভীতি আর অনাগতের সন্ত্রাস
সমস্ত আগামী জুড়ে মরণচিন্তার পরোয়ানা,
আর দিনযাপনের যন্ত্রণা প্রেতের যন্ত্রণার নাগপাশ

যা জানি না তার তরে যা ভাবা যায় না তার তরে,
সেই দেহ গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর মেলে যে লুব্ধ করে,
সে-কবর যে অতিপ্রাকৃত শাখাপল্লবনিকরে
প্রতীক্ষায় থাকে, কোনো আদিম কন্দরে
সূচনা, না জেনে, কিংবা কোথায় চলেছি অগোচরে!...

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হোজে হোয়ান তাবাল্দা

মিতালেখ্য

১

লতার নম্রতা
স্বর্ণলতা, নাকি রঞ্জন-রঙা
নাকি আলোকলতা ...

২

রাজময়ূর ধীরগমনে বিদ্যুতের বোল
আটপৌরে গোলাবাড়ির উঠোন ধরে তুমি
চলেছ যেন শোভাযাত্রা নিজে।

শুষ্ক পাতা ছেয়েছে আজ বাগানে
অথচ আমি চৈত্রে কোনোদিনই
দেখিনি গাছে এতো সবুজ সমূহ সমারোহ।

৪

নৈশ প্রজাপতি,
ফিরিয়ে দাও রুক্ষ মরা ডালে
শুকনো পাতা তোমার পাখা থেকে।

৫

ঝলক-লাগা চাঁদ
যখন বোনে জালাবরণ আপন মনে
জাগিয়ে রাখে মাকড়সাকে।

৬

মাছির তাড়া-খাওয়া গাধা,
বোঝার পরে বোঝা, স্বপ্নে দেখে মাঠ
স্বর্গে মরকত-ছাওয়া।

৭

সৌর সূর্যের দারুণ প্রহারে
কাঁচ-সাগর ভেঙে নির্যাতিত একি চূর্ণ বারিধি !

৮

টকটকে লাল ঠাণ্ডা
হো-হো হাসি, বৈশাখে ;
যেন মনে হয় টুকরো
তরমুজ !

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আন্তনিও মাকাদো

কবিতা

কে বলেছে তোকে চিনেছি, চোখের মণি,
মঙ্গল রাজে তোর পিছনের পটে,
তুমি অভিজাত নির্জনে রহো, ধনি,
নৌকো ডোবে না ছড়ে, গ্রহদুর্ঘটে।

আশ্রয়চ্যুত কুকুর যেমন ঘোরে,
শিকারীর মতো বিকারে, গন্ধ শুঁকে,
রাস্তা না পেয়ে, দৌড়োয় পড়ে পড়ে ;
অথবা যেমন গাজনমেলায় ঢুকে

ভিড়ের মধ্যে শিশুটি হারিয়ে যায় ;
আঁধিঝড়ে, কম্পিত ঝাড়লণ্ঠনে
হারিয়ে গিয়েও নেশাভরে থম্‌কায়
চাপা কান্নায় ভাঙা-ভাঙা কীর্তনে ;

তেমনি আমিও মাতাল, দুঃখ শোকে,
উন্মাদ কবি ঘুরছি গীটার হাতে,
স্বপ্নে কি পাব পরশপাথর ? একা
ঈশ্বর খুঁজি ঘন কুজ্ঝটি রাতে ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রসারিত ঐ

প্রসারিত ঐ অগ্নির করপুট
অস্তসূর্য থেকে
অরব এ সন্ধ্যায়—
শান্তির ফুলবাগানে—

ফুলে ভরোভরো নগরী ভালেন্সিয়া
পান করে যায় গভীর নদীর জল।
ভালেন্সিয়ার শীর্ণ শীর্ণ কেল্লাবুরুজ
সুনম্র নীলিমায়,
তোমার নদী তো সাগরের ছোঁয়া লেগে
রূপান্তরিত গোলাপে।
যুদ্ধের কথা ভাবি আমি। এই যুদ্ধ
ঘূর্ণি বাত্যাঝঞ্ঝার মতো
ধুয়ে নিয়ে গেছে বিস্তৃত উঁচু প্রান্তর,
গম-ফলনের সমতলে গেছে বয়ে,
উর্বর এস্ত্রামাদুরা থেকে
লেবু গাছে ছাওয়া বাগানে,
আস্তুরিয়ার ধূসর আকাশ থেকে
আলো-লাগা লোনা জলায়।
মনে হয় যেন স্পেনকে বিক্রি করা হয়ে গেছে সব
নদী নিয়ে সব পাহাড় সাগর একে-একে সব নিয়ে।

সুপর্ণা সেন

কবিতা

ছোট্ট সবুজ বাগান
ঝল্‌মলে গোল পার্ক,
শেওলাসবুজ ঝর্নাতলায়
স্বপ্নে ভাসে জল,
বোবাজলের ছল্‌ছলানি
পিছ্‌লে পড়ে শিলায়।

জীর্ণ-ঝরায় পাতার
সবুজ তো প্রায় কালো,
মাঘরজনীর বাতাস

ঝরিয়ে দিল ফুল,
উড়িয়ে নিল সঙ্গে কিছু
শুকনো হলুদ ঝরা—
ধুলোর সঙ্গে খেলবে, ধূসর
এই ধরণীর ধুলো !

ও মেয়ে সুন্দরী—
কলসখানি ভরতে এলি
কাকচক্ষু জলে,
হঠাৎ আমায় দেখতে পেলে
তুলিস না তুই হাত,
অলকগুচ্ছ, চূর্ণ অলক
ঠিক করে নিস না,
স্ফটিক জলে তাকাস নে তুই
আত্মগরবিণী !

দৃষ্টি মেলে রাখিস কেবল
সুন্দরী সন্ধ্যায়—
অম্‌নি যখন স্বচ্ছ জলে
কলস ভরে যায়।

শঙ্খ ঘোষ

হোয়ান রামোন হিমেনেৎ

চারটি কবিতা

মেঠো রাস্তায় গাড়ি

শিশুটি তাকিয়ে, স্থির, অস্তসূর্যের অভিমুখে ;
নিবদ্ধ দৃষ্টিতে আমি দেখি সে শিশুকে ;

নারীটি আমার দিকে, এক দৃষ্টে। নিস্তব্ধতা।
প্রেম, দুঃখদায়
আমরা বুঝি না কিছু সে সবের।
—সূর্য অস্ত যায়।
আমাদের অজ্ঞান ত্রিস্রোতা
প্রদোষে অস্পষ্ট। নিস্তব্ধতা।

রৌদ্র
সুচির জলধারা ছায়ায় গান করে
নতুন ফুলগুলি শোনে।
এখানে কাউকেই আসতে দিয়ো না
নগ্ন রমণীকে ছাড়া!

কবিতা
আর ছুঁয়ো না, আবার ওকে অতো,
বোঝে না কেন, গোলাপ এই মতো।

মিতকথন
গোলাপ কি করে ছিল আবৃত অথচ নগ্ন একই সময়ে?
সুপর্ণা সেন

মন্দ্রস্বর

আমাদের শান্তি ভাঙে শুধু এক ঘণ্টা এক পাখির কূজন,
হয়তো-বা সমস্বর দুই ধ্বনি, উপনীত দিনান্তের ক্ষণ।

স্তব্ধতা অতল স্বর্ণ। রাত্রির প্রপাত ঝরে স্ফটিকনির্মল,
শ্বাসপুঞ্জ চারণের মতো এসে দোলায় নিথর তরুদল,

আর, এসবের দূরে আরো এক স্পষ্টভাষিণী স্রোতস্বিনী
মুক্তার ভিতর থেকে মুক্তা খুলে হয়ে যায় অনন্তবাহিনী।

নিরালায় নিরালায় সব বুঝি স্বচ্ছ সচকিত হল ঐ,
আমাদের শান্তি ভাঙে শুধু এক ঘণ্টা এক পাখির মাভৈঃ

প্রেম বুঝি দূরে থাকে ধ্রুবপদে প্রতিষ্ঠিত, শান্ত, অবিচল,
দয়িতহৃদয় মুক্ত সুখেদুঃখে, দুঃখেসুখে হয় না বিহ্বল ;

বর্ণিকা যদিও তাকে সুখী করে, বায়ু, স্পর্শ, সুগন্ধিচন্দন ;
হ্রদ জুড়ে চলে এক মগ্নবোধি হৃদয়ের শান্তিরোমন্থন ।

আমাদের শান্তি ভাঙে শুধু এক ঘণ্টা এক পাখির কাকলি,
হাতের পাতায় ধরি পূর্ণের অনন্ত পত্রাবলী ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কবি তার আপন সত্তাকে

তুমি প্রতিদিন রাখো সতেজ নবীন সিক্ত শাখা
গোলাপ যদি-বা ধরে ; তুমি চলো সতর্ক সদাই
দিন থেকে দিন, আর ইন্দ্রিয়ের সিংহদ্বারে রাখা
তোমার শ্রবণ, যদি মায়াবী শায়ক আসে, তাই ।

চিন্তার লহরী নেই যেখানে জড়ের আত্মশ্লাঘা,
বাহিরভুবন থেকে অপরূপ কোনো রোশনাই
কুড়াতে যেয়ো না তুমি । নিজের নক্ষত্র অনুযায়ী
তোমার তো সারারাত জীবনের ধৈর্যে জেগে থাকা ।

বিষয়বস্তুতে রাখো অবিনাশী তোমার স্বাক্ষর,
তার পর তুমি যেই গিরিচূড়ে শেষরশ্মি-সোনা
তোমারি স্বাক্ষর হেরো বিষয়বস্তুতে সুপ্রভাস ;

তোমার গোলাপ সব গোলাপের পরশপাথর,
তোমার শ্রবণ, সুরসংহতির ; তোমার চেতনা
সব আলোকের ; সব নক্ষত্রের—তোমার আকাশ ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

তারার আলোয় খেলা

ঠিক যখন সন্ধ্যা হয়ে এলো, বেগ্নে রঙের অন্ধকারে সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছে, তখন আমার প্লাতেরো আর আমি ঠাণ্ডায় প্রায় কাঠ হয়ে শহরের বহু আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে মজা নদীর তীরে এসে দাঁড়ালেম।

বিপুল অন্ধকারকে ভাসিয়ে দিয়ে একটু পরে চাঁদ উঠল। এক, দুই, টিপ টিপ করে তারাগুলো আকাশের বুকে আলো জ্বালতে শুরু করলে। আর মজা নদীর মাঝখানে ঠাণ্ডা বালির উপর গরীব ঘরের একদল ছেলে আনন্দের হাট বসিয়ে দিলে। আকাশ থেকে ধবল আলোর স্রোত নেমে আসছে পৃথিবীর উপর। ভবঘুরে ছেলের দল, তারি মাঝে জোট বেঁধে খেলা করছে। যার যেমন ইচ্ছে। কখনও ভয় দেখানো যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা, কখনও বা ভিখিরী সেজে মজার খেলা। একজন চোখ বুজে অন্ধ হয়ে গেল, আরেকজন অমনি খড়ের বস্তায় পুরো মাথাটি ঢেকে ভূত হয়ে চলতে শুরু করে দিলে।

প্লাতেরো, শৈশবের অপ্রবীণতায় ওরা সব কিছু ভুলে বসে আছে। তাই যদি না হবে, তবে যাদের গোটা গায়ে এক চিলতেও কাপড় নেই, শুধু পা, ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে যখন সবুজ শিরাগুলো দপ্‌দপ করে জেগে ওঠে, তারাই বা তখন কেন রাজ-রানী খেলায় মত্ত হয়ে উঠবে ?

প্লাতেরো ওদের মায়েরা, শুধু ওরাই, আর বোধহয় ভগবান জানেন কেমন করে তারা তাদের ছেলেদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে।

'আমার বাবার মস্ত একটি রুপোর ঘড়ি আছে'—

'ঘোড়া, আর আমাদের বুঝি ঘোড়া নেই, সোনালি কেশর-ওয়ালা ঘোড়া'—
'আর আমার টমিগান'—
রাত থাকতে কাজে বেরুতে হয়। এক্ষুনি কয়লাখাদের ভেঁপু বেজে উঠবে। মাঝরাত থাকতে ঘড়ি তাই জানান্ দিলো। টমিগান, সেকি কখনো ওই উষ্ণ কালো শয়তানের পোশাকের মতো ক্ষুধার বুকের ঠিক মাঝখানে বুলেট বসিয়ে দিতে পারছে।
আর ঘোড়া—তুমি বুঝি ওদের সবাইকে পিঠে চাপিয়ে নরকের পথ ধরে চলতে থাকবে? ছেলেরা সব হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়াল। আর অন্ধকারে, ওদের ঠিক মাঝখানে ফটিক জলের ধারার মতো যার গলা সেই ছোট্ট মেয়েটি, রানীর মতো, ছায়া হয়ে ঘুরে ঘুরে চড়া পর্দায় গান গাইতে থাকল।
প্রাতেরো তুমি যেন ওদের কিছু বোলো না, দেখছ না, বসন্তকালের মতো যৌবনের আড়ালে চুপিসারে লুকিয়ে থাকা কন্‌কনে শীতকাল ওদের ভয় দেখিয়ে ওদের গান ওদের স্বপ্ন সব কিছু কেড়ে নিতে আসছে।
আর কেন। কই প্রাতেরো চলো।

কল্যাণ চৌধুরী

থেসার ভালেখো

জনতা

যুদ্ধ প্রায় শেষ,
যখন সে মৃত, সেই সৈনিক, যেন কে তার পাশে উঠে এলো
জানাল: 'মরো না; আমি এতো ভালোবাসি যে তোমাকে!'
হায়! সেই শব তবু মরণে তখনও অব্যাহত।

এবার তুজন তার কাছে এলো আবার জানাল :
'যেও না যেও না ছেড়ে আমাদের ! শক্তি ধরো !
আবার জীবনে ফিরে এসো !'
হায় ! সেই শব তবু মরণে তখনও অব্যাহত।

তারপর বিশজন, ক্রমে শত-সহস্র-অযুত
চিৎকার জানাল : 'এতো ভালোবাসা, অথচ মৃত্যুর কাছে
এতো অসহায় হয়ে থাকা !'
হায় ! সেই শব তবু মরণে তখনও অব্যাহত।

তারপর কোটি কোটি জনসঙ্ঘ তাকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই
প্রার্থনা জানাল একসাথে : 'বন্ধু যেও না যেও না !'
হায় ! সেই শব তবু মরণে তখনও অব্যাহত।

সেই জনপদজোড়া সমস্ত জনতা তার চারদিকে তখন ঘিরে এলো ;
আর সেই শোকালিপ্ত শব তার সবার মুখের দিকে চেয়ে
ধীরে আন্দোলিত হলো, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে
প্রথম মানুষটিকে আলিঙ্গন করে, পায়ে পায়ে ··

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেদেরিকো গারথিয়া লোর্কা

গোলাপের গজল

গোলাপ
খোঁজে না সময়সূচনা, ঊষা :
আপন বৃত্তে চিরজীবী-প্রায়, খোঁজে
আর কিছু, আরো কিছু।

গোলাপ
বোঝে না তত্ত্ব, আলো কি ছায়া :
কিছু-কায়া-কিছু-মায়া সে, কেবল খোঁজে
আর কিছু, আরো কিছু।

গোলাপের মন
মজে না গোলাপ-রাগে।
আকাশচিত্রে মূর্ছিত, ও-কি খোঁজে
আর কিছু, আরো কিছু!

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মূক শিশু

শিশুটি খুঁজছে আপন কণ্ঠে স্বর
(ঝিঁঝির দেশের রাজা কি পেয়েছে তাকে !)
এক ফোঁটা জল, জলে ঝুঁকে পড়ে শিশু
শিশুটি খুঁজছে আপন কণ্ঠে স্বর।

চাইনে চাইনে অমন কণ্ঠ আমি
কথা-বলাবলি চাইনে ; বরং ওতে
গড়াব অঙ্গুরীয়, সে-অভিজ্ঞান
পরাব আমার নৈঃশব্দ্যের হাতে।

এক ফোঁটা জল, জলে ঝুঁকে পড়ে শিশু
শিশুটি খুঁজছে আপন কণ্ঠে স্বর।

(বন্দী সে স্বর, দূরে দূরে বহুদূরে,
নিয়েছে তখন ঝিঁঝি-ঝিন্‌ঝিন্ দেহ।)

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আন্দালুশীয় মাল্লাদের গান

কাদিৎস ছাড়িয়ে জিব্রালটার যেতে
কী বা সে সুখের পথ !
সাগর, সে চেনে আমার পায়ের ধ্বনি
সাগর, জানে সে শুধুই দীর্ঘশ্বাস ।
ওগে মেয়ে, ওগো মেয়ে,
ডিঙা সারে সার মালাগার বন্দরে !

কাদিৎস ছাড়িয়ে সেভিলের পথে পথে
পুঞ্জ পুঞ্জ কত-না লেবুর কুঞ্জ !
লেবুর কুঞ্জে আমার পায়ের ধ্বনি
কুঞ্জে কুঞ্জে নাকি সে দীর্ঘশ্বাস ।

ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে,
ডিঙা সারে সার মালাগার বন্দরে !

সেভিল ছাড়িয়ে কারমোনা যেতে পথে
সে কি একটিই স্মৃতির শানানো ফলা !
সেপথে কখন বাঁকা চাঁদ বুকে বেঁধে
আহত বাতাস ফেরে হায়-হায় করে ।

ওরে ছেলে, ওরে ছেলে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে গেল বাহন আমার ভেসে !

দূর নির্জন লবণ খনির পথে
স্মরণ তোমার ফেলে এলুম যে প্রিয় !
এখন যে-কেউ চাইবে আমার মন
চাক সে আমার সকল বিস্মরণ ।

ওরে ছেলে, ওরে ছেলে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে গেল বাহন আমার ভেসে !

কাদিৎস, এ পথে এগোস নে যেন আর,
এগোলে সাগর ভরাডুবি দিক তোরে।
সেভিল, সাহসে বুক বাঁধ্‌, মাথা তোল্‌
নইলে নদীতে তোর-যে বিসর্জন।

ওগো মেয়ে
ওরে ছেলে!
কী বা সে সুখের পথ!
কত না নৌকো বন্দরে সারে সার,
ওদিকে শহর-কেন্দ্রে বিরহ-হিম!

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

অবিশ্বাসিনী পত্নী

তাই আমি তাকে নিয়ে গেলাম নদীর ধারে
মনে করেছিলাম সে কুমারী,
কিন্তু স্বামী একজন ছিল তার আগে থেকেই।
সেটি ছিল সেণ্ট জেম্‌স্‌ রজনী,
মনে হলো এই রাত্রিকে ব্যর্থ করবার অধিকার আমার নেই।
সমস্ত লণ্ঠন নিবে গেল
আর জ্বলে উঠল ঝিঁঝির ডাক।
দূরতম পথপ্রান্তে গিয়ে আমি
স্পর্শ করলাম তার নিদ্রিত দুটি স্তন,
হায়াসিন্থ ফুলের মঞ্জরীর মতো
তারা চকিতে আমার সামনে ফুটে উঠল।
তার ঘাগরার খসখসানি
আমার কানে লাগল যেন
একটুকরো রেশমী কাপড়
কে দশখানা ছুরি দিয়ে চিরে চিরে ফেলছে।
গাছগুলো আরও অনেক দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল

এতোটুকু রুপোলি আলোও লেগে ছিল না তাদের পল্লবে,
অনেক অনেক দূরের নদীতট থেকে ডেকে উঠেছিল
সারমেয়সঙ্কুল একটি দিগন্ত।

কালজামের বন ছাড়িয়ে,
উলুখাগড়ার, কাঁটাগাছের বন ছাড়িয়ে,
তার অলকগুচ্ছের তলায়
হালকা বালিতে আমি গহ্বর রচনা করলাম।
গলা থেকে খুলে ফেললাম আমার টাই।
সে খুলে ফেললে তার বহির্বাস।
আমি রিভলভার সুদ্ধ আমার কোমরবন্ধ।
সে তার শেষ কাঁচুলী।
এত বর্ণবিভল দেহচর্ম আমি
দেখিনি সুরভিলতায়, দেখিনি মুক্তাজননীরও শরীরে,
রুপোবাঁধানো কাঁচপাত্রের ঝিকিমিকি
সেও বুঝি এতো তীব্র উজ্জ্বল নয়।
উরুদুটি তার পিছলে পিছলে সরে গেল আমার কাছ থেকে
সচকিত মাছের মতন,
একপাশ বহ্নিদীপ্ত,
অপরপাশ বিহ্বলতায় নিথর।
সেই রাতে আমি ঘোড়া ছুটিয়েছিলাম
সুন্দরতম পথে পথে,
সাজ-না-পরানো এক ঝিনুকের ঘোড়া,
তাতে না ছিল লাগাম না জিন না রেকাব।
সে আমাকে যত কথা বলেছিল
পুরুষ হিসেবে তা আমি জানাতে পারি না।
আমাদের দুজনের মধ্যেকার বোঝাপড়ার ভাবটুকু
আমাকে বেশ বিচক্ষণ করে তুলেছিল।
চুমোয় চুমোয় আর বালিতে বালিতে অভিষিক্ত হয়ে
তাকে নিয়ে ফিরলাম আমি নদীর ধার থেকে।

পল্লপাপড়ির তরোয়ালগুলো যুঝতে লাগল
প্রচণ্ড হাওয়ার সাথে।

আমি যেমন, তেমন ব্যবহারই আমি করেছিলাম তার সাথে।
সত্যিকারের বেদিয়ার মতো।
সেলাইয়ের সরঞ্জাম ভর্তি ধানীরঙা সাটিনের
একটি বাস্কেট আমি তাকে দিয়েছিলাম,
আর আমি প্রেমেও তো পড়িনি
কেননা যদিও স্বামী একজন তার ছিল আগে থেকেই
সে আমাকে জানিয়েছিল সে কুমারী,
যখন আমি তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম নদীর ধারে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাম

শস্পহীন পর্বতচূড়ায়
প্রোথিত প্রতীকী ক্রুশ
নির্মল জলধারা
এবং শতায়ু জলপাইবৃক্ষ।
সংকীর্ণ পথে পথে
আলখাল্লা জড়ানো মানুষ,
গম্বুজে গম্বুজে
বায়ুবিদ যন্ত্র ঘুরছে।
অনন্তকাল ধরে
ঘুরছে।
হায়গো শোকমগ্ন আন্দালুসিয়ার
সেই হারিয়ে যাওয়া গ্রাম!

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাসন থেকে

কে তুমি আমায় ডাকো শব্দহীন কে তুমি আমাকে
অত দূর হতে ডাকো অমন আবেগভরে, আর
ত্রাসজাগানিয়া ওই নিঝুম হাওয়ায় কে আমার
নাম উচ্চারণ করো নিঃসাড় নিঃশব্দ ডাকে ডাকে ?

কে তুমি বলো কী চাও বলো কেন ডাকো কী কারণ
কী ব্যথা ঝুরিয়া মরে ওই দূর ধ্বনির গভীরে ;
অমন চাপা গলায়, ও যেন ত্বকের বাধা ছিঁড়ে
কঠিন মোচড়ে সব অস্থি করে আনে নিষ্কাশন !

তুহিন শব্দের স্বাদ আমার সমস্ত দাঁতে দাঁতে,
আমার অসাড় জিভে লেগে আছে গতাসু সন্ত্রাস,
হৃদয়ে আমার অবরুদ্ধ এক হৃদয়স্পন্দন।

বৃষের শরীর যায় ভেসে যায় রক্তের ধারাতে,
অকূল সমুদ্র ভাসে অশ্রুর বিশুষ্ক জলরাশ ·····
···আমায় ডেকেছে যারা সব চলে গেছে এতোক্ষণ।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই প্রাতঃকাল

এই প্রাতঃকাল, প্রিয়া, আমাদের কুড়ি বছরের।
এসো হাঁটি একসাথে, শান্ত পায়ে, কারুকার্যে রাখি,
আমাদের মিলিত উন্মুক্ত পদছায়াগুলি, বাগানের পথ ধরে যাই
সকল সবুজ দেখো চোখে রাখে সমুদ্র নীলিমা।
তুমি প্রায় ছায়ালীন, তুমি
সায়াহ্নের আঁধারে যে এসেছিল তার-ই প্রতিরূপ

আলো-অন্ধকারে

যখন বিষাদমগ্ন তরুণ নগরবাসী এবং অলস
বাড়ি ফেরবার পথ ক্লান্ত পায়ে অতিক্রম করে।
আমার নিকটে তুমি, আজো খোঁজো ব্যগ্র অন্বেষণে
বালির পাহাড় তার ভিতরের রহস্য-বারতা
ক্রমনিম্ন বালুর গোপন আর গূঢ় শরবন
সমুদ্রের, বাতাসের নয়ন সম্মুখে আজো যারা
অবগুণ্ঠনে অবগাঢ়।
তুমি আছো, তোমার নিকটে আমি, অনায়াস নিয়ন্ত্রণ করি
তরঙ্গের আনন্দ-প্লাবিত উত্তেজনা,
সমুদ্রের নিরুদ্দিষ্ট উন্মত্ত হৃদয়,
এবং বিক্ষিপ্ত ফেনা লবণের আঘাতে বিক্ষত।
পতন-উন্মুখ দুর্গ শেষ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, আমাদের
অর্ঘ্য আনে সামুদ্রিক পুষ্পের মালিকা, স্বচ্ছন্দ তরণী
হাওয়ায় ভাসিয়ে পাল গান গায় প্রাসাদ-চূড়ায়।
এই প্রাতঃকাল, প্রিয়া, আমাদের কুড়ি বছরের।

আলোক সরকার

প্রত্যাবর্তন

ফিরে আসে গুঁড়ো গুঁড়ো ভস্মীভূত অশ্মন্ সকলই।
ফিরে আসে বিচূর্ণ মন্দির দেবালয়,
উল্লসিত বেশ্যালয়, সবুজ প্রাঙ্গণ যেইখানে
ইন্দ্রধ্বজের উচ্ছলতা
উষ্ণ রাখে অগণন ঝর্নার স্মৃতিকে।

দয়িতা আমার, চলো অবলুপ্ত পথে-পথে যাই,
ভাস্বর ত্রিকোণ রেখা চতুষ্কোণের নির্দেশিত
রহস্যজনক প্রেম আর লুক্কায়িত
প্রমোদপুঞ্জের স্মৃতি আজো এই রাত্রিতে মধুর।

এই সেই দেবীর মন্দির। এই নীল
দৈত্যবিহারের মধ্যে আজো সেই গন্ধ পাওয়া যাবে
সমুদ্রঢেউয়ের, যূথীরঙ্গনের আর
রক্তমাংসে লবণাক্ত পুষ্পরাগ তমুকা দেবীর।

যোনিচিহ্ন, চিরদিন যেরকম এখনো তেম্নি
লাস্যরত, সংঘর্ষ বাধায় ঘন পল্লবগহনে,
স্থাপিত যে চিৎপাত্রে প্রেমের দেউলে
তা ওকে উদ্বুদ্ধ করে, মেলে ধরে। সারা পৃথিবীর
সমস্ত ফলের গুচ্ছ মিলে যত তারো চেয়ে ভারি।
রতি হেসে হেসে সারা ছায়ার আড়ালে
শ্রোণীতে অনুরণিত অম্বুধি অম্বুধি।

হে অনাদি উজ্জ্বলতা! হে স্থদূর জ্যোতি!
নগ্ন শিখা, ভালোবাসো, কীর্ণ হও আমাদের 'পরে।
একদিন জানি জানি আমরা পাথর হয়ে যাব,
দয়িতা আমার, আমরা যবে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাব
যেন দোঁহে এই সব পাথরের মতো শুয়ে রৌদ্রে গাই গান,
যারা আসবে ভালোবাসবে আমাদের লুপ্ত পথ ধরে॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নামরাখা ভোর

নম্র রাঙা নিতান্ত অবুঝ
ভোর তোমাকে দিচ্ছিল নাম একের পরে এক:
স্বপ্ন-দ্বিধা খেয়ালখুশির পরী,
ঘন বনের চেরাপুঞ্জী।

আমার মনের চতুঃসীমায়
হাৎড়ে খুঁজি যত নদীর নাম,

থরোথরো, সন্দেহবিমূঢ় :
শতদ্রু তারকা নাকি অশ্রুমুখী আলো,
নাকি নীরব টল্‌টলে শ্বেতপাথর ?
না।
জলের উপর হিমের ভ্রান্তি, সেই তো তোমার নাম॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নিকোলাস গিলেন

চারণগীতি

তোমার মস্তিষ্ক থেকে সপ্রতিভ তোমার জঠর,
সপ্রতিভ যেমন তোমার তলদেশ।
হেরো—
তীক্ষ্ণ কৃষ্ণ কান্তি বিচ্ছুরিত
বিবসন তোমার নারীরে।

তুমি মহারণ্যের প্রতীক !
রক্তমণিহার,
সোনার মকরচূড়, আর
কালো কালো ভয়াল কুম্ভীর
অথৈ সাঁতার দিচ্ছে তোমার চোখের জাম্বেসিতে॥

সুপর্ণা সেন

ছোট্ট একটি গাথা

খুব পুরোনো, সেই পুরোনো উজ্জয়িনী,
অনেক দূর,

হৃদয় ভেসে গিয়েছিল নিশীথবেলা,
এই তো সব।

একটি নবীন দৃষ্টি দীঘল
অনেক দূর,
সিক্ত ঠোঁটে বলেছে 'না'
এই তো সব।

আকাশ-যবনিকায় লাগে ঝল্‌কানি
অনেক দূর,
চতুর্ধারে কম্পমান তারার দল
এই তো সব।

পথের মৃদু পদধ্বনি, আ,
অনেক দূর,
চিরকালের শেষ পদপাত
এই তো সব।

রহস্যময় বন্দরের
অনেক দূর,
একটি শাদা হাত, একটি চুমু
এই তো সব॥

শঙ্খ ঘোষ

লুইস থেনু দা

ওরে বিহঙ্গ

খাঁচা অলখ বিহঙ্গটির খাঁচা,
জলধারার হাওয়ার সহোদরা,

ওরই গানের তরে আমার
দীক্ষিত হাত পাতা।

যেমন কলসকারায় রুদ্ধ জল,
কেঁপে ওঠে, সে ফের জেগে ওঠে
রামধনুর ফোয়ারায় ফোয়ারায়,
হৃদয় তারে মানে শরণশিখা।

যেমন হাওয়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে,
এমন আবছা কয় সে কথা, এমন
শুদ্ধ স্বরে, অনেক স্মরণীয়,
ভুলে যাওয়া অনেক প্রাচীন কথা।

কোন্ অমরার ফল তোকে, কোন্ সুধা
তৃষ্ণা মিটিয়েছে, পরশ রেখে
গেছে ও তোর কণ্ঠে? আমায় বল্,
গান গা, ওরে বিহঙ্গ, ও বীণা!

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাব্লো নেরুদা

ধর্ষিত দেশ

অবগুণ্ঠিত অঞ্চল
অসংখ্য শহীদের আত্মত্যাগে, সীমাহীন স্তব্ধতায়,
মৌমাছি আর চূর্ণ চূর্ণ পাহাড়ের হৃদ্‌স্পন্দনে।
গম আর সবুজ শষ্পের আশা জাগায় না এই দেশ,
এখানে ওখানে ছড়িয়ে রাখে চাপচাপ রক্ত আর শয়তানির নমুনা

ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ গালিসিয়া,
বৃষ্টিধারার মতো পরিশুদ্ধ,
চিরকালের জন্যে কান্নায় বিষাক্ত হয়ে গেল :
বুলেটের গর্তের মতো কালো ঝল্সানো এক্সপ্রেমাদুরা,
প্রতারিত আর জখ্মি আর বিধ্বস্ত এক্সপ্রেমাদুরা,
যার আকাশ আর ঝকঝকে এনামেলের মহামহিম তটভূমিতে
আজ শুয়ে আছে বাদায়োৎস্, স্মৃতিভ্রংশ অবস্থায়,
মৃত সন্তানদের বুকে নিয়ে তাকিয়ে আছে সে আকাশে—
সে আকাশ মনে করে রাখে মালাগাকে ·
সেই মৃত্যুর আবাদ মালাগা,
সেই সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মে পশ্চাদ্ধাবিত মালাগা
পশ্চাদ্ধাবিত—যতক্ষণ না কিংকর্তব্যবিমূঢ় মায়েরা
উন্মত্ত, আছড়িয়ে মেরে ফেলেছিল নবজাত সন্তানদের।
শুধু আক্রোশ আর শোকের অনবকাশ
শুধু মৃত্যু আর ক্রোধ—
যতক্ষণ না অশ্রু আর বুকফাটা দুঃখের পুনর্মিলন ঘটেছে,
যতক্ষণ না কথা আর হতাশা আর ক্রোধ
রাস্তার ওপর কঙ্কালের স্তূপ হয়ে জমে উঠেছে
কিংবা কবরের ওপর ধুলোয় ঢাকা স্মৃতিফলক হয়ে।
এতো অগুন্তি কবর, এতো শহীদের আত্মত্যাগ, হায় রে
ধ্রুবতারার দেশে এতোগুলো জানোয়ারের উন্মত্ত দাপাদাপি!
হায় রে!
এই ভয়ংকর রক্তাক্ত ক্ষত কিছুতে শুকোবার নয়,
জয়লাভেও না :
কিছুতে না, সমুদ্র-সিঞ্চনে না—
সময়ের সিকতাসৈকত অতিক্রম করে এলেও না,
কবরের মাটিতে মাটিতে জ্বলন্ত জেরানিয়ম ফুটলেও না।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যাবর্তন

পিতৃভূমি, হে আমার স্বদেশ, এবার তোমার দিকেই মুখ ফেরাই
তবু কী মন-কেমন করে তোমার জন্যে মায়ের জন্যে যেমন শিশুর
মন কেমন করা
কান্নায় ভরা।
কোলে তুলে নাও এই অন্ধ সেতার
আর এই অনাথ মাটিতে।

আমি বেরিয়ে পড়েছিলুম সংসারে তোমাকে সন্তান উপহার এনে দিতে,
আমি নেমে গিয়েছিলুম পতিতকে পথ দেখাতে তোমার তুষারিত
নামের মহিমায়,
আমি গিয়েছিলুম ঘর বাঁধতে তোমার শক্ত গাছের গুঁড়িতে,
আমি গিয়েছিলুম আহত বীরদের জন্যে তোমার দেওয়া সম্মান বহন
করে আনতে।

আর এখন আমি বুকে তোমার ঘুমোতে চাই।
দাঁও আমাকে তোমার মর্মভেদী ঝংকারমুখর স্বচ্ছ রাত্রি
তোমার পালতোলা নৌকোর রাত্রি, তোমার তারায় তারায়
বিশালতা।

হে আমার স্বদেশ : আমি আমার পুরোনো দিন বদল করে নিতে
চাই।
হে আমার স্বদেশ : দাও আমাকে নতুন কামনার গোলাপ।
তোমার ক্ষীণাঙ্গ কটিতট আমাকে হাত দিয়ে জড়াতে দাও
সমুদ্র উচ্ছ্বাসে চূর্ণ তোমার উপল উপকূলে বসতে দাও আমাকে
যেন মুঠো মুঠো বাজরা কুড়িয়ে মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে পারি তার।
এই আমি চললুম সার-সুপুষ্ট সুকুমার ফুলগুলো বেছে বেছে তুলতে
চললুম তুলো থেকে তুষার-শাদা সুতো কাটতে
আর এই মহিমান্বিত নির্জন ফেনার মুখোমুখি

তোমার সৌন্দর্যের গলায় পরানোর জন্ম গাঁথব এক সমুদ্রোপকূলের
মালা।

পিতৃভূমি, হে আমার স্বদেশ,
প্রতিরোধের পারাবারে, তুষারের বাধার দেয়ালে
আদিগন্ত ঘেরা
চোখে তোমার প্রহরী ঈগলের দৃষ্টি, বুকে তোমার গন্ধকের বিস্ফোরণ,
পবিত্র পশম আর পান্নায় মোড়া তোমার দক্ষিণ মেরুদেশের হাতে
একফোঁটা অনির্বাণ মানবিকতার আলো
টলমল টলমল করে, শত্রুদেশের আকাশে আগুন লাগায়।

সেই আলোকে বাঁচিয়ে রাখো, পিতৃভূমি, তুলে ধরো আকাশে
অন্ধ, আশঙ্কাআতুর এই বাতাসে
তুলে ধরো মৃত্যুহীন তোমার ফসলিয়া আশা
আর তোমার দূর দূর প্রান্তরে পড়ুক এই সুদুর্লভ আলোর রেখা,
মানুষের এই ভবিষ্যৎ,
ঘুমন্ত আমেরিকার বিস্তীর্ণ বিপুলতায়
এইভাবে আগলিয়ে রাখো তুমি একক প্রাণের রহস্যময় পুষ্পকে।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রাণচঞ্চল বাদামি রঙের শিশু

বাদামি রঙের ছল্‌বলে ছেলে, যে-সূর্য ফল দেয়,
এবং শস্য পরিণত করে, সমুদ্রশৈবাল
বাঁকায়-চোরায়, সে তোমার সুখী শরীর তীব্র চোখ
গড়েছে, তোমার আননে এনেছে জলের সহজ হাসি।

দুশ্চিন্তায় কালো সূর্যটা তোমার কালো কেশরে
জড়িয়ে গিয়েছে যখন তোমার হাত দুটি মেলে ধরো।
তুমি খেলা করো সূর্যে যেমন জোয়ার-লাগা নদীতে,
সে রাখে তোমার চোখে দুটি কালো হ্রদ।

বাদামি রঙের ছলবলে ছেলে, কী করে যে কাছে যাব,
সবই এই মধ্যাহ্নে আমার কাছ থেকে যায় সরে।
তুমি তো স্বৈরেলা বিকারে মূর্ত মধুপের যৌবন,
ঢেউয়ের মদোন্মত্ততা আর গমের সম্ভাবনা।

আমার সমাচ্ছন্ন হৃদয়ে তোমাকে সদাই খুঁজি,
ভালোবাসি তোর সুখী শরীরটা, গাঢ় ও নরম স্বর,
ঘন প্রজাপতি, মধুর সুনিশ্চিত
গমপ্রান্তর সূর্য আফিং জলের তোড়ের মতো।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সাঁজাই

শরীরী ত্বকের চেয়ে আরো তুমি গভীরে আমার।
যখন ভিতরে খুঁজি, ধমনীতে, শোণিতপ্রবাহে,
আমাব রহস্যঘন আলোকের সঞ্চারিণী শিরায় শিরায়
তোমারেই দেখি, যেন তুমিই শোণিতধাবা, যেন
তুমি কোনো শিলা আর তীব্র কোনো স্বাদ।
আমি শুধু বাহিরেই ঘুরি বহুকাল, ঘুরি বচনে, প্রলাপে, পবিচ্ছদে।
যেন আমি কোনো এক আদিম অরণ্য, অন্ধকার,
যখন প্রবেশ করি, কূপের গহনে যেন নত,
যেন কোনো অন্ধজন, নিজেরই জগতে চলি পথ খুঁজে খুঁজে,
কিছুই নিশানা নেই, কোনো আলম্বন নেই, পরিবর্তে তার
আমার আবাসদেহে তোমাব গোলাপ বিকশিত।
গভীরে আমার তুমি ফুটে ওঠো ক্রমে, কোন্ অতল অমেয় উৎস তার,
ঐ দুটি চোখ যেন ছুঁতেও পারি না।
ভয় হয়, পাপড়ি তার দগ্ধ করে দেবে সব আঙুলশিখর,
তোমার অঙ্গের শিখা আমার তৃষ্ণায় জ্বেলে যায়
মুখের পত্রালি, ওরা তোমারে সরায় যেন দূরে।
'কে ওখানে? ওখানে কে?' বলে উঠি, যেন খুব রাতে

খুব রাতে কেউ এসে দরোজায় টোকা দিয়ে যায়, তারপর
চতুর্দিকে শূন্যতার মাঝখানে বাতাস বাতাস শুধু আর কিছু নেই,
আর শুধু গাছ, জল, প্রাত্যহিক নিভন্ত আগুন,
যেন আর কোনো কিছু ছিল না ওখানে,
কেবল যা-কিছু থাকে তাই থেকে যায়,
সমস্ত পৃথিবী শুধু হানা দেয় দুয়ারে আমার।
তেমনি কি নামহীন জীবনের মতো রেখাময়,
ঘন পঙ্ক, ফুটে-ওঠা উদ্ভিদের মতো
আমার বুকের মাঝে ধীরে জেগে ওঠো তুমি যখনই দুচোখ বন্ধ করি!
মৃত্তিকার বক্ষে আমি, আর তুমি যেন
বিকীর্ণ ধূলির মতো প্রাণনায় জেগে ওঠো, আর
যদি নদী গাঢ় করে পলি
দূরে ঢেকে রাখে নগ্ন জটিল শিকড়গুলি, ওরা
যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি তোমার সত্তা ছড়াও আমার মধ্যে তুমি,
ওরই মতো সঙ্গে করে আনো এক দারুণ আঁধার।
তাই আজ এইখানে, শোণিতে অথবা শস্যে, মৃত্তিকায় অথবা আগুনে,
আমরা যেন বেঁচে থাকি কোনো এক তরু—
সে নিজের পাতাগুলি অবধি চেনে না!

শঙ্খ ঘোষ

প্লাৎসা

বসন্ত

এইখানে আজ নির্বাসনের বসন্তে
সেতুর ছায়াপাশে—
জানি, আমি প্রৌঢ়, আমার নির্জনতায় সঙ্গী কেবল ব্যথা।
শিকল বড়ো বুকের উপর বাজে
মুক্তি আমার হারা!

এই তো আমি, জটে-জটিল কীটে-কুটিল গুঁড়ি,
শীতের বেলায় জীর্ণ পাতায় ঝরা।
এই তো আমার শাখায় শাখায় আসে
এই তো আমার স্মৃতিকৃপণ শিরে
আলতো পাখায় আসে ভোরের চড়ুই
ওই যে বাঁধে বাসা।

এই যে আমি, অন্য যুগের সেতু—
স্মৃতি আমার, নবীন স্মৃতি, পলায়মান স্মৃতি
দৃষ্টি ছেড়ে পালিয়ে যায় সরে,
সূর্যদাহের নিচে যেমন
গলে তুষারধারা,
চিহ্ন থাকে তীব্র শুধু প্রতিফলন, যেন
দর্পণে এক ঝল্‌মলানো আলো।

শঙ্খ ঘোষ

ইংরেজি কবিতা



উইলিয়ম ব্লেক

বাঘ

বাঘ, বাঘ, তুমি রাঙা অঙ্গার ;
জ্বলো অরণ্যে ঘন তমসার ।
কার হাত চোখ মৃত্যুঞ্জয়
গড়েছিল ওই সুঠাম প্রলয় ?

অতল সাগরে, অগম শূন্যে
জ্বলেছিল কি ও আঁখির বহ্নি ?
সে আগুন নিতে ভরে দুই মুঠি
ভর করেছে সে কোন্ পাখা দুটি ?

কত বড়ো কাঁধ, কোন্ সে যন্ত্রী
গড়িয়েছে তোর হৃদয়তন্ত্রী ?
জাগিয়ে পাঁজরে আদিতম ধ্বনি
কোন বাহুবল, পায়ের বাঁধুনি,

কিসের হাতুড়ি, কেমন শেকল,
মগড়া-গলানো কোন দাবানল,
কিসের নেহাই, কী সাঁড়াশি-চাপ
বেঁধেছিল ওই দারুণ প্রতাপ ?

দীর্ঘ বর্শা তারাদের হাতে
খসে গেলে, নীল অশ্রুপ্রপাতে
ধুয়ে গেলে, গড়া হয়ে গেলে শেষ
সে কি হেসেছিল ? তারই রচা মেষ ?

বাঘ, বাঘ, তুমি রাঙা অঙ্গার,
জ্বলো অরণ্যে ঘন তমসার ।
কার হাত চোখ মৃত্যুঞ্জয়
গড়েছিল ওই সুঠাম প্রলয় ?

নরেশ গুহ

পতঙ্গ

ওরে পতঙ্গ, ছোটো পতঙ্গ,
এই নির্বোধ আঙুলে আমার
চঞ্চল তোর নিদাঘ-রঙ্গ
মুছে গেল, ফুটে উঠবে না আর।

তোমার মতন আমিও কি নই
দ্বিতীয় একটি পতঙ্গ? আর
ওরে পতঙ্গ, তাহলে আবার
তুমিও কি নও আমার মতোই?

কেননা, অন্য অন্ধ আঙুলে
ভাঙবে আমারও এই পাখা দুটি।
এখনও ভাঙেনি, তাই পাখা তুলে
নাচি, গান গাই, আনন্দে ছুটি।

চিন্তাই যদি জীবনের বিভা
শক্তি এবং প্রাণবায়ু, আর
চিন্তাবিহীন জীবন যদি বা
মৃত্যুর মতো রিক্ত, অসার—

তাহলে তাহলে—বিলুপ্ত হই,
অথবা জাগাই জীবনরঙ্গ—
ওরে পতঙ্গ, তোমার মতোই
আমিও তো এক সুখী পতঙ্গ।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রুগ্ন গোলাপ

গোলাপ, তুই রুগ্ন, ও গোলাপ!
যে কীট উড়ে বেড়ায় চারিভিতে
উড়ে বেড়ায় অদৃশ্য শরীর
ঝঞ্ঝামুখর তিমির রজনীতে,

তোর ওই লোহিত আনন্দ-উত্তাল
শয়ন খুঁজে পেল সে : ওই তার
নিবিড়-গহন গোপন ভালোবাসায়
তোর জীবনে ঘনায় আঁধিয়ার।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবর্ট বার্ন্‌স্

গোলাপবালা

আমার প্রিয়া যেন গোলাপ লাল,
সদ্য ফুটেছে সে জ্যৈষ্ঠে।
আমার প্রিয়া যেন বাঁশির তান,
সুরটি তার ভারি মিষ্টি।

তুমি কী সুন্দর, মেয়েটি মোর,
গভীর প্রেমে আমি স্তব্ধ।
বাসবো তোরে ভালো জীবনভোর,
সাগর না শুকোনো অবধি।

সাগর না শুকোনো অবধি, আর
পূর্বে যতদিন সূর্য—

বাসবো তোরে ভালো, প্রেয়সী মোর,
নইলে বৃথা প্রাণ মোর যে।

তোমার ভালো হোক, গোলাপবালা,
তোমার শুভ চায় যে-জন,
আসবে ঠিক ফের, গোলাপবালা,
যদি বা থাকে দূর যোজন।

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জীন্

যতেক দিক হতে বাতাস আসে বহে
প্রতীচী মোর শুধু প্রিয়;
কারণ সেইদিকে প্রেয়সী আছে মোর,
আমারে ভালোবাসে সে-ও।

ব্যবধি বনভূমি, বিপুল নগনদী,
পাহাড় পেরোতেও দিন!
কিন্তু কল্পনা, তড়িৎগতি তার,
আনবে কাছে টেনে জীন্!

তারেই হেরি আমি শিশিরভেজা ফুলে,
মধুর, নম্র, বিনতা।
তারেই শুনি আমি পাখির গানে-গানে
বাতাস স্তব্ধ শুনে তা।

এমন ফুল নেই ঝর্নাপথধারে,
বৃক্ষে-বনতলে, কিংবা
এমন পাখি নেই গলায় গান যার
স্মরণে আনবে না জীন্ যা।

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থ

দিবা-স্বপ্ন

সরু গলির মোড়ে, যখন, দিনের আলোক ঝরে
ময়না দাঁড়ে গাহে, এমন গাইছে বছর ধরে ;
সুসান্ যেতে পথে, হঠাৎ শুনতে পেলে গান,
শব্দ সাড়া নাইক ভোরে শুধুই পাখির তান।
মন ডুবিল গানে, একি, কী হলো ওর আজ,—
দেখছে যেন, জাগে পাহাড় গাছের পরে গাছ ;
উজল হিমের ঢেউ চলেছে গলিটির মাঝ দিয়ে,
ঘেঁসাঘেঁসি বস্তি মাঝে চল্‌ল নদী ধেয়ে !
সবুজ গোঠের ছবি, তাহার পাহাড় দুটি ধারে,
সে পথ দিয়ে গেছে কত কল্‌সী নিয়ে ভরে ;
একটি ছোটো ঘর সে যেন বাবুই পাখির বোনা,
তার চোখে সে ঘরের সেরা, নাইক তার তুলনা ;
স্বর্গের সুখ পরানে তার ; মিলিয়ে আসে ধীরে,—
মোর কুয়াশা, ছায়া নদী, পাহাড় যত তীরে ;
বইবে নারে নদী, পাহাড় তুলবে না আর শির,
স্বপন টুটে, নয়ন ফুটে, মুছে নয়ননীর।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সমুদ্রসেকতে

অপরাহ্ন নয়নাভিরাম, শান্ত এবং অবাধ ;
পবিত্র সময় স্তব্ধ ঠিক যেন এক সন্ন্যাসিনী
রুদ্ধশ্বাস ঐশ্বরিক প্রেমে ; সহস্রাংশু দিনমণি
ধীরে ধীরে ডোবে তার প্রশান্তির গভীরে অগাধ ;
সমুদ্র আবৃত ব্যাপ্ত আকাশের নম্র আবরণে :

ওই শোনো, মহাবীর্য সত্তা জাগরূক, চিরন্তন
শক্তিতে অনন্ত ধ্বনি সৃষ্টি করে বজ্রের মতন।
প্রিয় শিশু, রে প্রিয় বালিকা, তুমি রয়েছ ভ্রমণে
এখানে আমার সঙ্গে, মনে হয় গম্ভীর ভাবনা
তোমাকে করেনি স্পর্শ, তাই বলে তোমার প্রকৃতি
স্বর্গীয় তো কম নয় : সংবৎসর হৃদয়-শয়নে
আছো অ্যাব্রাহামের, জানি বা না-জানি ঈশ্বরের স্থিতি
সর্বদা তোমার সঙ্গে, আর তুমি পূজার প্রাঙ্গণে—
মন্দিরের অন্তস্তলে, পূজা করো, করো উপাসনা॥

আলোক সরকার

সাঁকো

ঘুরে মরে ঝর্না এক, সেই ঝর্না হঠাৎ কখন
নির্ঝরিণী হলো যেন রাজবৎ উন্নত ধ্বনির।
একটি কাঠের সাঁকো চুপে সদা নির্ঝরিণীটির
পারাপার করে। যেন নির্বাচিত এ এক ভুবন
মণ্ডনসর্বস্বতায় পাথরে পাথরে এ কেমন
মসৃণ যমক শ্লেষ, মধ্যখণ্ডনে স্বচ্ছ জল
ছুটে যায় ছুটে যায় দ্বিধাহীনতায় অনর্গল।
কি রকম দৃপ্ত দ্রুত ওদের চকিত প্রবহণ,
এখনো, এখনো যায়! বন্যা যত ফুলে ফুলে ওঠে
একটি শিশু রাখে তার নওল সাহস ঐ স্রোতে
আর এক বৃদ্ধ তার অবসন্ন পৌরুষের ভারে
লক্ষ্য করে ধূর্ত জন ঘোলা জল বাসাংসি জীর্ণানি
ক্রমশ দুর্বল করে আসন্ন জরার কানাকানি,
সে দেখে সময় যায়, এ জীবন আয়ুর কিনারে॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কৃষাণী আপন মনে

হেরো তারে, একা বিরাজে শস্যখেতে,
ঐ যে নিরালা শৈলশিখরিণীরে
শস্য সাজায় গান করে নিজ মনে ;
দাঁড়াও, অথবা পার হয়ে যাও ধীরে।
একা-একা কাটে শস্য, গুচ্ছ বাঁধে,
বিষাদ বিধুর পুরবীর স্বর সাধে ;
ঐ শোনো ! ঘন গভীর উপত্যকা
অভিভূত করে গলার স্বরমালিকা।

যারা পার হয়ে আরব মরুর ধূলি
এমন স্বাগত রাগ কোনো বুলবুলি
শোনায়নি সেই শ্রান্ত পথিক দলে
স্নিগ্ধ শীতল ছায়াময় তরুতলে।
বসন্ত দিনে যে-কোকিল গান করে
দ্বীপময় দেশে সিন্ধুর অন্তরে
প্রশান্তি ভেঙে, তারো কণ্ঠস্বরে
নেই বুঝি এতো তীব্র রোমাঞ্চ রে !

কী গান করছে কে আমায় বলে দেবে ?
হয়তো সুদূর বেদনার পদাবলী,
হারজিতে সবে মেদিনী উঠত কেঁপে
তারি বিবরণে ভরেছে গানের ডালি ?
নাকি নিতান্ত পরিচিত সাদাসিধে
চল্‌তি ঘটনা আশ্রয় দিল গীতে !
যে-দুঃখ শোক ছিল, আর বহমান
ভবিষ্যতের, তাকে নিয়ে এই গান ?

গানের বিষয় যা-ই হোক, তন্বীর
গাওয়া সেই গানে অশেষ ব্যঞ্জনা সে ;

তাকে তো দেখেছি কাস্তের পরে নত
গান করে যায় কাজের অনবকাশে ;
শুনেছি সে গান, স্তব্ধ নির্নিমেষে ;
চড়াই ভেঙেছি, তবু সে গানের রেশ
আমার হৃদয়ে থামে না যে থামে না যে
বাজে অফুরান সে-গানের রেশ বাজে ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

লুসি

[অংশাবলী]

বাসনা-পীড়নে আমি মূর্ছা গেছি কখনো-কখনো,
স্পর্ধা করে বলি সেই কথা।
তোমরা প্রেমিক যারা কানে-কানে শোনো
ঘটেছিল যাহা যথাযথ।

*

দেখাত সে প্রতিদিন টাট্‌কা-ফোটা গ্রীষ্মের গোলাপ
তার মানে আমার প্রেয়সী :
তাহার কুটির-পথে চলেছি, অপাপ
আকাশেতে শোভে সন্ধ্যাশশী।

* * *

চলেছে আমার ঘোড়া, টগ্‌বগিয়ে ক্ষুরে তুলে ধ্বনি,
সেথা আশু হব উপনীত :
হঠাৎ কুটির-পারে দেখা দিল শনি
অন্ধকারে চাঁদ অস্তমিত।

প্রেমিক খেয়ালী প্রাণী—তোমরা নিশ্চয় জানো তাহা—
কী-যে ঘটে তাহার অন্তরে !
'দয়া করো, দয়া করো', কেঁদে উঠি, 'আহা
লুসিকে নিও না তুমি কেড়ে'।

* * *

তাহার বাসা ছিল বিজন বনপথে,
ঝর্না বয়ে যেত পাশে।
তাহার স্তবগান করিবে কে বা কোথা,
কেই বা তারে ভালোবাসে।

সে যেন বনফুল পাথরে পথহারা,
মলিন শ্যাওলা ঢাকা সে ;
যেন সে সুন্দরী, যেন সে শুকতারা
একটিমাত্র, আকাশে।

কবে সে ছিল বেঁচে কেউই জানত না
কখন গেল সে ফুরায়ে :
এখন লুসি মৃত, কোথায় সান্ত্বনা,
বিরহ-ব্যবধি দাঁড়ায়ে।

* * *

আজ লুসি বহুদূর, রেখে গেছে সব দৃশ্যাবলী—
এই মাঠ, বনস্থলী,
এই শান্ত বিজন প্রকৃতি,
আর কিছু স্মৃতি—
ঘটনার, নেই : আসবে না ফিরে

তন্দ্রায় আচ্ছন্ন চিত্তে। চৈতন্যের নেই কোনো ভয়,
মনে হয় তারে নিত্য, অনুভবহীন,
স্পর্শের বাহিরে যেন, মুছে গেছে সময়ের ক্ষয়।
আজ তার গতি নেই, শক্তিও বিলীন,

শ্রুতিহীন, দেখে না, সে দৃশ্য আজ দৃশ্যের ভিতরে :
বস্তুপুঞ্জে মিশে গেছে, বৃক্ষে আর পাহাড়ে পাথরে,
আহ্নিক আবর্তে ঘোরে
ঘরহারা পৃথিবীর পথে।

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বুড়ো নাবিকের উপকথা

১

আদ্যিকালের সে-এক নাবিক বুড়ো,
যাকে বাধা দিল আর-সকলকে ছেড়ে
সে বলে, 'তোমার জ্বল্‌জ্বল্‌ চোখ লম্বা শাদা দাড়ির
দোহাই, খামোকা বাধা দিলে কেন ওরে!
বরের ঘরের দরজা ওদিকে খোলা,
তার ওপরে আমি ঘনিষ্ঠ পরিজন,
এসেছেন মানী অতিথিরা আর ভোজসভা গুলজার
শুনছ না তারি উল্লাস আলোড়ন?'

তবু লোকটিকে ধরে আছে তার লোলচর্মের হাতে,
গল্প ফেঁদেছে, 'জাহাজের কথা শোনো'।
'ছাড়ো, হাত ছাড়ো, ছাইরঙা দাড়ি, শয়তান,'
বলতেই হাত ছেড়ে দিল তক্ষুনি।

তবু ধরে থাকে জ্বল্‌জ্বলে চোখ দিয়ে,
বরযাত্রীও থম্‌কায় নিঃস্পন্দ,
তিন বছরের শিশুর মতন শোনে,
নাবিকেরই জেদ থাকে শেষ পর্যন্ত।

বরযাত্রীটি পাথরের মতো ব'সে,
না শুনে উপায় নেই বলে অগত্যা,
আর বলে চলে প্রাচীন কালের সে
তীব্রচক্ষু নাবিক আপন কথা।

'সেদিন জাহাজে খুশির লহর, ফাঁকা হলো বন্দর,
হৃষ্টচিত্তে চলে যাই উৎরিয়ে

গির্জের তলা পাহাড়তলিটা
বাতিঘরতলা দিয়ে।

সূর্য উদিল বামদিক আলো করে,
সাগর হতে কি এলো দিঙ্‌মণ্ডলে!
কিরণ দিল সে উজ্জ্বল, কিরণ দিল দক্ষিণাচলে,
সমুদ্রে গেল চলে।

দিনে দিনে যেত উঁচুতে উঁচুতে উঠে,
যতক্ষণ না মাস্তুল যেত ডিঙিয়ে মধ্যদিনে'—
এটুকু শুনেই শ্রোতা তার বুক চাপড়ায় আপসোসে,
শুনতে পায় সে শানাই বাজছে উঁচু তারসপ্তকে।

নববধূ ঐ পা রেখেছে মণ্ডপে
রাঙা গোলাপের মতো,
অভিবাদনের ভঙ্গিতে তার সম্মুখে নতশিরে
গায়কবৃন্দ চলছে আনন্দিত।

বরযাত্রীটি রাগে ক্ষোভে শুধু বুক চাপড়িয়ে মরে,
না শুনে উপায় নেই বলে সব শোনে
প্রাচীন কালের নাবিকের কাছে কথা,
বলছে নাবিক উজ্জ্বল দু' নয়নে

'হঠাৎ উঠল প্রবল ঝটিকা সে যে
বড়ো নিদারুণ পরাক্রান্ত, হানে
দিকজোড়া তার ডানায় সে আমাদের
আর পিছে-পিছে ধায় দক্ষিণপানে।

নত মাস্তুলে গলুই ডুবিয়ে জলে,
যেন মার-মার শব্দে, প্রহার-ভয়ে

নির্জিত কেউ শত্রুর ছায়া মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলে,
সন্নত মস্তক,
তেম্‌নি জাহাজ খরবেগে যায়, ঝড় পশ্চাতে জোরে গর্জায়
আমরা চলেছি সম্মুখে পলাতক।

আর এইবারে ঘনাল কুহেলি, তুষারসম্প্রপাত,
হিমানীর নিভাননী,
মাস্তুল-উঁচু পুঞ্জ বরফ ধেয়ে এলো ভেসে, আর তার সব
সবুজ-সবুজ, বুঝি মরকত-মণি।
আর সেই মতো ঝঞ্ঝা-তাড়িত তুষার সঞ্চারিত
আভাহীন আভা পাংশু, বিধুর, ফিকে—
না কোনো মানুষ দেখি, পরন্তু, পরিচিত কোনো একটা জন্তু
দেখতে পাই না, বরফ চতুর্দিকে।

বরফ ছড়ানো এখানে বরফ যেখানে-সেখানে,
বরফ ঘিরেছে সব তো,
ফেড়ে যায় স্বর রাগে গর্‌গর্‌ চেঁচায় কী-জোর গর্জায় জোর,
মূর্চ্ছা যাবার শব্দ!

দেখি উড়ে এলো অবশেষে এক সিন্ধুসারস অ্যালবেট্রস
অথৈ কুয়াশা ঠেলে অভ্যন্তরে,
কোনো সজ্জন অতিথি এসেছে যেন,
বিধাতার নামে নিলাম বরণ করে।

যে-ভোজ্য পেল কখনো পায়নি আগে,
ঘুরে-ঘুরে কত নানান্‌ রঙ্গ তার,
ফাটল বরফ বজ্রের মতো রাগে,
আমাদের নিয়ে চলেছে কর্ণধার।

হঠাৎ কখন দক্ষিণ হাওয়া পিছনে করল ধাওয়া,
অ্যালবেট্রস সঙ্গে চলেছে মেতে,

খেলার গরজে   খাবারের খোঁজে
রোজ সে আসত মাল্লার সঙ্কেতে!

কুয়াশা কিংবা মেঘলা দুপুরে   পালের কাছিতে মাস্তুলচূড়ে
ক্রমাগত বসে রয়েছে নয়টি সাঁঝে,
ওদিকে তখন চারিভিতে রাত   ধোঁয়া-ঢাকা শাদা কুয়াশা অগাধ,
ঝলে চন্দ্রের কৌমুদী তারি মাঝে।

'বৃদ্ধ নাবিক, বাঁচান্ প্রভু তোমাকে
পিশাচের হাত থেকে এ দুর্বিপাকে,
একি তুমি কেন অমন তাকাও?'
'আমার তীরধনুকে
বিঁধে বস্‌লাম অ্যালবেট্রসটাকে।'

২

সূর্য এবার দেখা দিল দক্ষিণে,
সমুদ্র হতে আকাশে অভ্যুদয়,
কুয়াশাআবৃত   বামে অপনীত,
সাগরে আবার লয়।

পিছে সুমন্দ দখিনা তখনো করছে আন্দোলন,
মধুর বিহগ নেই শুধু কোনোখানে,
খাদ্যের লোভে অথবা খেলাচ্ছলে
আর আসে না তো নাবিকের আহ্বানে!

পিশাচের মতো আচমকা আমি কী যে করে বসলাম,
সবার পক্ষে সে বড়ো ভীষণ ওরে,
সমর্থনের সমবেত স্বরে   পাখিটাকে আমি বিঁধলাম শরে
যে ছিল বলেই হাওয়া বয়েছিল জোরে,
হা মন্দমতি! বলল সকলে   পাখিটা মারলি, যার কৌশলে
বাতাস তখন বয়েছিল এতো জোরে!

না অতিমৃদু না টকটকে লাল   বিধাতার মাথে যথা জ্যোতি-জাল,
অরুণ উদিল অবিকল সেই মতো,
পাখিটা যেহেতু মেরেছি, সকলে   সোৎসাহে সায় দিল এই বলে
সেই এনেছিল ধোঁয়া ও কুয়াশা যত,
সবাই বললে ভালোই হয়েছে   অলক্ষুণে সে-পাখিটা যে গেছে,
সেই এনেছিল কুয়াশা ও ধোঁয়া যত।

সুবাতাস দিল ঝলকে ঝলকে   ওড়ে শাদা ফেনা ঢেউয়ের পালকে
হলবিদারণে জল কাটে জল সরে,
বুঝি আমরাই সকলের আগে   ভেঙেছি জলের সে-নীরবতাকে
অপার মহাসাগরে।

থমকিয়ে গেল বাতাস হঠাৎ নেমে গেলো পাল থেমে গেল পাল
নিদারুণ কোনো বিষাদে আচম্বিতে,
আমরা তবুও কথা বললাম   সে-অপরিমাণ
মহাসাগরের নীরবতা ভেঙে দিতে।

তামাটে আকাশে গুমট ভয়ংকর
রক্তচক্ষু সূর্য মধ্যদিনে,
চাঁদের মতন তার বেশি বড়ো নয়,
ঊর্ধ্বোন্মুখ মাস্তুল দক্ষিণে।

দিন চলে যায় চলে যায় দিন
নিশ্বাস বুজে নিশ্চল আছি পড়ে,
যেন পটে আঁকা স্তব্ধ জাহাজ
আঁকা সমুদ্র 'পরে।

জল শুধু জল যেদিকে তাকাও জল
পাটাতন কেঁপে জড়োসড়ো হয়ে ওঠে,
জল ধূ-ধূ জল যেদিকে তাকাও জল,
যদি একফোঁটা তৃষ্ণার জল জোটে!

হায় যীশু! যেন নাড়িটাও গেছে পচে,
কে জানত আছে এতো-ও কপালে, হায়,
দেখি, পিচ্ছিল জলজন্তুরা সব
ভাসে পিচ্ছিল সমুদ্রে পায়ে-পায়ে।

অমনি তখন চতুষ্পার্শ্বে চড়ক নাচের কী চিৎকার সে!
মৃত্যু-অগ্নি নেচে ওঠে নিশাকালে,
জল নাচে যেন ডাইনির জাদু-পিদ্দিমে ঘৃতাহুতি,
কখনো সবুজ, নীল, শাদা রং জ্বলে।

কেউ-কেউ ঠিক বুঝতে পারল দুঃস্বপ্নের ঘোরে
কে সেই যক্ষ ক্রমাগত এঁকে বেঁকে
নয় বাঁও নিচে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের পিছে ধায়
কুজ্ঝটি আর তুষারের দেশ থেকে।

সকলের জিভ খরতেষ্টায় কাঠ,
শুকিয়ে গিয়েছে নাড়িটাও পর্যন্ত,
আমাদের মুখে কোনো কথা নেই, যেন
কালিঝুলি এসে রুদ্ধ করেছে কণ্ঠ।

হা অদৃষ্ট! এই কি সুদিন! সমবেত ধিক্কারে
ছেলেরা বুড়োরা দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।
ক্রুশের বদলে ওরা প্রত্যেকে অ্যালবেট্রস—মৃত পাখিটাকে
আমার গলায় জড়িয়ে ঝুলিয়ে দিল।

৩

কেটে গেল এক শ্রান্ত সময়। সবার গলা
তেতে পুড়ে কাঠ, চোখগুলো জ্বলজ্বলে
শ্রান্ত সময় ক্লান্ত সময়
শ্রান্ত শ্রান্ত সকলের চোখ জ্বলে

এমন সময় পশ্চিমে দেখি
ঝাপ্‌সা কী যেন কাঁপছে আকাশতলে।

আগে মনে হলো এতোটুকু সেই দাগ
কুহেলিকা তারপরে,
ঘুরে-ঘুরে আর ভেসে-ভেসে নিল শেষে
স্পষ্ট আকার যখন এলো গোচরে।
একটু আভাস, কুয়াশা, আকার ঘনাল শেষে,
কাছে আরো কাছে ক্রমেই নিকটতর,
জলদেবতাকে যেন-বা এড়াতে চেয়ে
ডুবছে ফিরছে ঘূর্ণি খাচ্ছে বড়ো।

শুষ্ক কণ্ঠ রসহীনতায়   কালো কালো ঠোঁট তেতে জ্বলে যায়
হাসতে পারিনে অশ্রুও নেই আজ ;
আমরা সবাই তৃষ্ণায় মূক দাঁড়িয়ে নির্বিকার,
হাত কামড়িয়ে নিজের রক্ত চুষে আমি চিৎকার
করে উঠলাম, জাহাজ, ঐ জাহাজ!

তারাও সবাই শুকনো গলায়   তেতে-ওঠা কালো ঠোঁটের জ্বালায়
হাঁ করে শুনলে আমার দুরাহ্বান :
জয়, দয়াময়! দন্তিল হেসে
একযোগে দম টেনে নিল শেষে
যেন সমবেত করছে উদকপান।

আরে, দেখো, আমি বলে উঠি সুস্থির
রয়েছে, বুঝি-বা আমাদের কোনো শুভ
করবে বলে ও ঢেউ কি বাতাস ছাড়া
স্বতশ্চালিত অগ্রগমনে ধ্রুব।

ঝলে পশ্চিম সাগরে আগুন ঝলে।
সূচিত দিনাবসান,
আর প্রতীচীর চলোর্মিচূড়ে যেন
আসীন ব্যাপ্ত দীপ্ত বিবস্বান;
হঠাৎ দাঁড়াল বিচিত্রাকার জাহাজটি, তার
এদিকে আমরা, ওদিকে বিবস্বান।

সোজা এসে সেই সূর্য পড়েছে, গায়ে ছিটছিটে দাগ
(দেবমাতা বুঝি করুণা পাঠাল আমাদের অভিমুখে)
যেন সে-সূর্য বেরিয়ে এসেছে কারাগবাক্ষ থেকে
দিগন্ত ব্যেপে উজ্জ্বলন্ত মুখে।

হায়! (ভাবি আমি দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দনে)
কী যে সত্বর সে আরো এগিয়ে আসে!
ঐ বুঝি তার যতগুলি পাল সূর্যে বিচ্ছুরিত,
মাকড়সা-জাল পাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে?

তবে ওরি ঐ পঞ্জরগুলি ভেদ করে সূর্য কি
চলে এসেছিল, ঝাঁঝরি-খোলার মতো?
ঐ নারীটিই যতেক যাত্রী? সঙ্গে কি মৃত্যুই
চলেছে! তাহলে আরোহী সংখ্যা দুই?
মৃত্যু কি ঐ নারীর প্রেমাস্পদ?

নারীটির ঠোঁট নীরক্ত, তার দৃষ্টি বাঁধনহারা,
চুলের গুচ্ছ হলুদ সোনার মতো;
শাদা তার ত্বক যেমতি কুষ্ঠপারা
মৃত্যু-কবলে-প্রাণ, তার নাম, তার ভয়ে সবে সারা,
রক্ত সবার করে হিমসংহত।

আঢাকা তরীটি এলো আরো পাশ ঘেঁসে,
চালাচালি করে দুজনে পাশার গুটি,

‘বাজি মাৎ, আমি জিতে গেছি জিতে গেছি’
বলে বার তিন শিস্ দিল রমণীটি।

সূর্য এবার মিলায়-মিলায় ; তারা ফোটে ঝেঁকে-ঝেঁকে
এক পা চলেই আঁধার করল নভ,
দূরে দূরে শুনি ফিস্‌ফাস্, আসে সিন্ধুপ্রান্ত থেকে,
কোন্ দূরান্তে ছুটল প্রেত-প্লব !

শব্দটা শুনে ফিরে তাকালাম আমরা দিগ্বিদিকে !
আতঙ্ক যেন জীবনপাত্র থেকে
রক্ত আমার পান করে থেকে থেকে !
মিটমিটে তারা, গভীর-গভীর রাত,
বাতি থেকে কাণ্ডারীর আননে শুভ্র রশ্মিপাত।

পাল থেকে ঝরে শিশির শিশির ঝরে—
যতক্ষণ না পেরিয়ে পুব-পাহারা
শশশৃঙ্গে উঠে এলো চাঁদ, একটি দীপ্ত তারা
নিম্নে সহানুসরে।

দিন চলে যায়, চাঁদে লেগে আছে তারা,
দীর্ঘশ্বাস গোঙানি তখনো বাকি,
সবাই শঙ্কাপাণ্ডুর মুখে তাকাল আমার দিকে
দৃষ্টিতে অভিসম্পাত ছিল নাকি !

পঞ্চাশ থেকে চারগুণ তারা বেঁচে
(গোঙানি কিংবা দীর্ঘশ্বাস নেই)
পতন শব্দ, শরীর স্তব্ধ,
একে-একে তারা পড়ে গেল সকলেই।

আত্মারা উড়ে চলে গিয়েছিল তাদের শরীর থেকে,
মহাআনন্দ অথবা শোকের দিকে !

প্রতিটি আত্মা, পাশ ঘেঁসে গেল বেগে
যেন শাঁই-শাঁই আমার তীর-ধনুকে !

৪

'তোমাকে ডরাই, প্রবীণ কর্ণধার,
ডরাই ও-হাত অস্থিচর্মসার !
লম্বাটে রোগা এবং বাদামি তুমি
লোনা বালু ঝুর্‌ঝুর্ হাড়পাঁজরার।

ডরাই তোমাকে, তোমার তীব্র চোখ,
বাদামি ও-হাত, অস্থিচর্মসার'—
ভয় নেই, বরযাত্রী, তোমার আশঙ্কা নেই কোনো,
নিঃসাড়ে পড়ে যায়নি দেহ আমার।

নিঃসীম একা, অকূল-অকূল একা,
একা নিঃসীম সমুদ্র পারাবারে !
কোনো সন্ন্যাসী একটু আলোক-রেখা
আনেনি আমার আত্মার অন্ধারে।

আহা, সুন্দর সেই যে মানুষগুলি
চোখের সামনে মরে তারা পড়ে আছে !
অথচ হাজার কর্দমপিচ্ছিল
জলচর তারা আমার সঙ্গে বাঁচে।

তাকালাম আমি ক্লিন্ন সাগরপানে,
পরক্ষণেই ফিরিয়ে নিলাম চোখ,
আর ঘিন্‌ঘিনে ডেকের উপরে দেখি
শুয়ে আছে সেই মৃত সমস্ত লোক।

আকাশে তাকিয়ে প্রাণপণে প্রার্থনার চেষ্টা করি,
কিন্তু এলো না একটুও প্রার্থনা,

বদলে কিসের দুর্মন্ত্রণা এলো আর ছেয়ে দিল
হৃদয়ে আমার শুষ্ক বালুর কণা।

চোখ বুজে আমি আব্‌জিয়ে রাখি চোখের পাতা,
চক্ষু তারকা হৃদযন্ত্রের মতন নাচে,
অম্বর আর অম্বুধি আর অম্বুধি অম্বর
বোঝার মতন ক্লান্ত চোখের 'পর,
এবং মৃতেরা শায়িত পায়ের কাছে।

হিম কালঘাম নামছে তাদের অঙ্গ বেয়ে,
দূষিত হয়নি, বিষিয়ে ওঠেনি ভাপে,
আমার উপরে তাকিয়েছিল যে-দৃষ্টি নিয়ে
পরেও চেয়েছে অবিকল একভাবে।

কোনো অনাথের অভিসম্পাত উর্ধ্বনিলয় হতে
সত্তাকে পারে নামাতে নিরয়লোকে,
কিন্তু না, তার চেয়েও দুর্বিষহ
অভিসম্পাত মৃত মানুষের চোখে!
দেখেছি সে-শাপ সাতদিন সাতরাত্রি এক নাগাড়ে,
মরতে পারিনি তবু সেই দুর্যোগে।

চলন্ত চাঁদ ওঠে দিগন্তচূড়ে,
একটুও থেমে রইল না কোনোখানে,
মৃদুভঙ্গিতে ক্রমশ উর্ধ্বে ওঠে,
একটি কি দুটি তারার সন্নিধানে—

চাঁদিনী গুমট মহাসাগরকে ব্যঙ্গ করে,
যেন এপ্রিলে শুভ্র কুজ্ঝটিকা
শুধু জাহাজের অতিকায় ছায়াতলে
স্থির নির্মম রক্তবর্ণ শিখা।

আর জাহাজের ছায়ার অন্যপারে
চেয়ে-চেয়ে দেখি জলভুজঙ্গ যত,
ঝক্‌ঝকে শাদা জলপথে নড়ে চড়ে,
যখন এগোয়, ভৌতিক আলো ঝরে,
হিমানী আঙার ঝরে অগ্নিচ্যুত।

আরো দেখি সেই জাহাজের ছায়াতলে
সাপগুলো ঝলে ঝল্‌মলে সজ্জায়,
চিকণ সবুজ, নীল, কালো মখমলে
দেয় কুণ্ডলী পাকিয়ে সাঁতার, প্রতিটি বাঁকেই জ্বলে
সোনালি আগুন, বিদ্যুৎ ঝল্‌কায়।

আঃ, বেঁচে আছে সুখে আছে প্রাণীগুলি,
কে ওদের শোভা প্রকাশ করতে পারে ?
স্নেহনির্ঝর নামল আমার হৃদয় হতে
আপন-হারানো আশীর্বাদের ধারে :
বুঝি সন্ন্যাসী সদয় আমার 'পরে,
ঝরল আমার স্নেহাশিস্‌ শতধারে।

অমনি হৃদয়ে সামর্থ্য এলো প্রার্থনার,
গলা থেকে সেই মুহূর্তে গেল পড়ে
অ্যালবেট্রস, পড়ে গিয়ে ডুবে গেল
সীসার ফলার মতন মহাসাগরে।

৫

সুষুপ্তি, আহা, সে বড়োই রমণীয়,
সুমেরু কুমেরু তাকে সমাদর করে,
মেরী মাতাকেই জানানো উচিত কৃতজ্ঞতা !
স্বর্লোক থেকে পাঠালেন তিনি সুপ্তিসুধা
আমার ক্ষুভিত আত্মার অন্তরে।

ডেকের উপর আকাট বালতিগুলো,
পড়েছিল শুধু শূন্য এতোক্ষণ,
স্বপ্ন দেখি যে শিশিরে শিশিরে সেগুলি গিয়েছে ভরে ;
জেগে উঠে দেখি, শুরু হলো বর্ষণ।

ওষ্ঠ অধর সিক্ত এবার, কণ্ঠ শীতল হলো,
পোশাকগুলিও ভিজে গিয়ে স্যাঁৎসেঁতে,
নিশ্চয় আমি স্বপ্নের ঘোরে পিপাসা মিটিয়ে গেছি,
দেহটাও বুঝি সেই সুখে ছিল মেতে।

নড়ে চড়ে বসি, বুঝতে পারিনে প্রত্যঙ্গের ভার :
অথচ আসে না এগিয়ে সন্নিকটে
শুধু শব্দেই কাঁপন লাগাল পালে,
পালগুলি ছিল পাৎলা শুক্‌নো বটে।

উর্ধ্বে হাওয়ায় শিহরে নবীন প্রাণ,
শতেক পাবক-পতাকা সমুজ্জ্বল,
এদিকে-ওদিকে ব্যস্ত ইতস্তত !
যেদিকে-সেদিকে, সন্নত-উন্মত,
মাঝে নেচে চলে ম্লায়মান তারাদল।

ধেয়ে-আসা ঝড় গর্জায় আরো জোরে,
জলজ ঘাসের মতো,
একখানি কালো মেঘ চলে যায় অঝোরে বৃষ্টি ঝরে
কিনারে অথচ চাঁদ অপ্রতিহত।

ঘন কালো মেঘ কেটে গেল তবু দেখি
চাঁদ জেগে এক পাশে,
এলো উঁচু কোনো পাথর থেকে কি জলের তোড়,
বিদ্যুৎ তবু দেয় না কোনোই জোর কামড়,
খাড়া নদী, ব্যাপ্ত সে।

জাহাজ অবধি পৌঁছল না সে প্রভঞ্জন
তবুও জাহাজ চলে!
বিদ্যুৎ আর চাঁদের নিয়ে জেগে
মৃত মানুষেরা গোঙাচ্ছে দলে-দলে।

ওরা কাৎরায়, কেঁপে-কেঁপে ওঠে, সবাই দাঁড়িয়ে ওঠে,
শব্দ করে না, একটু সরে না চোখ,
বড়ো বিচিত্র, মৃতদের উত্থান
বুঝি স্বপ্নেও দেখবে না দর্শক!

কর্ণধারের প্রবর্তনায় জাহাজ চলে
অথচ বাতাস বয় না ঊর্ধ্বপানে;
সকল নাবিক গুণ টানা শুরু করে;
অভ্যাস ছিল আগে যার, যে যেখানে;
তারা নির্জীব যন্ত্রের মতো অঙ্গ চালনা করে—
বাহিনী আমরা ভয়াবহ অভিযানে।

ভ্রাতুষ্পুত্র সে-ও তার দেহ নিয়ে
হাঁটুতে ঠেকিয়ে হাঁটু সে দাঁড়াল ঘন,
মৃতদেহ আর আমি একই রজ্জুতে
কাজ করি, তবু সে বলে না কথা কোনো।

'ডরাই তোমাকে, প্রাচীন কর্ণধার!'
হে শুভ অতিথি, হও তুমি প্রশমিত,
ঘটায়নি এতো নাবিকের দল যাদের শবশরীরে
আর্ত নিখোঁজ আত্মা আবার আরবার এলো ফিরে,
এ যে দেবদূত শ্রেণীর সংঘটিত।

বোঝা গেল সেটা সকালে সবাই ছেড়ে দিল যেই হাত
আর জড়ো হলো মাস্তুল ঘিরে-ঘিরে,

ধীরে-ধীরে বয় মধুর ধ্বনির লহরী তাদের মুখে,
আর তাদের শরীরে।

ঘিরে-ঘিরে ঘোরে, ওড়ে সেই সব কলধ্বনি,
তারপর তারা ধায় সূর্যের দিকে
শেষে ধীরলয়ে ফিরে আসে আরবার,
কভু একাকার, কখনো-বা একে-একে।

কখনো শ্রবণে অঝোরে আকাশ থেকে
নভোবিহঙ্গ সঙ্গীত ঝরে পড়ে,
কখনো-বা শুধু ছোটো পাখি যত যেখানে আছে,
মনে হতো যেন ভরেছে সাগর বাতাসটা যে
তাদের অপভ্রংশের সুস্বরে।

কখনো যতেক বাদ্যবৃন্দ যেন-বা সম্মিলিত
কখনো-বা যেন নিরালা বাঁশরী বাজে,
কখনো সে এক দেবদূত গান গেয়ে
স্বর্গেরে করে বিমোহিত কারুকাজে।

অবশেষে থামে ; তবু পালে-পালে শুনি
দুপুরেও তারি নিঃস্বন লেগে থাকে,
যেমন গোপন ঝর্নার কল্‌কল্‌
জুনমাসে যবে পাতা ছায় শাখে-শাখে,
আর সে-ঝর্না ঘুমন্ত বনে-বনে
সারারাত সুর শোনায় কানাড়া-রাগে। .

দুপুর অবধি সহজেই বেয়ে চলি,
অথচ বাতাসে নীরন্ধ্র শ্বাস যতি,
ধীর সুস্থির মসৃণ সে-জাহাজ
ক্রমে নিচু থেকে সরছে উর্ধ্বগতি।

তলকাঠ থেকে সে যে নয় বাঁও নিচে,
কুয়াশা আর তুষার যেদেশে জেগে
দৈবশক্তি এলো আর সেই বুঝি
ঐ জাহাজকে জাগাল চলার বেগে।

কিন্তু দুপুরে পালে আর নেই সুর,
জাহাজও হঠাৎ থম্‌কাল সেই থেকে।

মাস্তুলটার সঠিক উপরে সূর্য
থামিয়ে দিয়েছে সমুদ্রে যেন তারে :
মুহূর্তেকেই চলা শুরু করে ফের
তবু মাপা গতি অস্বস্তির ভারে—
সামনে পিছনে সমান চলন তার
দ্বিধাগ্রস্ত সংযত বিস্তারে।

পরক্ষণেই উদ্যত খ্যাপা ঘোড়ার মতো
মেতে ওঠে যেন হঠাৎ চলার ঘোরে,
রক্ত আমার মাথায় উঠল, আমি
সংজ্ঞা হারিয়ে তখুনি গেলাম পড়ে।

কতক্ষণ যে ছিলাম সংজ্ঞাহারা
বলতে পারব না সে,
কিন্তু আমার চেতনায় সাড় ফেরার আগে
সত্তা আমার চিনতে পারল হাওয়ার বাঁকে
দুটি কণ্ঠের সংলাপ ভেসে আসে।

কে যেন শুধায়, এই বুঝি সেই? মৃত্যু ঘটিয়েছিল
ক্রুশবিদ্ধের দোহাই, বলো তো, এই সেই লোক নাকি?
এরি নিষ্ঠুর ধনুকের ঘায়ে পড়েছিল অসহায়
সেই নির্দোষ অ্যালবেট্রস পাখি!

নিরাকার সেই শক্তি স্বয়ংভর
রহেন তুষার কুজ্ঝটিকার দেশে,
ভালোবাসতেন পাখিটাকে, সেই পাখিটা বাসত যাকে
সেই কিনা ওকে বিদ্ধ করলে শেষে!

অন্য গলায় অধিক স্নিগ্ধ স্বর
ফোঁটা-ফোঁটা মধু কণ্ঠস্বরে তাঁর,
বললেন তিনি, 'এই মানুষটি প্রায়শ্চিত্ত ঢের
করেছে এবং কিছু বাকি আছে আর।'

৬

প্রথম স্বর

কিন্তু আমায় বোঝাও স্পষ্ট করে,
তোমার কোমল সমর্থনের মানে,
কিসে জাহাজটা ধায় অত সত্বর ?
সারাটা সাগর আছে কোন্ সন্ধানে ?

দ্বিতীয় স্বর

যেন ক্রীতদাস আনত প্রভুর কাছে,
সমুদ্রে নেই তিলেক প্রভঞ্জন ;
দীপ্ত এবং বিশাল নেত্রপাতে
নীরবে চাঁদকে করছে নিরীক্ষণ—

কোন্ পথে যাবে পায় যদি নির্দেশ ;
চন্দ্রমা তাকে চালায় সোজা কি বাঁকা।
দেখো, ভাই, দেখো!   চন্দ্রমা তাকিয়েছে·
সাগরের পানে, চাহনিতে স্নেহ মাখা।

প্রথম স্বর

কিন্তু জাহাজ কী করে অগ্রসর
ঢেউ কি বাতাস ছাড়া ?

সাম্‌নের দিকে বাতাস বন্ধ, সে-ই
পিছে এসে বয় জাহাজে জাগায় সাড়া।

এসো উড্ডীন হওয়া যাক ভাই, সমূর্ধ্বে চলো যাই,
নয়তো আবার ফিরে যেতে দেরি হবে,
কারণ জাহাজ মন্থর বেগে চলবে এখন থেকে,
এই নাবিকের ঘোর কেটে যাবে যবে।'

জেগে উঠলাম, আমরা বেয়ে চলেছি :
যেন অনুকূল পরিবেশে তরী ছোটে,
তখন নিশীথ, উদ্বেগহীন   উর্ধ্বগগনে চন্দ্র আসীন
মৃত মানুষেরা সবাই দাঁড়িয়ে ওঠে।

ডেকের উপর সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে,
শবভবনেই এ বুঝি মানাত ভালো :
পাথরের চোখে সকলে আমার দিকে
তাকাল, চাঁদের সে-চাউনি ঠিকরাল।

যেহেতু ওদের মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা, অভিশাপ
এপর্যন্ত নয় অন্তর্হিত,
ফেরাতে পারিনি দৃষ্টি তাদের থেকে,
আর প্রার্থনা করাতেও পারিনি তো।

এবং এবার অপগত সেই সম্মোহ : আরবার
দেখতে পেলাম সবুজ শ্যাম সাগর,
তাকালাম দূরে, যা ইতিপূর্বে দেখা
পেলাম না তার সামান্য স্বাক্ষর।

এ যেন-বা জনমানবশূন্য পথে
থম্‌থমে ভয়-বুকে পার হতে হতে
শেষে কোনো মতে পার হয়ে চলে যায়
এবং পথিক ফিরে তাকায় না মোটে,
কারণ সে জানে ভীষণ পিশাচ কোনো
পিছনে-পিছনে আছে তার ওৎ পেতে।

নিশ্বাস পড়ে হঠাৎ সর্বদেহে,
না কোনো শব্দ না কোনো চলার বেগে,
সাগরের বুকে পথরেখা তবু তার
ছায়ার ভাঁজে কি কাঁপনে যায়নি রেখে।

চুল ধরে দিল ঝাঁকিয়ে আমার কপোলে বীজন করে,
যেন বসন্তে মেঠো বাতাসের মতো,
ভয় ধরাল সে কীরকম-কীরকম,
তবু অনুভবে আনল সুস্বাগত।

এবার জাহাজ উড়ে-উড়ে চলে তূর্ণগতি,
তবু তার চলা সুন্দর কমনীয় :
মন্দমধুর সমীরণ বহে যায়—
আমাকে ঘিরেই একান্ত সক্রিয়।

ওকি ! ঐ নাকি সাধের স্বপ্ন, তাহলে কি সত্যই
বাতিঘর-চূড়া চক্ষে উঠছে ভেসে,
ঐ বুঝি সেই পাহাড়টা ? আর ঐ বুঝি গির্জেটা ?
এসে গেছি নাকি আমার আপন দেশে !

বন্দর-সীমা সকলে হয়েছি পার,
প্রার্থনা করি আমি অশ্রুপ্লুত,

হে করুণাময়, আমাকে জাগতে দাও
নাহয় তো করো চিরনিদ্রাভিভূত।

বন্দর-উপসাগর জ্বলছে পরিচ্ছন্ন কাঁচ,
আর দিকে-দিকে ব্যাপ্ত মেদুর মায়া,
উপসাগরের অঙ্গে-অঙ্গে চন্দ্ররশ্মিপাত,
এবং বিতত চাঁদের প্রতিচ্ছায়া।

পাষাণখণ্ড ঠিকরিয়ে পড়ে, শিলায় স্থাপিত
গির্জাও সেই আলোয় আলোকময়,
চন্দ্রকিরণে অভিসিঞ্চিত
দিঙ্‌নির্দেশী মোরগটি তন্ময়।

নম্র আলোয় সে-উপসাগরে শুভ্র কান্তি ঝরে,
আর তারি থেকে ঊর্ধ্বে সমুত্থিত
অগণন ছায়া ক্রমশ আকার লভে,
রক্তিম বর্ণাভায় উৎসারিত।

সেই রক্তিম ছায়াগুলি সামনের
গলুইটা থেকে কাছেই বিরাজমান,
ডেকের উপরে চোখ নিবদ্ধ করে
হা খ্রীস্ট, তুমি জানো, কী দেখেছিলাম!

দেখি প্রাণহীন মৃতদেহগুলি সটান রয়েছে শুয়ে
স্বয়ং যীশুখ্রীস্টের ক্রুশকাঠে
এবং কে এক দিব্যপুরুষ আলোয় আলোকময়
আরূঢ় প্রতিটি মৃতদেহে পদপাতে।

সারি-সারি সেই দৈবত-দল সকলে দোলায় প্রীত করতল
স্বর্গীয় আভা সে-দৃশ্যে ঠিকরাল,
স্থলের ইশারা বহে দেবদূতদল
প্রত্যেকে তারা নয়ন-জুড়ানো আলো।

সংঘবদ্ধ দেবদূত যত   কর-ভঙ্গিতে বরাভয়-রত
অথচ কণ্ঠে জ্ঞাপন করেনি স্বর,
কণ্ঠস্বর শুনি না, অথচ আমার হৃদয়ে নামে
সে-নীরবতার সংগীতনির্ঝর।

শ্রবণে হঠাৎ দাঁড়ের শব্দ আসে,
তরীচালকের শুনি হর্ষোল্লাস,
মাথা ঘুরে গেল, বলা-ই বাহুল্য তা
দেখলাম এক তরণী দিল আভাস।

তরণী-চালক এবং মাঝিটি তার,
মনে হলো যেন ধেয়ে আসে সত্বর,
হে করুণাময়, এ যে বড়ো বিস্ময়,
মৃত মানুষেরা নয় অনিষ্টকর।

আর দেখি এক তৃতীয় পুরুষ, কণ্ঠও শুনি তাঁর,
অপূর্ব সন্ন্যাসী!
তিনি গেয়ে যান মন্দ্র স্বরগ্রামে
তপোবনে তাঁরি রচিত স্তোত্ররাশি,
বিমোচন করে দেবেন আমার পাপ
সিন্ধুপাখির রক্তরুধির নাশি।

৭

বনেই থাকেন সাধু এই সজ্জন
সাগরের দিকে ঢালু অরণ্যবাসে
তোলেন মন্দ্র সপ্তকে সুস্বর
তাদেরি সঙ্গে আলাপে উন্মুখর
যত নাবিকেরা দূর দেশ থেকে আসে।

নতজানু হন সকালে দুপুরে এবং সায়ংকালে
আছে একখানি কুশন-আসন তাঁর,
শ্যাওলায় ছাওয়া, ঢেকে আছে সবখানি
পচে-যাওয়া গোড়া বুড়ো ওক গাছটার।

পান্‌সিটা আসে এগিয়ে, ওদের কথা ভেসে আসে কানে
কিন্তু এটা তো বড়ো বিচিত্র লাগে,
কেন সারি-সারি অনেক আলোকমালা
সঙ্কেত দিয়ে উঠল একটু আগে।

'কখনো দেখিনি এহেন কাণ্ড!' সন্ন্যাসী বললেন
ওরা আমাদের হর্ষে দিল না সাড়া,
পাটাতন-কাঠ দড়িতে জড়ানো! আর দেখো পালগুলি
কেমন রুগ্ন ঝল্‌সানো, এ-চেহারা
যদি একান্ত দেখতে না হতো তবে
সেই ভালো হতো, এমন হতচ্ছাড়া।

গাছ-খসা যত বাদামি শুক্‌নো পাতা
বইছে আমার বন-ঝোরা বেয়ে ধীরে;
যখন বরফ আইভি-ঝোপকে ঢাকে;
উঁচু ডালে ছোটো প্যাঁচাটা শাসায় নিচের নেকড়েটাকে,
নেকড়ে-বাঘটা খেয়ে বসে আছে বাঘিনীর ছানাটিরে।'

সে-মাঝিটি বলে ওঠে
'হে করুণাঘন, এ বড়ো সর্বনাশী;
আতঙ্কে মরি'—'ও কিছু না, ও কিছু না
বেয়ে যাও'—ভয় ঘোচালেন সন্ন্যাসী।

নৌকোটা এলো জাহাজের আরো কাছে
আমি তবু রই বাক্যহীন, নিথর,

নৌকোটা এলো জাহাজের পাশ ঘেঁসে,
একটা শব্দ উঠে এলো বরাবর।

জলের তলায় কল্‌কল্ করে ওঠে,
জোরে, আরো জোরে, শঙ্কা বাধাতে চায়,
জাহাজ ছুঁয়েছে এইবার, ভাঙে উপসাগরের জল,
সীসার মতন জাহাজটা ডুবে যায়।

কর্ণভেদী সে ভীষণ শব্দে অসাড় সংজ্ঞাহীন
নির্জিত দিক্ দিগন্ত পারাবার,
ভাবো তার দশা যেই জন জলে ডুবে আছে সাতদিন,
সেই মতো ভেসে রইল দেহ আমার,
কিন্তু স্বপ্নসম সত্বর, হলাম প্রত্যাসীন
সেই মাঝিটির তরণীতে আরবার।

জাহাজ যেখানে ডুবেছিল তার ঘূর্ণিরেখায়
পাক খেয়ে খেয়ে নৌকোটা ঘুরে যায়,
টুঁ শব্দ নেই কোনো প্রান্তেই
পাহাড়টা শুধু প্রতিধ্বনি ছড়ায়।

ঠোঁট খুলতেই আর্তস্বরে পড়ে গেল সেই মাঝি,
হঠাৎ মূর্ছিত সে,
ঋষিপ্রবর চোখ তুলে তাকালেন
যেখানে ছিলেন বসে।

আমিই বৈঠা টেনে ধরি, দেখে মাঝিটির ছেলে
উদ্‌ভ্রান্তের মতো

হো-হো করে হাসে, ফুরোয় না হাসি, সারাটা ক্ষণ তার
চোখ দুটো ঘোরে কেবলি ইতস্তত,

বল্‌ছে সে ‘হুঁ-হুঁ   বুঝেছি হুবহু,
নৌকো বাইতে পিশাচ বেশ জানে তো !’

এই বলতেই চেয়ে দেখি নিজ দেশে
দাঁড়িয়ে রয়েছি শক্ত মাটির ’পরে !
সন্ন্যাসী নেমে এলেন নৌকো থেকে
মাটি ছুঁয়ে নাকি মাটি না স্পর্শ করে।

‘অপাপ পুরুষ, আপনি শুনুন আমার যা-কিছু পাপ’
শুনে সন্ন্যাসী ভুরুতে করেন প্রতীকী ক্রুশাংকন,
‘বলে ফেলো’, তিনি বলেন, ‘আদেশ শোনো,
বলো বলো তুমি আসলে ঠিক কেমন ?’

অমনি কেমন মোচড় লাগল সারাটা শরীর জুড়ে,
দারুণ দুর্বিপাকে,
সকলই আমায় বলতে বাধ্য করে,
বলা হয়ে গেলে ছেড়ে দিল সে আমাকে।

জানান্‌ না দিয়ে, সেই থেকে, সেই জ্বালা
থেকে-থেকে ফিরে আসে,
আমার ভীষণ কাহিনী যতক্ষণ
সাঙ্গ না হয় হৃদয় মরে ত্রাসে।

ছুটে চলি আমি দেশ থেকে দেশে ছায়ামূর্তির মতো,
কথা বলবার রীতিরহস্য জানি,
কারো মুখে আমি তাকালে আমার কথা
তাকে যে শুনতে হবে, অব্যর্থ তা,
তাকেই তো বলি আমার কথা-কাহিনী।

তোরণদুয়ার ভেঙে ফেলে ঐ আনন্দ কোলাহল,
নিমন্ত্রিতেরা সবাই ওখানে আছে,

কিন্তু কুঞ্জকাননেই নববধূ
সখীদল গায়, নববধূ তার মাঝে,
আর শোনো ঐ সান্ধ্য উপাসনার
ঘণ্টা আমায় ডেকে-ডেকে ঐ বাজে!

হে অতিথি, শোনো, আত্মা আমার ছিল
অকূল একাকী অপার মহাসাগরে,
এতো একাকী যে মনে হতো ভগবানও
নেই বুঝি অন্তরে।

শুভবিবাহের ভোজসভা থেকে মধুরতর
মধুর কত যে প্রাণে,
গির্জের দিকে একযোগে হেঁটে যাওয়া
মনের মতন সঙ্গীসন্নিধানে।

গির্জের দিকে একযোগে হেঁটে গিয়ে
সমবেত প্রার্থনা,
এবং সবাই বিনত সবার পরম পিতার কাছে
আবালবৃদ্ধবন্ধুরা পাশে আছে,
সহর্ষ যুবা তরুণী কলস্বনা।

শুভায় ভবতু, বিদায়। এবং শোনো
স্বাগত-অতিথি, তোমাকে একথা বলি
সার্থক শুধু তারি প্রার্থনা যে সদাই ভালোবাসে
মানুষ এবং পশু ও পাখি সকলই।

সকলের চেয়ে প্রিয়দর্শীর প্রার্থনা সার্থক,
ভালোবাসে যেবা ক্ষুদ্র ও মহীয়ান্,
আমাদের ভালোবাসেন দয়াল প্রভু
সবার স্রষ্টা সকলের 'পরে টান।
দু' নেত্র যাঁর দীপ্রখরোজ্জ্বল
শুক্লশ্মশ্রু বয়সের ছোঁয়া লেগে,

তিনি গিয়েছেন, আর সে অতিথি ফেরে
নববিবাহিত বরের দরজা থেকে।

এবং যখন ফিরে এলো যেন সে এক স্বপ্নে-পাওয়া,
প্রবাসীর মতো একা, অধিকন্তু সে
শোকাচ্ছন্ন প্রাজ্ঞ আরেকজন
যখন জাগল পরদিন প্রত্যুষে॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

লর্ড বায়রন

প্রেম ও গৌরব

মোরে শুনায়ো না খ্যাতির কাহিনী,—ইতিহাসে খ্যাত নাম,
যৌবন দিন শুধু মানবের সব গৌরব ধাম!
বাইশ বছর বয়েসের সেই প্রেম-কুসুমের হার,
জয়-মাল্যের চাইতে মূল্য শতগুণে বেশি তার।
বলি-লাঞ্ছিত ললাটের 'পরে পুষ্প-মুকুট কেন?
মরণ-পাংশু কুসুমের দলে স্নিগ্ধ শিশির হেন!
পাকা চুলে আর সাজায়ো না ফুলে, যাও, নিয়ে যাও মালা;
কে চাহে বিজয়-মাল্য?—যদি সে শুধুই নামের জ্বালা।
কীর্তি! তোমার কৃপায় কখনো হর্ষ যদি বা আসে,
সে নহে তোমার শুনিতে-মস্ত কেতা-দুরস্ত ভাষে;
সে পুলক শুধু তখনি জাগে গো যবে গৌরব গানে,
ভালোবাসিবার অযোগ্য নহি,—প্রিয়া মোর বুঝে প্রাণে।
গৌরব আমি খুঁজেছি, পেয়েছি প্রিয়ার নয়ন মাঝে,
কীর্তি-ছটার প্রধান রশ্মি তারি চাহনিতে আছে;
যখনি সে আঁখি উজ্জ্বল হয় চাহিয়া আমার পানে,
আমি মনে জানি সেই ভালোবাসা, কীর্তি সে—জানি প্রাণে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বিদায়

যখন বিদায় নিলাম দুজনে
নীরবে এবং অশ্রুপাতে
অর্ধভগ্নহৃদয়ে, কাতর
বিরহে আগামী কালাতিপাতে
পাংশু কঠিন চিবুক তোমার
চুম্বন হলো তুষারখর
পটভূমি সেই বেদনকাহিনী
রটাল আলোকে ব্যাকুলতর

প্রভাতবেলার শিশির ঝরাল
তুহিনপ্রপাত আমার ভালে
যেন আমার এই ব্যথার আভাস
মুদ্রিত তার রশ্মিজালে
তোমার যশের জ্যোতি আজ ম্লান
অপগত সব অঙ্গীকার
তোমার নামের ধ্বনি শুনে আমি
সেই লজ্জার অংশীদার

কাহিনী তোমার শোনায় সকলে
কানে ভেসে আসে মরণ বাঁশি
থরোথরো কাঁপে ত্রস্ত শরীর
কেন নিলে প্রেম সর্বনাশী
তোমার আমার গূঢ় পরিচয়
জানে না তোমার স্বজন যারা
কতকাল বলো বিলাপে তোমার
কতকাল রবো আত্মহারা

গোপন কুঞ্জে দেখা হতো, আজ
ভাষাহীন আমি বিষাদভারে
কেমনে তোমার হিয়া পলাতক
বিস্মরণের মিথ্যাচারে
যদি পুনরায় দেখা হয় কভু
অনেক অনেক বরষ বাদে
কেমনে তোমায় জানাব স্বাগত ?—
নীরবে এবং অশ্রুপাতে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্সি বিসি শেলি

সিন্ধুর তীরে বিষণ্ণ হৃদয়ের গান

১

মধুর সূর্যের আলো, আকাশ বিমল,
সঘনে উঠিছে নাচি তরঙ্গ উজ্জ্বল।
মধ্যাহ্নের স্বচ্ছ করে
সাজিয়াছে থরে থরে
ক্ষুদ্র নীল দ্বীপগুলি, শুভ্র শৈলশির।
কাননে কুঁড়িরে ঘিরি
পড়িতেছে ধীরি ধীরি
পৃথিবীর অতি মৃদু নিশ্বাসসমীর।
একই আনন্দে যেন গায় শত প্রাণ—
বাতাসের গান আর পাখিদের গান।
সাগরের জলরব
পাখিদের কলরব
এসেছে কোমল হয়ে শুদ্ধতার সংগীতসমান।

২

আমি দেখিতেছি চেয়ে সমুদ্রের জলে
শৈবাল বিচিত্রবর্ণ ভাসে দলে দলে।
আমি দেখিতেছি চেয়ে,
উপকূল-পানে ধেয়ে
মুঠি মুঠি তারাবৃষ্টি করে ঢেউগুলি।
বিরলে বালুকাতীরে
একা বসে রয়েছি রে,
চারিদিকে চমকিছে জলের বিজুলি।
তালে তালে ঢেউগুলি করিছে উত্থান—
তাই হতে উঠিতেছে কী একটি তান।
মধুর ভাবের ভরে
হৃদয় কেমন করে
আমার সে ভাব আজি বুঝিবে কি আর কোনো প্রাণ

৩

হায় মোর নাই আশা, নাইকো আরাম—
ভিতরে নাইকো শান্তি, বাহিরে বিরাম।
নাই সে সন্তোষ ধন
জ্ঞানী ঋষি যোগীগণ
ধ্যান সাধনায় যাহা পায় করতলে—
আনন্দমগনমন
করে তারা বিচরণ,
বিমল মহিমালোক অন্তরেতে জ্বলে।
নাই যশ, নাই প্রেম, নাই অবসর—
পূর্ণ করে আছে এরা সকলেরি ঘর।
সুখে তারা হাসে খেলে,
সুখের জীবন বলে—
আমার কপালে বিধি লিখিয়াছে আরেক অক্ষর।

৪

কিন্তু নিরাশাও শান্ত হয়েছে এমন
যেমন বাতাস এই, সলিল যেমন।
মনে হয় মাথা থুয়ে
এইখানে থাকি শুয়ে
অতিশয় শ্রান্তকায় শিশুটির মতো।
কাঁদিয়া দুঃখের প্রাণ
করে দিই অবসান
যে দুঃখ বহিতে হবে, বহিয়াছি কত।
আসিবে ঘুমের মতো মরণের কোল,
ধীরে ধীরে হিম হয়ে আসিবে কপোল।
মুমূর্ষু শ্রবণতলে
মিশাইবে পলে পলে
সাগরের অবিরাম একতান অন্তিম কল্লোল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটি কথা

একটি কথা বারেবারেই পেয়েছে লাঘবতা
তাহারে লঘু করিব না তো আর।
দিনে দিনেই সয়েছে হেলা একটি মনোব্যথা,
অবমাননা কোরো না তুমি তার।
একটি আশা নৈরাশেরি নিকট আত্মীয়,
তারেও দলি' করিবে খান্ খান্?
তোমার অনুকম্পাটুকু যেমন মোর প্রিয়
তেমন নহে আর কাহারো দান॥

প্রেমের নামে লোকে যা দেয় দিব না তাহা আমি,
লবে না কি গো আমার নিবেদন—

নিম্ন হতে যে-অর্চনা উর্ধ্বলোকগামী
দেবতা যারে করে না বর্জন ;
তারার লাগি পতঙ্গ যে আশায় মরে ঘুরে,
উষার লাগি নিশার যে-সাধনা
পীড়িত এই মর্ত্য হতে যা আছে বহুদূরে
তাহারি লাগি যে-পূজা-আরাধনা ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাম্ভিক

দেখা হলো পান্থ সনে প্রাচীন মিশর হতে আসি
কহে সে, "আসিনু দেখি দেহহীন চরণযুগল
রয়েছে দাঁড়ায়ে, পার্শ্বে বালুকায় লুটায় কেবল
ছিন্ন মুণ্ড সে মূর্তির, ওষ্ঠাধর গর্ব পরকাশি'
ঘোষিতেছে ক্রুর আজ্ঞা। দাম্ভিকের মরম আভাস
গড়েছে নৈপুণ্যে যেন সে ভাস্কর, তার মর্মবাণী
অভিজ্ঞ-দৃষ্টিতে হেরি মৃতজড়ে আনিয়াছে টানি ;
পাদপীঠে আছে লিখা 'নাম মোর আজুমানডিয়াস্।
রাজন্যের অগ্রগণ্য হই আমি, মোর কীর্তি হেরি
যেথা আছে যত বীর সসম্ভ্রমে হও নতশির'।
এই শিলালিপিটুকু অবশিষ্ট, যেন তূরী ভেরী
বাজাইছে তার স্বরে, মরুভূমি নিঃশব্দ বধির।
যতদূর দৃষ্টি যায় চৌদিকে সাহারা করে ধূ ধূ,
সে বিপুল ধ্বংসরাশি মাঝখানে পড়ে আছে শুধু।"

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রভঞ্জন

প্রভঞ্জন ঈশানের! গগনের বুকে তুমি উন্মদ সমীর,
ওড়ে শুষ্ক পত্ররাশি তোমার অদৃশ্যমুখ-মারুত ফুংকারে,
এমনি ভূতের পাল ভয়ে পালাইয়া যায় মন্ত্রে কুহকীর।

বিবর্ণ অসিত পীত আরক্তিম, দীপ্ত যেন সান্নিপাত জ্বরে
মড়কের বলি তারা। হে সারথি, নিয়ে যাও স্যন্দনে তোমার
বীজের বলাকা দলে, শীতের আঁধারপাতা শয্যাতল পরে
গুটাইয়া পাখা তারা পৃথ্বীতলে নিদ্রা যাক্ হিমভরা শেজে,
সারি সারি যেন তারা শবচয় নিজ নিজ কবরে বিবরে।
যেমনি সোদরা তব বাসন্তী লক্ষ্মীর হাতে শঙ্খ ওঠে বেজে,
পরি নীল শাড়িখানি মধুরবে স্বপ্নাতুরা ধরারে জাগায়,
অমনি কুসুম পাঁতি কুঁড়িমুখ তুলি শূন্যে স্তন্যপান করে,
বরণে সুভাসে আর সুধাগন্ধে ভরে তারা ভূধর মালায়
প্রাণ মোর মুক্তকণ্ঠে তোমা সনে চায় শুধু করিতে আলাপ,
হে রক্ষক, হে ভক্ষক, স্বৈরগতি, শোনো মোর আকুল প্রলাপ॥

তোমার উচ্ছল স্রোতে গগনে যে উদ্বেলন উঠে উথলিয়া,
খণ্ডমেঘদল তায় জীর্ণ পত্ররাজিপ্রায় হয় আন্দোলিত ;
নভসিন্ধু বিজড়িত শাখা হতে ধরা পরে পতত্র মেলিয়া
নামে যেন অকস্মাৎ বরষার বিজুলির পরীহুরীদল,
তোমার পবনঘন সুনীল লহরী পরে ভাসে লীলাভরে ;
মনে হয় যেন কোন্ মুক্তকেশী করালীর আলুল কুন্তল
উড়িয়া উঠেছে ঊর্ধ্বে, সুদূর দিগন্তরেখা তমিস্রায় ভরি
গগনের তুঙ্গতম শিরোবিন্দু পরে যেন পড়েছে এলায়ে,
সমাসন্ন ঝটিকার ঘন কেশভার কিংবা কভু মনে করি।
অন্তিম সংগীত তুমি আয়ুশেষ বরষের শেষ মুহূর্তের।
আজিকার কালরাত্রি বিপুল সমাধিশিরে কাজল গম্বুজ,
বক্ষ তার রাখ ভরি পুঞ্জিত শক্তিতে তব বাষ্প মরুতের।
সে নিবিড় সান্দ্রঘন নভস্তল দীর্ণ করি পড়িবে ঝরিয়া
মসীবৃষ্টি অগ্নিধারা শিলাপুঞ্জ ধরাতল প্লাবিত করিয়া।

এ ধরায় তুমি কি গো অবতীর্ণ হয়েছিলে ভেঙে দিতে ঘুম
নিদ্রালস নীলাম্বর, ছিল সে নিষুপ্ত যবে নিদাঘ স্বপনে ?
নদীর স্ফটিক ভুজবন্ধনে কি কারে হেন করিল নিঝুম ?

অদূরে উপসাগরে সুশোভন দ্বীপপুঞ্জ ছিল মৌনভরে।
স্বপনে নেহারে সিন্ধু, প্রাসাদ মন্দিরচূড়া রম্যসৌধরাজি,
নিস্তরঙ্গ বক্ষে তার কম্পমান চিত্রলেখা দীপ্ত রবিকরে।
স্বপনআলেখ্যখানি তৃণ শ্যামলিমামাখা কুসুমে খচিত,
সৌরভমদিরা যার তন্দ্রালসে বর্ণিবার শক্তি হরি' লয়;
সে প্রশান্ত সিন্ধুবক্ষ চমকি জাগিয়া যেন হলো তরঙ্গিত।
ঊর্মিদল অবকাশে খাতে খাতে দীর্ণ হলো রচিতে তোমার
পরিক্রম-পথরেখা, নিমেষে অতলস্পর্শ সিন্ধুগর্ভে জাগে
কলরোল; পঙ্কিল বিটপীকুল জলধিজ পত্রালি বিথার
মজ্জারসলেশহীন, শুনি তব রুদ্ররব আতঙ্কপাণ্ডুর
কাঁপে তারা থর থর শতধা বিদীর্ণ হয় স ঘাতে নিঠুর।

পারিতাম হতে যদি ঝরা পাতা, তাহা হলে তুমি তুলে নিতে,
মেঘ হলে উড়াইতে, ফিরিতাম দেশে দেশে সুখে ভেসে ভেসে
তোমার বিপুল শক্তিভরে আমি পারিতাম উঠিতে পড়িতে
ঢেউসম কম্প্রবক্ষে; তোমার আবেগে চিত্ত লইতাম ভরি,
হলেও শক্তির অংশী, তবু অবারিত গতি হতো না আমার
হে উদ্দাম, তোমা সম। বালক আছিনু যবে বায়ুবেগ ধরি
তোমারে লঙ্ঘন করা স্বপ্নপক্ষে সাধ্যাতীত ছিল না আমার।
আজি যদি তোমাসনে স্বর্গপরিক্রমা তরে শক্তি ধরিতাম,
তাহলে কি সনির্বন্ধ এ যাচনা করিতাম উদ্দেশে তোমার?
ওগো মোরে ঊর্ধ্বে লও উত্তাল তরঙ্গপারা, লও উড়াইয়া
শুষ্ক জীর্ণ পর্ণ সম, কিংবা খণ্ডমেঘে যথা পবন উড়ায়,
কণ্টক শয়নপরে রুধিরাক্ত এ জীবনে রয়েছি পড়িয়া।
শৃঙ্খলের গুরুভারে অবনত মন্থরিত রাত্রিদিন যার,
জেনো সে তোমারি সম অহংকারী ক্ষিপ্রগতি, নিতান্ত দুর্বার।

বনানী যে বীণা তব, আমারেও করো তুমি বীণাটি তোমার,
তারি সম ঝরি ঝরি আজি মরিতেছি আমি কিবা ক্ষতি তায়?
তোমার সুরের ঘূর্ণি প্রভঞ্জন সুমধুর উদাত্ত উদার,

আমাদের উভয়েরই প্রাণে দিবে হেমন্তের সুরব গম্ভীর
বেদনায় মধুময় ; হে ভীষণ হও তুমি অন্তরাত্মা মোর,
আমি তুমি হয়ে যাই, মর্মে মর্মে মিশি রও আবেগে অধীর।
মোর জীর্ণ ভাব চিন্তা ঝরা মরা পাতা সম যাক বিশ্বে উড়ে,
শুষ্ক পর্ণ সম তারা আনুক ঊষর ক্ষেত্রে নব উর্বরতা,
এ গানের অগ্নিমন্ত্র ধ্বনিত ঝংকৃত হোক সারা বিশ্ব জুড়ে।
প্রজ্বলিত কুণ্ড হতে ভস্মরাশি বহ্নিকণা যথা বায়ুভরে
চৌদিকে ছড়ায়ে যায়, তেমনই এ বাণী মোর মৌন রসনায়
জাগাক বোধনমন্ত্র মানবের তরে সুখসুপ্ত ধরাপরে।
ওগো ঝঞ্ঝা, কহ তুমি তূর্যনাদে আশাভরা ভবিষ্যৎবাণী,
হানে হিম যদি শীত, বসন্ত কি আনিবে না পুষ্পমাল্যখানি ?

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

জন কীট্‌স্‌

দুখ-শর্বরী মাঘে

দুখ-শর্বরী মাঘে
বড়ো সুখী তরুলতা ;
শাখে আর নাহি জাগে
শ্যামল শোভার কথা।
উত্তরবায়ু পারে না পত্র ঝরাতে,
বরষি করকা তীব্র স্বননে ত্বরাতে ;
নাহি পারে আর পিণ্ড-তুষার জরাতে,
বিকাশের মুখে তা সবায় ;

দুখ-শর্বরী মাঘে
বড়ো সুখী নির্ঝর ;
বুদ্‌বুদে নাহি জাগে
রঙিন রবির কর !

শুধুই মধুর বিস্মৃতি লয়ে সুখেতে,
লালসা-লহরে শান্ত করে সে বুকেতে ;
নিমেষের তরে উচ্চারে না তো মুখেতে
কঠোর কালের বারতায়।

আহা যদি সকলেরি
হতো গো এমনি হায় ;
অতীতের সুখ স্মরি'
কে না কাঁদে যাতনায় ?
মরমে মরমে পরিবর্তন মানা,
প্রতিকার নাই,—চিকিৎসা নাই জানা,
অথচ নহেক অপটু, বধির, কানা,
সে কথা লেখেনি কবিতায় ॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শরৎ

১

কুয়াশা-আবৃত ঋতু পরিপক্ব ফলভারে নত,
আতপ্ত সূর্যের তুমি ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ সে তো জানি ;
তারই সাথে যুক্তি করো কী কৌশলে দেবে অগণিত
ফলে ভরে দ্রাক্ষালতা আচ্ছাদনতৃণ-সঞ্চারিণী ;
নোয়াবে আপেল ভারে শ্যামলিম তরু কুটিরের,
ভরাবে সমস্ত ফল মধুরসে কোষের গহ্বরে,
স্ফীতি দেবে অলাবুকে, বাদামের গভীরে অবাক
স্বাদুরস ; ক্রমান্বয়ে ফোটাবে শাখায় থরে থরে
বিলম্বিত আরো ফুল, আরো আরো, যখন ভৃঙ্গের
ভ্রম হবে বুঝি কোনও অন্ত নেই তপ্ত নিদাঘের,
কারণ গ্রীষ্মের রসে সিক্ত নয় প্লাবিত মৌচাক।

২

কে দেখেনি বলো, তুমি বসে আছো সোনার ভাণ্ডারে ?
তাকালেই সেই মুখ, যেন তাকে না দেখাই দায়,
বসে আছো উদাসীন প্রসারিত নিভৃত খামারে,
তোমার চুলের গুচ্ছ ওড়ে মৃদু উড়ুনি হাওয়ায় ;
অথবা গভীর ঘুমে মগ্ন তুমি নীবার প্রচ্ছায়ে,
অক্ষত শস্যের আঁটি, আফিমের ঘ্রাণে চিত্ত ভারি,
নিবৃত্ত কাস্তের মুখ, কুঁড়িগুলি লতায় জর্জর ;
ফসল কুড়ানী হয়ে কখনও বা সাবধানী পায়ে
মাথায়-বিশাল-বোঝা ছোটো নদীটাকে দাও পাড়ি ;
অথবা আপেল নিংড়ে রস নেয়—খুব কাছে তারই
চেয়ে থাকো অপলক, রস ক্ষরে প্রহর প্রহর।

৩

বসন্ত কালের গান কোথায় এখন ? হায় কোথায় এখন ?
কী হবে সেকথা ভেবে, তোমারও তো রয়েছে সংগীত,—
আলোক-বিম্বিত মেঘে দিনের বিদায়ী শেষক্ষণ
আরক্তিম, বর্ণালিতে শস্যরিক্ত পৃথিবী রঙ্গিত।
বিলাপকরুণ সুর গুন্‌গুন্‌ মশকের ঝাঁকে
নদীর কিনারে কাঁপা বনস্থলে, কখনো উপরে
কখনো বা নিচে, হাওয়া যখন মন্থর অবসিত ;
কখনো নধর মেঘ দূরের পাহাড় থেকে ডাকে ;
ঝিল্লীর আওয়াজ ওঠে ; কখনো বা মুগ্ধ মৃদুস্বরে
শিস দেয় লালবুক পাখি এক বনের ভিতরে,
আকাশে ঘনায়মান বিহঙ্গের কূজন ধ্বনিত।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

প্রথম চ্যাপমানের হোমার পড়বার পরে

অনেক ঘুরেছি আমি কাঞ্চনী ভূস্বর্গের মাঝারে
দেখেছি অনেক রাজ্য জনপদ সৌন্দর্য সঙ্কাশ,
অ্যাপোলোর অনুযাত্রী বহু কবিকুলের নিবাস,
গেছি পশ্চিমের সেই বহুতর দ্বীপের দুয়ারে।
একটি পুণ্য ভূখণ্ডের প্রবাদ শুনেছি বারে বারে
যেখানে প্রদীপ্তভাল হোমারের রাজ্য-অবকাশ
কিন্তু আমি শুধুমাত্র সে-পুণ্য হাওয়ায় অনায়াস
নিশ্বাস নিয়েছি সুখে চ্যাপমানের সুকণ্ঠ ঝংকারে .
তখন আমার চিত্ত সেই জ্যোতির্বিদের মতন
সহসা নতুন গ্রহ দেখেছে যে দৃষ্টির গোচরে ;
কিংবা সেই মহাবলী কর্টেজ সমুৎক্রোশনয়ন
স্তব্ধ যে দাঁড়িয়েছিল ডারিয়েন পর্বত শিখরে—
নিয়েছিল নির্নিমেষ জলধির প্রশান্ত শরণ—
আর তার অনুচর সবাই বিমূঢ় পরস্পরে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সনেট

হেসে উঠলাম কেন আজ রাতে ? পাব না উত্তর :
নীরব ঈশ্বর, মূক দানবের কণ্ঠ রূঢ়তার,
পারে না উত্তর দিতে স্বর্গ কিংবা নরকের স্বর।
তৎক্ষণাৎ ফিরে আসি মানুষী এ-হৃদয়ে আমার।
হৃদয় ! এখানে আজ তুমি আমি, বিষণ্ণ বিজন ;
হেসে উঠলাম কেন ! প্রশ্ন আসে, নশ্বর যন্ত্রণা !
অন্ধকার ! ওরে অন্ধকার ! কণ্ঠে দীর্ণ নিপীড়ন,
হৃদয়ে, নরকে, স্বর্গে প্রশ্ন করা বৃথা বিড়ম্বনা।
হেসে উঠলাম কেন ? জানি এই সত্তার উন্মেষ,
আমার কল্পনা চায় বিস্তারের আনন্দ অপার ;
তবু আজই মধ্যরাতে আয়ুকাল হবে তো নিঃশেষ,

এবং বর্ণালি দৃশ্য ছিন্নভিন্ন দেখো একাকার;
কবিতা, সৌন্দর্য, কীর্তি অবশ্যই সুতীব্র উদ্ধার,
কিন্তু মৃত্যু তীব্রতর—জীবনে অনন্য পুরস্কার।

সুনীলকুমার নন্দী

সনেট

দীপ্ত তারা, যদি আমি হতাম তোমার মতো স্থির—
নয় নিশীথের বুকে দূরবিদ্ধ সমারোহে একা
দু-চোখের পাতা মেলে, চিরকাল দেখা শুধু দেখা,
যেন প্রকৃতির কোনো উপাসক, নিদ্রাহারা, ধীর,
চলমান জলস্রোত তাপসের মতো তপস্যায়
পূত শান্তিবারি বুকে বসুধার জনতট ঘিরে,
কিংবা চেয়ে চেয়ে দেখা জলাভূমি পাহাড়চূড়ায়
প্রথম তুষারপাত আঁচল পরায় ধীরে ধীরে
তাও নয়—তবু স্থির, অবিচল, রূপান্তরহীন,
মাথা রেখে মনোরমা প্রেয়সীর মঞ্জরিত বুকে,
ভীরুতার ওঠাপড়া অনুভব করে চিরদিন
চিরকাল জেগে থাকা শুধু এক মধুর অসুখে,
শুধু, শুনে যাওয়া শুধু তার মৃদু শ্বাসের স্পন্দন,
এই নিয়ে চিরজীবী—তা নাহলে নামুক মরণ॥

যুগান্তর চক্রবর্তী

কয়েক ছত্র

এই যে জীবন্ত হাত, একান্ত মুঠির দৃঢ়তাপে,
যদি তা শীতল হয় কবরের হিমস্তব্ধতায়,
যদি তা তোমাকে হানে সারাদিন, রাত্রির স্বপ্নকে করে ম্লান
যেন তুমি মনে করো তোমার বুকের রক্তস্রোত

স্তব্ধ হয়ে প্রাণধারা আমার শিরায় দিক ঢেলে,
তখন চেতনা-শান্ত তুমি, চেয়ে দেখো, এই দেখো—
তোমার দিকেই আমি মেলেছি দু-হাত ॥

যুগান্তর চক্রবর্তী

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ

সারাদিন

সারাদিন গিয়েছিনু বনে
ফুলগুলি তুলেছি যতনে।
প্রাতে মধুপানে রত
মুগ্ধ মধুপের মতো
গান গাহিয়াছি আনমনে।

এখন চাহিয়া দেখি, হায়,
ফুলগুলি শুকায় শুকায়।
যত চাপিলাম মুঠি
পাপড়িগুলি গেল টুটি'—
কান্না ওঠে, গান থেমে যায়।

কী বলিছ, সখা হে আমার—
ফুল নিতে যাব কি আবার।
থাক বঁধু, থাক থাক,
আর কেহ যায় যাক,
আমি তো যাব না কভু আর।

শ্রান্ত এ-হৃদয় অতি দীন,
পরান হয়েছে বলহীন।

ফুলগুলি মুঠা ভরি
মুঠায় রহিবে মরি
আমি না মরিব যত দিন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রেম

গানটি ফুরাইলে যদি না মনে লয়
এমন শুনি নাই জীবনে,
সে জন গেলে চলে যদি না মনে হয়
মানুষ নাই আর ভুবনে,
'রূপসী' বলিয়া সে সোহাগ না করিলে
যদি না মানো দীন আপনায়,
যদি না জানো মনে 'জীবনে মরণেও'
বোলো না 'প্রেম' তবে কভু তায়।
বসিয়া জনতায় তারি সে প্রেমমুখ
ধেয়ানে যদি দিন না কাটে,—
গগন ব্যবধান,—তবুও মনোপ্রাণ
না সঁপি যদি বুক না ফাটে,
তাহার নিষ্ঠায় রাখিয়া বিশ্বাস
স্বপনভরে দিন নাহি যায়,
ভাঙিলে সে স্বপন মরিতে নার যদি
বোলো না 'প্রেম' তবে কভু তায়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ঈগল

পাহাড়ের চূড়া আঁকড়ে থাকে সে বঙ্কিম নখঘায়ে
নির্জনদেশে সূর্যের গায়ে গায়ে,
নীলিম বিশ্ব চারিদিক তার ছায় ।
নিচে তার চলে গুটি গুটি ঐ সাগর ভ্রূকুঞ্চিত,
পাহাড়ে কেল্লা থেকে চোখ রাখে তীক্ষ্ণ ও সচকিত,
তারপরে নামে বজ্রের মতো প্রবল আচম্বিত ॥

বিষ্ণু দে

কতেরেৎসের উপত্যকায়

সারা উপত্যকা বেয়ে, যে নদী বইছ ঝলমল,
রাত্রির গভীরে ডুবে গভীর করেছ কলস্বর,
সারা উপত্যকা বেয়ে, যেখানে গড়ায় তোর জল
সেখানে হেঁটেছি আমি তার সাথে, যাকে
সময় কেটেছে ভালোবেসে,
কেটেছে কখন এক ফাঁকে একা-একা বত্রিশ বছর ।
সারা উপত্যকা বেয়ে, চলেছি যখন আজ পথ
বত্রিশ বছর দেখি সরে যায় কুহেলিকাবৎ
সারা উপত্যকা বেয়ে, কঠিন শিলার পথে নেমে
কেননা শুনেছি আমি সঞ্জীবিত তোর কণ্ঠস্বরে
যেন কোন ধ্বনি জাগে মৃতের কবরে,
আর উপত্যকা বেয়ে, পথে সারা উপত্যকা বেয়ে
কঠিন শিলা ও গুহা, গাছে-গাছে মর্মরিত শুনি
মৃতের সে-কণ্ঠস্বর, সঞ্জীবিত যেন সবচেয়ে ।

নিখিলকুমার নন্দী

সীমাপার পারাবার

দিন অবসান, ফুটে ওঠে তারা সায়ন্তনী
কে যেন আমায় স্বচ্ছকণ্ঠে ডাকে,
এ নদীর চরে যেন না ঘনায় বিদায়ধ্বনি
যাত্রা করব যখন সাগরবাঁকে ;

এ যে তরঙ্গ জঙ্গম তবু সুপ্তি জানে,
ভরে আছে, তাই তোলে না জল-জোয়ার,
অতল গভীর হতে উঠেছিল উর্ধ্বপানে,
নিকেতনে আজ ফিরছে পুনর্বার।

গোধূলি এবং সান্ধ্য ঘণ্টা ঐ বাজাল
আর তারপরে আঁধার ঘনাবে ঘিরে
বিদায়লগ্ন ভারাক্রান্ত নাই বা হলো
পাড়ি দেব যবে জাহাজে সিন্ধুনীরে।

জলধারা জানি আমায় টানবে যে কালীদহে
মুছে যায় এই স্থানকাল পৃথিবীর,
মুখোমুখি তবু তাকিয়ে দেখবে দিশারী নেয়ে
ছেড়ে যাব যবে তীর ॥

সুপর্ণা সেন

রবার্ট ব্রাউনিঙ

অমোঘ প্রেম

সন্ধ্যা না হতে নামিল বাদলধারা,
মৌন পবন শ্বসিয়া জাগিয়া উঠি
ভাঙে ঝাউশাখা, আক্রোশে দিশাহারা

হ্রদের বক্ষে খায় যেন লুটোপুটি,
বুঝি হিয়া মোর শতধা পড়িবে টুটি।

ধীরে মোর ঘরে আসিল অভিসারিকা,
হিমহানা ঝড় রুধি দিল অর্গলে,
অগ্নিকুণ্ডে জ্বালি দিল হোমশিখা -
মধুর আতপে দীপ্ত বহ্নি জ্বলে।
মেলি কেশভার ফেলি সিক্তাঞ্চলে

মোর কাছে আসি বসিল আমার পাশে।
ডাকিল আমায়, রহিনু নিরুত্তরে।
ভুজবন্ধনে বাঁধা পড়িবার আশে
রাখে হাতখানি মোর স্কন্ধের পরে,
কপোল আমার নমিয়া লুটিয়া পড়ে

বক্ষে তাহার, আবরণলেশহারা।
ডুবে গেনু আমি আলুলিত কেশদামে,
সোহাগের বাণী লাগিল সুধার পারা
আবেগ উথলি বাধাভরে যেন থামে,
গর্ব লাজের নিষেধের সংগ্রামে।

আকুল বাসনা কোনো মানা মানে না যে!
এই রজনীর মধুমিলনোৎসবে
প্রেমপাণ্ডুর ওই মুখ বুকে বাজে।
তবু হার মানি, বৃথা যুঝি কী বা হবে,
ঝড়ঝঞ্ঝায় আসি মোরে জিনি লবে;

নিশ্চয় জেনো, হেরিনু নয়নে তার
হর্ষ গর্ব, কোনো খেদ মনে নাই,
চায় সে আমারে পূজিবার অধিকার।
বিস্ময়াবেশে কী করিব ভাবি তাই,
তবু ভরা বুকে না জানি কী বল পাই!

ত্রিদিবের ফুল অমল অনাঘ্রাত,
এই লহমায় সে আমার সে আমার!
জানি কী করিব, দ্বিধা আর করি না তো
পেয়েছি নিশানা। দীর্ঘ সে কেশভার
তিনবার আমি কোমল কণ্ঠে তার

জড়ায়ে জড়ায়ে রচিলাম গলে ফাঁসি।
কোনো বেদনা সে পায় নাই আমি জানি।
মুদিত কমলে অলি যথা কারাবাসী
আঁখিতারা তার তেমনি যে অনুমানি।
নত পল্লব অতি সাবধানে টানি

হেরি হাসিটুকু নীল আঁখি-তারকার।
গলদেশ হতে কেশের গ্রন্থি খুলি
চুমিয়া চুমিয়া ফুটান্থ কপোলে তার
রক্তিম রাগ, মাথাটি নিলেম তুলি
এই বুকে মোর, স্কন্ধে পড়িল ঢুলি।

গোলাপের মতো যেন রাঙা টুকটুকে
হাসিভরা মুখ জয়শ্রী-গৌরবে,
কোনো অশান্তি নাই আর ওই বুকে
পেয়েছি সে চিরবাঞ্ছিত বল্লভে,
কোনো ব্যবধান রহিবে না আর ভবে।

সরলা সে বালা বোঝেনি কেমন করে
একটি মাত্র বাসনা পূরিবে তার।
মোরা দুজনায় বাঁধা আছি বাহুডোরে
সারা নিশিভোর অচল নির্বিকার।
একটি কথাও মুখে নাই বিধাতার।

স্থরেন্দ্রনাথ মৈত্র

মিলন-নিশীথে

ধূসর সিন্ধু, তিমির-তুলিকা-বুলানো কাজল রাতি,
আধ-খানি চাঁদ ধরণীর কোলে সোনার আঁচল পাতি।
পাড়ি হলো শেষ; খাড়ির ভিতরে নৌকার মুখ ঠেলি
ভিড়ানু তরীরে ভিজা সিকতায়; ঘুম-ভাঙা আঁখি মেলি
ছোটো ঢেউগুলি উঠিল উছলি অনল ঘূর্ণিপাকে,
বলয়িত জল-কল্লোলমালা ঘেরিল সে নৌকাকে।
আধ-খানি পথ সিন্ধু-সুরভি পার হনু সে তিমিরে,
তিনখানি মাঠ উত্তরি পরে পহুঁছিনু সে কুটিরে।
মৃদু করাঘাত বাতায়নে মোর, ক্ষিপ্র ঘর্ষভরে
দেশালাই কাঠি উঠিল জ্বলিয়া দেখিনু ক্ষণেক পরে।
তার পর দুটি বক্ষে বক্ষে স্পন্দন বিনিময়,
তার চেয়ে মৃদু চুপি চুপি কথা সুখ ভয় করি জয়।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বিচ্ছেদ-প্রত্যুষে

সহসা পড়িল সিন্ধু চক্ষে মোর অন্তরীপ বাঁকে,
তরুণ তপন হেরি উঁকি মারে পাহাড়ের ফাঁকে।
সম্মুখে রয়েছে তার সোনালি সরল পথখানি,
মোর তরে ধরাভরা মানবের দাবি আছে জানি।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

পাপড়ির গান

বছরের সেরা বসন্তকাল
সকাল দিনের সুখ
সাতটায় ফোটে সকালের ছবি
শিশির মুক্তো পাহাড়ে

আপন ডানায় ভাসছে মরাল
শিরদাঁড়ায় শামুক—
স্বর্গে আছেন ভগবান, সবই
ঠিক আছে সংসারে ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ওয়াল্‌টর স্যাভেজ ল্যান্‌ডর

রোজ এল্‌মর

হায়, মিলায় কোথা রাজা-উজীর-কাজী,
রক্ষা পাবে স্বর্গীয় সে-তনু!
রোজ, তোমার ছিল সকল গুণরাজি,
পুণ্যে গড়া অণু-পরমাণু।

রোজ, ঘুমহারা চোখ তোমার বিলাপ-মাখা,
তোমায় দেখে ধন্য হবে না সে।
হায়, স্মৃতি এবং দীর্ঘ শ্বাসে ঢাকা
রাত্রি রাখি তোমার উদ্দেশে।

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কারুকে যুঝিনি আমি

কারুকে যুঝিনি আমি, যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে;
নিসর্গ প্রেয়সী ছিল, নিসর্গের পরে শিল্পকলা;
দু-হাত করেছি উষ্ণ আমি জীবনের অগ্নিতাপে;
আজ তা নিবন্ত, আমি অতএব প্রস্থানে উতলা।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দর ছড়ায়ে আছে

সুন্দর ছড়ায়ে আছে যেমন আকীর্ণ ফুলভার
জগৎ ব্যাপিয়া, সব দেবতার দেওয়া উপহার।
শতেক আলোর ঝলা জ্বলে যায় মন্দিরে মন্দিরে,
প্রতিটি আলোর তলে আমি নত হই ফিরে ফিরে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিলম্বিত পল্লব

ঝরে যাচ্ছে পাতাগুলি ; আমিও তেমন ;
শেষের কয়েকটি ফুল আকুল নয়ন ,
তাই তো আমারও।
শোনা যায় না কোনো ডালে একটিও পাখির
আনন্দের গান কিংবা ডাক অখুশির
শোনা যায় না কাননেও কারো।

হয়তো আসছে শীত ; নিয়ে আসছে আরো কাছে আগুনের ধার
বছরে বছরে ক্রমে ছোটো হয়ে আসা চক্র তার
যেখানে পুরোনো বন্ধু মুখোমুখি পুরোনো বন্ধুর।
আসুক সে ; মেঘে ঢাকা আকাশ এখন তো
এবং বসন্ত গ্রীষ্ম উভয়েই অতীত বিগত
এবং সমস্ত কিছু সব কিছু যখন মধুর।

অরুণকুমার সরকার

ডোভারের সমুদ্র সৈকত

সমুদ্র প্রশান্ত আজ রাতে।
পূর্ণ জোয়ার, চন্দ্র প্রণালীতে শায়িত সুন্দর ;—
ফরাসী দেশের উপকূলে থেকে থেকে দৃশ্যমান
অস্পষ্ট আলোক নিবে গেল ; ইংল্যাণ্ডের তটলগ্ন
খাড়া উঁচু বিশাল পাহাড়
উদ্ভাসিত কোমল আভাতে,
একপাশে সাগর সুস্থির।

জানালার ধারে এসো, কী মধুর বাতাস রাত্রির।
কেবল যেখানে
সমুদ্র মিশেছে চন্দ্রালোকশুভ্র সৈকতভূমিতে,
কান পাতো, শীকরধারার দীর্ঘ রেখা থেকে
ধ্বনিত হচ্ছে শোনো কর্কশ গর্জন।
তরঙ্গ উপলখণ্ড টেনে নিয়ে যায়, এবং যখন
ফিরে আসে সজোরে নিক্ষেপ করে উচ্চ তটভূমির উপরে,
কম্পমান স্বরের প্রবাহ ধীর লয়ে শুরু করে, থামে,
এবং আবার শুরু করে,
বয়ে আনে চিরন্তন বিষাদের সুর।

হাজার বছর আগে ঈজিয়ান সাগরের তানে
ঠিক এই সুর সোফোক্লেস শুনেছেন—
অনুভব করেছেন
মানবিক যন্ত্রণার আবিল জোয়ার-ভাঁটা ;
একই অনুভব আনে
আমাদেরও মনে এই
দূরবর্তী উত্তর সাগর হতে ধ্বনি।

বিশ্বাসেরও সমুদ্র একদা ছিল, পরিপূর্ণ,
পৃথিবীর তট ঘিরে যেন সে বেষ্টনী—
এক সমুজ্জ্বল কুণ্ডলিত কটিবন্ধ।
কিন্তু, এখন শুধু শুনি,
হতাশ বিষণ্ণ স্বর তার, বিজিতের ক্ষোভ,
পৃথিবীর পরিব্যাপ্ত বিষাদের প্রান্ত আর
কর্কশ উপলে তার
হতাশায় ফিরে যাওয়া নিশীথের হাওয়ার নিশ্বাসে।
হায়, ভালোবাসা, পরস্পরের কাছে
সৎ হতে দাও আমাদের!
কারণ পৃথিবী, যাকে দেখে মনে হয়
যেন এক ভুবন স্বপ্নের
আমাদের সম্মুখে শয়ান,
এতো যে বিচিত্র, এতো নয়নাভিরাম, এতো যে নতুন,
তবু এর কাছে বস্তুত আনন্দ নেই,
নেই ভালোবাসা, নেই আলো, নিশ্চয়তা,
শান্তি কিংবা দুঃখে সহায়তা।
এবং আমরা যেন এইখানে অন্ধকার সমতলে
সংগ্রাম ও পলায়ন এ-দুয়ের বিপদ-সংকেতে
বিহ্বলতায় আপ্লুত,
যেখানে অজ্ঞান সৈনিকেরা
মত্ত হয় নিশীথে সংঘাতে॥

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

মনে রেখো

আমারে রাখিও মনে, চলে যবে যাব সেই দেশে—
যেথায় সকলি স্তব্ধ, নাহি কথা, নাহি গীত-গান ;
তখন ও হাতখানি এ হাতের পাবে না সন্ধান,
আমিও চলিতে গিয়ে থমকিয়া থামিব না হেসে।
এতো যে মিলন-স্বপ্ন, সুখ-সাধ, সব যাবে ভেসে,
দিনে-দিনে গড়ে-তোলা বাসনার হবে অবসান!
যখন সকল ভয়-ভাবনার ঘুচিবে নিদান,
তখন আমারে শুধু মনে রেখো—কঠিন নহে সে।

তবু যদি ভুলে গিয়ে, কিছুকাল পরে পুনরায়
সহসা স্মরণ করো—চিত্তে যেন নাহি হয় ক্লেশ ;
আমার এ দেহ যদি ততোদিনে মাটি হয়ে যায়,
জেগে থাকে তবু তাহে এতোটুকু চেতনার লেশ—
জেনো তবে—ব্যথা যদি পাও, সখা স্মরিয়া আমায়,
ভুলিয়াই ভালো থেকো—সেই মোর সুখ যে অশেষ!

মোহিতলাল মজুমদার

জন্মদিন

হৃদয়ে এতো খুশি, যেন সে পাখি গায়
সে পাখি, যে পাখির রসাল ডালে বাসা
হৃদয় আপেলের স্তবকে নুয়ে পড়া
যুবতী গাছ যেন আমার ভালোবাসা।

এ হিয়া রামধনু রঙানো ঝিনুকেরা
সুখের সাগরেতে সহজে চলে ভেসে
হৃদয় সবাকার চেয়েও আরো খুশি
বেসেছি ভালো আমি চলেছি ভালোবেসে

রেশমি সুখাসন আলতারঙা লাল
কত না কপোতের কত না দাড়িমের
রঙিন রেখাআঁকা হাজার চোখ জ্বালা
বাহার কত তার ময়ূরপেখমের

সেথায় সোনারূপা আঙুর থোকা আঁকা
পাতায় ঢেলেরাখা সুরভি কুসুমের
কেন এ আয়োজন পেয়েছি ভালোবাসা
এদিন চিহ্নিত নতুন জনমের।

কবিতা সিংহ

অলগের্নন চার্লস সুইনবার্ন

ত্রিশ্লোকী

অসীম ব্যোমেরে সূর্য কী কথা বলে?
সাগর কী কথা বলে গো হাওয়ার কানে?
কোন্ কথা চাঁদ বলে চুপে রাত্রিরে?
কোন্ জন তাহা জানে?

ভ্রমর কী ভাবে হেরিয়া কুসুম দলে?
কী ভাবে গো পাখি নিরখি নীড়ের পানে?
রৌদ্র কী ভাবে মেঘদলে চিত্রি রে—
কোন্ জন তাহা জানে?

গোষ্ঠ গোধনে কী কহে গানের ছলে?
কোন্ সুরে মধু মৌমাছি টেনে আনে?
অতল কী গান শোনায় হিমাদ্রিরে?
কে জানে এ তিন গানে?

ফাল্গুন যেই লিপি লেখে চৈত্রেরে,
বৈশাখ যাহা পড়ে গো আখর চিনে,
জ্যৈষ্ঠেরে দিয়ে যায় যে লিখন, শেষে,
তাহার জন্মদিনে ;

ঊষার পুলক দিনের প্রকাশ হেরে,
দিনের পুলক বিকশি মধ্যদিনে,
গানের পুলক ফেটে গিয়ে নিশ্বাসে
বেসুর করিয়া বীণে ;—

কে জানে ? কে বুঝে মরণ রহস্যেরে ?
কে জানে চাঁদের ক্ষয়, উপচয় ঋণে ?
মানুষের মাঝে নাই কারো হিসাবে সে ;
মৃত্যু জানাবে তিনে !

প্রবল ঢেউয়ের কিনারার প্রতি টান,
কিনারার টান ভগ্ন ঢেউয়ের দিকে !
আকাশ-বিদারী জ্বালাময় ভালোবাসা,—
জাগে যে বজ্রশিখে,—

যাবে না সে বোঝা, যতদিন আছে প্রাণ !
ধ্রুবতারা করি মরণের দু' আঁখিকে
যে অবধি জরি' না যায় প্রাণের বাসা,—
চেয়ে চেয়ে অনিমিখে ;

একটি নিমেষে সমস্যা সমাধান
যতদিন নাহি হয় গো, দিগ্বিদিকে
ঊষার মতন হাসিতে ফুটায়ে আশা
অথবা দ্বিগুণ ম্লান করি গোধূলিকে ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সৃষ্টির আদিতে

হলো যবে আয়োজন সৃষ্টির আদিতে,
মানুষের মর্মের ছাঁচখানি বাঁধিতে—
মহাকাল নিয়ে এলো অশ্রুর ভর্‌না,
চিরসাথী হইবারে দুখ দিল ধর্‌না ;
সুখ,—যার স্বাদ নাই বেদনার বিহনে,
মধুমাস নিয়ে এলো ঝরাফুল পিছনে ;
স্বর্গের স্মৃতি—কিবা সুন্দর ধারণা ।
—অন্তরে উন্মাদ, নরকের তাড়না !
বল,—তার বাহু নাই ধরিবারে প্রহরণ,
প্রণয়ের পুলকেতে পলকেরি শিহরণ ।
দিবসের ছায়া—সেই নিশীথের নীল-রূপ,
জীবনের হাসিমুখে মৃত্যুরই বিদ্রূপ !

দেবতারা নিল তাই আগুনের ফুলকি,
আর জল,—কপোলের ধারা সেই, ভুল কি ?
ধেয়ে চলে ঋতু-মাস—ঝরে বালি পায় পায়,
নিল তুলি ত্বরা করি তার দুই কণিকায় ;
সিন্ধুর ফেনা নিল—ভেসে আসে যেই সব,
আর নিল মেদিনীর শ্রমধূলি-বৈভব ।
জন্ম ও মৃত্যুর ভাবী উৎসঙ্গে
যত আছে রূপ-রাগ—নিল সেই সঙ্গে ।
সব সাথে মাখি লয়ে হাসি আর ক্রন্দন,
বিদ্বেষ-পঙ্ক ও প্রীতি-ঘন চন্দন ;
সাম্‌নে ও পিছে ধরি জীবনের ডঙ্কা,
ঊর্দ্ধে ও মহীতলে মৃত্যুর শঙ্কা ;—
শুধু একদিন, আর একটি সে রাত ভোর
গাঁথিবারে শক্তি ও ফূর্তির ফুল ডোর—

দিয়ে দুখ নিদারুণ—পাষাণের ভার তায়,
গড়ি দিল সুমহান্ মানবের আত্মায়!

ভরি দিক্ আর দিক্-অন্ত, ধায় তারা যেন মহা-দ্বন্দ্বে;
দেহ তার করি প্রাণবন্ত; ফুৎকারি, মুখে নাসারন্ধ্রে,
দিল ভাষা আর দিল দৃষ্টি—অপরের অন্তর ছলিতে
হলো কাজ অকাজের সৃষ্টি, আর পাপ—তাপে তার জ্বলিতে।
দিল দীপ হরি পথভ্রান্তি, দিল প্রেম, প্রমোদের পর্ব;
আর নিশা—নিশীথের শান্তি; পরমায়ু, আর রূপ-গর্ব।
বাণী তার জ্বালাময় বিদ্যুৎ—দু' অধরে প্রকাশের বেদনা!
কামনা যে অন্ধ ও অদ্ভুত! চোখে তার মরণের চেতনা!
রচে বাস—তবু চির-নগ্ন, দেহ ঢাকে ঘৃণারি সে বসনে;
বোনে বীজ, ফসলের লগ্ন—ব্যর্থ যে, ভাগ নাই অশনে।
ঢুলে ঢুলে স্বপ্নে ও তন্দ্রায়, তার সারা আয়ু যায় ফুরায়ে—
ঘুম থেকে জেগে ফের ঘুম যায়, জীবনের জ্বর যায় জুড়ায়ে।

মোহিতলাল মজুমদার

টমাস হার্ডি

খবর

তারা এলো দুই ভাই, দুজনে চেয়ারে
বসল অভ্যস্ত শান্তভাবে ঘেঁষে কাছে,
এবং খানিকক্ষণ আমরা বুঝিনি
তাদের বিশেষ কিছু বলবার আছে।

তারপরে কথাবার্তা শুরু, তারা বলে
পাঁচটা বিষয়ে অতি সাধারণ কথা,
যতক্ষণ না ঘরে সেই স্তব্ধতা ছড়াল
ছড়ায় যা চেপে-রাখা চিন্তায় অন্যথা।

তারপরে তারা বলে : এসেছে তো শেষ,
হাঁ, শেষ এসেছে শেষটায়।
আমরা নামাই মাথা বুঝলুম সেই দিন
একজন নিয়েছে বিদায়॥

বিষ্ণু দে

চৈত্রসন্ধ্যায়

আন্‌মনে বন-বেতসের নল কেটে
ফুঁ দিয়েছি আমি তাকিয়ে চাঁদের পানে,
কম্পিত পায়ে পিছে এক অশরীরী
অগোচরে হেঁটে এসেছে বাঁশির তানে।

ঝর্নার পাশে হাঁটু গেড়ে নিচু হয়ে
তৃষ্ণার জল তুলে গণ্ডূষ ভরে,
দেখেছি সে ছায়া শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে—
হতাশ দুচোখে মৌন বিষাদ ঝরে।

এলোমেলো ফুঁয়ে আবোল-তাবোল সুর
বাজিয়েছি, পদ নিয়ে ঘামাইনি মাথা,
তখনই এসেছে কানে ভেসে কার স্বর,
রইল তা এই পদাবলী মাঝে গাঁথা।

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

তারকা-উজ্জ্বল রাত্রি

তাকাও তারার দিকে। উর্ধ্বে তোলো আকাশে বীক্ষণ!
দেখো দেখো আগ্নেয়মণ্ডলী সব শূন্যে সম্মিলিত!
দীপ্ত নির্বাচক, দেখো সেইখানে দুর্গ আবেষ্টিত।
নিম্নে ম্লান অরণ্যে খনক হীরা! অপ্সরী নয়ন!
পাণ্ডু মাঠ যেথা স্বর্ণ, স্বর্ণ পারদের বিচ্ছুরণ!
বায়ুত্রস্ত শ্বেতকাণ্ড! শ্বেতবৃক্ষ মর্মরে স্ফুরিত
তন্তুময় পারাবত খামার-সন্ধানী, বিতাড়িত!
সব শুভ! সব কিছু পুরস্কার, সকলই অর্জন।

ক্রয় করো! জিতে নাও! কাকে? ধৈর্য, শপথ, প্রার্থনা।
দেখো দেখো উজ্জ্বল বৈশাখ যেন উদ্যানে প্রাণনা!
দেখো চৈত্রপুষ্প যেন পীতবৃক্ষে পীত বিমিশ্রতা!
সব কিছু নিশ্চিত ভাণ্ডার মানি; অবরুদ্ধ গৃহ
আলোড়ন! দীপ্ত স্তম্ভ দম্পতিরে করে গোপনীয়
ক্রাইস্ট-আলয়! খ্রীস্ট আর মেরী আর পবিত্রতা।

আলোক সরকার

ভিতরপ্রদীপ

পথপার্শ্বে কোনোখানে একটি প্রদীপ দীপ্ত জ্বলে।
আমি ভাবি কী ভাবে গোপন রাখে আনন্দ-নিবিড়
ঈষৎ পীতাভ আর্দ্র অস্বচ্ছ অমায় রজনীর,
কিংবা ইতস্তত নম্র চক্রদ্যুতি চক্ষুতে কুণ্ডলে।
কোন ডাক কোন প্রণোদনা সেই বাতায়ন তলে।
বিস্মিত ব্যাকুল ফিরি, অনুকাঙ্ক্ষা, আগ্রহী অধীর
উত্তর অভাবে মাত্র, অনুকাঙ্ক্ষা, কার কণ্ঠ বলে
কে সামান্য? ঈশ্বর দেবেন বিভা, অপূর্ব গভীর।—

ঘরে এসো, গাঢ় অভ্যন্তরে এসো ; খেয়ালী আলোক
হৃদয়ের সান্দ্র ঘরে শুদ্ধ করো প্রাণময় দীপ ;
সেখানে তুমিই প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ;
কে নিরুদ্ধ করে ?   তুমি জ্যোতি-অন্ধ, একটি অলীক
তার কাছে প্রতিবেশী চাতুরীর ?   তুমি সেই লোক
মিথ্যুক বিবেকত্যক্ত স্বাদহীন লবণ প্রতীক ?

আলোক সরকার

উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস

মানস সরোবর

হেমন্তের সান্দ্র ঘন মধুরিমা ধরে তরুরাজি,
পঙ্কহীন বনবীথি আজি।
উপল বন্ধুর স্তব্ধ সরসীর পরিপূর্ণ বুকে
আশ্বিন-গোধূলিছায়া নীলাম্বর হেরিতেছে সুখে।
সে দীঘির কালোজলে শুভ্রপক্ষ মেলি
হংসদল করে জলকেলি।
ঊনবিংশ হেমন্তের আনাগোনা শেষ হলো যবে
সহসা হেরিনু কলরবে
ঝাপটি ঝঞ্ঝার পক্ষ ছত্রভঙ্গে বক্রপথ ধরি
উড়ে গেল ঊর্ধ্বপানে হংসদল ছিন্নভিন্ন করি
বলাকার চক্ররেখা ; ইন্দুলেখা প্রায়
নভোনীলে তারা ভেসে যায়।

সে অমল কুন্দকান্তি হংসযূথ হেরিতাম সুখে
বড়ো ব্যথা বাজে আজি বুকে।
গোধূলিতে সরস্তীরে শুনিলাম প্রথম যখন
কলঘণ্টাধ্বনি সম তাহাদের পক্ষবিধূনন

লঘু পদভরে হলো গতি মৃদুতর,
সকলি লভিল রূপান্তর।

এখনো ভাসিয়া চলে হিমজলে ক্ষেপণী নিপুণ
শ্রান্তিহীন মরাল-মিথুন
অথবা উড়িয়া যায় শূন্যপানে যুগলে যুগলে,
তরুণ হৃদয়গুলি পড়ে নাই জরার কবলে।
ভাবোন্মাদ জয়োল্লাস যেথা তারা যায়
তাহাদেরি সাথে সাথে ধায়।

আজি এ নিথর জলে তাহারা চলেছে ভেসে ভেসে
কুহক-মধুর নিরুদ্দেশে।
কোন্ সরসীর তটে কিংবা কোনো পুষ্করিণী পারে
কুলায় বাঁধিবে তারা কাশগুল্মে রহস্য বিথারে,
দেখিবে অপর জনে, আমি শুধু জাগি,
হেরিব কি তাহারা বিবাগী?

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ছায়াচ্ছন্ন জলরাশি

[অংশ]

প্রথম নাবিক ॥ ভরে গেছে ধনরত্নে।
দ্বিতীয় ॥ ছাপায় ডেকের ঘর-দোর।
প্রথম ॥ থরে-থরে ধনরত্ন।
তৃতীয় ॥ সিন্দুকে দুষ্প্রাপ্য দারুচিনি।
প্রথম ॥ হাতির দাঁতের মূর্তি, চোখ তার পদ্মরাগমণি।
দ্বিতীয় ॥ ড্রাগনের চোখ চুনি-পাথর-বসানো।
এই গোটা জাহাজটা
ঝল্‌মলায় ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ পড়েছে যেন।

তৃতীয় ॥ দেশে ফিরে আমি এক মেয়েমানুষকে দেব
চুনিপান্না যত।

দ্বিতীয় ॥ আছে একজন তাকে পদ্মরাগমণি দেয়া যাবে।

অভীক ॥ (তাদের ইঙ্গিতে থামিয়ে)
আমাদের নিজ দেশে ফিরে চলি, আমরা, পরাগ ;
আমাদের ধনরত্নরাশি আজ এতোই অথৈ
কল্পনার পক্ষে সে তো কল্পনাতীত।
যখন সমস্ত আলো ঐ নারীটিতে একাকার
সমুদ্রে অতো কী আছে চেয়ে দেখবার ?

পরাগ ॥ পারি না, পারি না—আমি শেষ প্রান্তে চলে
যাচ্ছি, চলে।
এ মেয়েটি ? সম্ভবত মেয়েটি আমারই সঙ্গে যাবে।

অভীক ॥ নিরন্ত বাঁচার সুখ উন্মাতাল করেছে তোমাকে।
কিন্তু তা তো নয়, এই নারীটির জিঘাংসা তোমাকে
এখানে ছুটিয়ে আনল। আমি ততো নির্বোধ নই যে
আশা করব সে তোমায় সংসারে আবার নিয়ে যাবে।
এবং তুমিই ওকে প্ররোচিত করেছ এ কাজে,
তোমার জন্যই ওর এই দশা, মরতে চলেছে।

দয়িতা ॥ এ কখনো সত্য নয়, ও আমাকে দিয়েছে আশ্বাস
দুর্লভ সুখের।

অভীক ॥ আর সেই সুখ যদি স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যা হয়,
শব্দ-ফেনা, পালক বা ঘূর্ণি আঁধিঝড়ের চেয়েও ?
যদি বলি নিরর্থক পাগ্‌লামি ঠিকই বলব,
নিশ্চয় কোথাও সে তো মৃতদের দেশে
যদি সে রকম কোনো দেশ থাকে।

দয়িতা ॥ না না সেখানে না,
বরং সে এক দ্বীপ পৃথিবীর জীবন যেখানে
সমূর্ধ্বে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেন সারা পৃথিবীর স্রোত
ছুটে গেছে এক উৎসে।

অভীক ॥ ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো
ও জানে তোমায় ঠিক নিয়ে যাচ্ছে মরণের মুখে,
প্রশ্ন করো, অস্বীকার করে কি না।

দয়িতা ॥ এই, সত্যি নাকি ?

পরাগ ॥ নিশ্চিত জানি না আমি, তবে এটা জানি যে আমার
বাছা-বাছা সারেঙ্ রয়েছে।

অভীক ॥ ছায়া, মায়া, মতিভ্রম
আদল-ফেরানো যত, এবং সতত রঙ্গরত
চিরন্তনী ফন্দিবাজ ওকে ভুলিয়েছে, কিংবা ওর
দৃষ্টিতে ভর করেছে,

দয়িতা ॥ ওগো তুমি, দোহাই, আমাকে
নিয়ে চলো সুনিশ্চিত কোনো দেশে, চেনা পরিবেশে ;
আমাদের দুজনের তা কি নেই জীবন যা-কিছু
দিতে পারে, দোঁহাকে দুজনে পেতে ?

পরাগ ॥ থাকা কি সম্ভব
সহযাত্রীদল এবং নাবিক ছাড়া, যারা
চোখ জুড়ে আছে আজ আর ওই বিচিত্র কলরব ?

দয়িতা ॥ কিন্তু আমি ঢেকে দেব তোমার দু-চোখ দুই কান,
যেন তুমি পাখিদের কোলাহল শুনতে না পাও
দেখতেও না পাও যেন।

পরাগ ॥ ওরা যদি নিম্নচারী হতো,
যা বলতে, করতাম, কিন্তু ওরা ঊর্ধ্বে—ঊর্ধ্বে আরো !

দয়িতা ॥ অতো ঊর্ধ্বে বলেই তো খেয়ালি আকাশবাণী ক'রে
ওরা আমাদের আশা নষ্ট করে, নির্মূলিত করে,
কেননা আমরা নই দর্পিত অথবা অনশ্বর,
স্বয়ংভর, পক্ষধর।

পরাগ ॥ অমন তো আমাদেরও প্রেম
হবে যদি মনে ধরি ওদের অক্ষয় চিত্রোপমা।

দয়িতা ॥ আমি যে রমণী, তাই আমি মরি প্রতিটি নিশ্বাসে।

অভীক ॥ ছড়াক ছড়াক পাখি, কারণ গাছটা গেছে ভেঙে
শব্দে আর নেই কোনো সহায়তা (নাবিকদের প্রতি)
চলো ঐ জাহাজটাতে, চলো
আমি তোমাদের পিছে যাই গিয়ে কেটে দিই কাছি,
এ মানুষটিকে আগে জানাই বিদায় সম্ভাষণ
কেননা আমি অথবা আর কোনো জীবিত মানুষ
তাকাতে পারব না এর মুখে আর।
(নাবিকেরা গমনোদ্যত)

পরাগ ॥ (দয়িতাকে) ওর সঙ্গে যাও,
তোমাকে আশ্রয় দেবে, নিয়ে যাবে বাড়িতে তোমাকে।

অভীক ॥ (পরাগের হাত ধরে)
এটা আমি ওর হয়ে করব—

দয়িতা ॥ না, না, এই ছুরি নাও,
দড়িটা কেটেই ফেলো, আমি পরাগের সঙ্গে যাব।

পরাগ ॥ (অর্ধ অচৈতন্য হয়ে) দু'ভাগে বিভক্ত ঝাউ শাখা,
পাখিরা ছড়িয়ে গেল একাকার, হায়! হায়! হায়!
বিদায়! বিদায়! (প্রস্থান)

দয়িতা ॥ ঝুলছে দড়িটায় উদ্যত ছুরিকা,
দু' ফালি দড়িটা, ঐ সমুদ্রে পড়েছে,
ঘূর্ণি রচে উর্মি পরে—হে অনাদি পতঙ্গ আদিম,
যে-বাসুকী পৃথিবীকে ভালোবেসে আমাদের জন্য
তুলে ধরে,
তুমি দীর্ণ, তুমি দীর্ণ হয়ে গেছো। অখিল পৃথিবী
ভেসে যায়,
আমি শুধু আমি একা সঙ্গে শুধু বল্লভ আমার,
যে আর আমাকে তার দৃষ্টি থেকে সরাতে পারে না।
কুয়াশা কুয়াশা ঢাকে অন্তরীক্ষ, তুমি আর আমি
নিরবধি একা রবো। আমরা দুজন—আর এই তো
কিরীট—

আব্‌ছা স্মরণে জাগে, যেন আমি স্বপ্নেই দেখেছি।
রাজন্‌ আমার, তুমি ঈষৎ আনত হও, কিরীট পরাই।
ওরে ও শাখা মুকুল ওরে ও পাতার মূল পাখি,
ওরে ও রূপালি মাছ দুহাতে আমার সমাহৃত
স্রোতের চলোর্মি থেকে। ওরে ও প্রভাতী শুকতারা
নীল দিগন্তের স্বর্গে যেন এক বিশদ হরিণ
বনের কুয়াশা ঘেরা কিনারায় রয়েছে দাঁড়িয়ে,
আরো নত হও, যেন চুল দিয়ে ঢেকে দিতে পারি,
কারণ আমরা আর তাকাব না পৃথিবীর দিকে।

পরাগ ॥ (দয়িতার ছড়িয়ে-পড়া চুল নিয়ে খেলা করতে করতে)
প্রিয়তমা, আমাদের চৌদিকে রচেছি যবনিকা,
রন্ধ্রহীন তন্তুজালে অন্তরীণ আমরা অক্ষয়
চিরন্তন হয়ে উঠি, বেজে ওঠে অনাহত বীণ,
মন্দ্র কেঁদে ওঠে বীণ, ধূসর পাখিরে কাছে ডাকে,
আমাদের মধ্যে লীন পিতৃপুরুষের স্বপ্ন জাগে ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ইনিস্‌ফ্রী হ্রদের দ্বীপ

যাব আজ, আমি যাব ইনিস্‌ফ্রী দ্বীপে,
গড়ব মাটি ও বাখারিতে এক ছোট্ট কুটির :
সেখানে থাকবে নয় সারি বিন, মৌচাক হবে কুঞ্জশাখায়,
মৌমাছিদের গুঞ্জনরোলে নির্জন বাস ছায়াবীথিকায়।

সেখানে হৃদয় জুড়াবে শান্তি, শান্তি ঝরবে মন্থর পায় বিন্দু বিন্দু,
বিন্দু বিন্দু ঝরে ঝিঁ ঝি গাওয়া প্রভাতের অবগুণ্ঠন থেকে,
ঝরে মাঝরাতে নম্র আলোয় এবং দুপুরে নীলাভ আভায়,
লিনেট পাখির পাখায় জড়ানো ভরা সন্ধ্যায়।

যার আজ, আমি সারাদিনরাত
শুনি তীরে লাগা হ্রদের জলের মৃদু ছল্‌ছল্‌ ;
হোক রাজপথ অথবা ধূসর পায়ে চলা পথ যেখানে দাঁড়াই
হৃদয়গহনে তারই সুর শুনি, তারই ধ্বনি পাই।

সুনীলকুমার নন্দী

দুটি গান

১

ডায়োনিসাসের মৃত্যুতীর্থে কে এক কুমারী নারী
মৃত দেবতার বক্ষে প্রহারে দৃষ্টির তরবারি ;
তার পরে সেই ছিন্ন হৃদয়
শবসাধনায় করে নেয় জয়।
অবাক্ জগৎ চমকি অমনি ধরে তার জয়গান,—
দেবতানিপাত, সে যেন বিলাস, রঙ্গের অবসান ॥

উদিবে অপর ট্রয় নিশ্চয়, আবার অস্তে যাবে ;
আবার বীরের বংশ উজাড়ি শকুনি পথ্য পাবে ;
আরো নিঃসার তৈজস তরে
ভিড়িবে আর্গো নব বন্দরে।
স্বপ্নগর্ভ আঁধারে উঠেছে অচিন ভাগ্যতারা,
সসাগরা রোম শাসনবিমুখ, আর্তিতে মৃতপারা ॥

২

ভাবনার ঘোরে ভ্রান্ত ভুবন, মানুষ দ্বিধায় দীর্ণ,
আজ অরাজক রাজপথ-মাঝে
প্রত্ন পশুর চিৎকার বাজে,
অনুকম্পায়ী ভগবান তাই গ্যালিলিতে অবতীর্ণ ॥

নাক্ষত্রিক ব্যাবিলন্ আজি কল্পতিমিরে লুপ্ত,
প্রাজ্ঞ প্লেটোর ক্ষমা নিষ্ফল,
বিফল, গ্রীসের সাধনা বিফল,
পুরাণপুরুষ নিহত যীশুর শোণিতসাগরে সুপ্ত ॥

মানুষী অর্ঘ্য নিমেষে শুকায়, শতমারী তার শ্রদ্ধা,—
উধাও করে সে প্রেমের রভসে,
দ্রষ্টা রূপের ব্যবসায়ে বসে,
দিগ্বিজয়ের পাথেয় দিতেই হৃতবিক্রম যোদ্ধা ॥

মর্তমহিমা শূন্যকুম্ভ বন্দীর আতিশয্য।
তারি মানসিক, সালরসসম,
হানে মাঝে মাঝে নিরাকৃত তম ;
নিরবলম্ব ক্ষুধায় আপন হিয়াই নরের ভোজ্য ॥

সুধীন্দ্রনাথ দ

যখন বার্ধক্য আসে

যখন বার্ধক্য আসে, পক্ব কেশ, ঘুমের শরণ
আগুনের পাশে বসে মাথা নাড়ো, সঙ্গী শুধু বই,
নেড়েচেড়ে পড়ো ধীরে, কল্পনায় ভাসে নম্র ওই
যা ছিল একদা চোখে, তার ছায়া গভীর এখন ;

অনেকেই ভালোবাসল যা তোমার লাস্যে সমুজ্জ্বল,
ছলনা অথবা তপ্ত প্রেমে ছিল সৌন্দর্যবোধন,
তীর্থযাত্রী আত্মা কিন্তু ভালোবেসেছিল একজন,
তোমার বদলানো মুখে ফুটে ওঠা বিষণ্ণ আদল ;

এবং আনত হয়ে চুল্লীটির লাল সিকাভায়,
ঈষৎ বিষাদে মিশ্র মৃদু কলধ্বনি তোলে, প্রেম
কেমনে উধাও হলো, শৈলচূড়া ক'রে অতিক্রম,
তার মুখ লুকায় নক্ষত্রমধ্যে, নক্ষত্রমেলায়।

সুনীলকুমার নন্দী

আঙ্‌রাখা

বানিয়েছিলাম গানেরই আঙ্‌রাখা
পৌরাণিকী উপাখ্যানের
নক্‌শা বুনেছিলাম ঢের
একেবারে পা থেকে বুক ঢাকা;
মুর্খেরা তা ছিনিয়ে নিল, জানো,
ঢাক পিটিয়ে পরল অসংকোচে
যেন এটা তাদেরি বানানো।
গান নিয়ে যাক নিয়েই যদি যায়,
আরো অনেক অভিনবত্ব যে
একেবারে নগ্ন হেঁটে যাওয়ায়।

সুপর্ণা সেন

রাজনীতি

'এযুগে মানবনিয়তি রাজনীতির মধ্য দিয়ে নিজেকে
প্রকাশ করে'—টমাস মান্

মেয়েটি ঐ তো, কী করে করব আমি
মনঃ সংযোজন?
কীভাবে দেব যে রোম কি রুশীয়
কিংবা স্পেনীয় রাষ্ট্রনীতিতে মন?
যদিচ এখানে জনৈক ভূয়োদর্শক এসেছেন

কী বক্তব্য জানেন বিলক্ষণ,
এবং রাষ্ট্রনীতিবিৎ বটে তিনি,
পড়েছেন ঢের করেছেন চিন্তন,
হতে পারে তিনি যা যা বলছেন ঠিক
যুদ্ধ এবং কী হবে যুদ্ধ অন্তে,
তবু আমি যদি যুবক হতাম ফের,
জড়িয়ে নিতাম মেয়েটিকে ভুজবন্ধে!

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

লিডা ও মিথুনহংস

আচম্বিতে বহে পবমান : পরাক্রমী পক্ষপুটে
অবলা বেপথুমতী, পদনখজালের সোহাগে
জঙ্ঘা তার নির্যাতিত, গ্রীবাখানি গৃহীত চঞ্চুতে,
নিরুপায় স্তনযুগ স্থির ধরে আছে বক্ষোভাগে।

কী করে এড়াবে ওর অনির্ণীত ভয়ার্ত আঙুলে
শ্লথ উরু দুটি থেকে প্রবল পক্ষল উদ্দীপন?
তাছাড়া কী করে, আশ্রিত যে সিত উত্তেজনা মূলে
তনুরুহে লভে সেই হৃদয়ের রহঃস্পন্দন?

চকিত শিহর লাগে শ্রোণিতটে তথায় জন্মায়
বিভগ্ন প্রাকার, গড়, জ্বলন্ত খিলান, কবেকার
মৃত অ্যাগামেম্নন।
এভাবে বিধৃত ব্যূহজালে
এইভাবে বাতাসের পৈশাচী রক্তের মন্ত্রণায়,
ওকি ধরেছিল সেই মহাজ্ঞান, সে-পৌরুষ তার
উদাসীন চঞ্চু ওকে পরিত্যাগ করার প্রাক্কালে?

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বাইজানসিয়াম যাত্রা

বৃদ্ধেরা অমনোনীত সেই দেশে। সেখানে যৌবন
পরস্পর বাহুবন্ধ। গান গায় পাখি তরুশাখে
নষ্টনীড় বংশধর। মেদ, মৎস্য, হিরণ্য প্লাবন,
অথবা সমুদ্র নীল ম্যাকাবেলে অবয়ব ঢেকে
জানায় মিলিত স্তুতি প্রখর নিদাঘে সর্বক্ষণ
যা কিছু নশ্বর আর প্রজননসাধ্য, জাত, তাকে।
ইন্দ্রিয়ের সেই গানে অতি তুচ্ছ যাকে মনে হয়
তারই কীর্তি-প্রজ্ঞালোকে অতিক্রান্ত হয়েছে সময়।

ব্যক্তির বয়স তাই, তুচ্ছদ্রব্য যার উপমেয়
যেন বস্ত্রপরিহিত কৃশকাষ্ঠ। অবশ্য যদি না
প্রতি তুচ্ছ পদার্থের যা কিছু নশ্বর পরিধেয়
তারই জন্য কৃতাঞ্জলি আত্মা সাধে তীব্র মনোবীণা।
অথচ স্বরের দীক্ষা অসম্ভব। শুধু জানি জ্ঞেয়
তারই কীর্তিস্তম্ভের গরিমা।
অতঃপর সেইজন্যে পাড়ি দিয়ে সমুদ্রের বুকে
বাইজানসিয়ামে আমি পুণ্যধাম পেয়েছি সম্মুখে।

যে তুমি দাঁড়িয়ে আছো ঈশ্বরের অগ্নিপরিধির
মাঝখানে, হে আর্যন্, হিরণ্ময় দেয়ালে বর্ণিত
ঐ পুণ্য প্রজ্বলতা ছেড়ে এসে বৃত্তে বাঁধো নীড়
আমার আত্মাকে করো ধ্রুপদে দীক্ষিত।
ভক্ষ্য হোক এ হৃদয়। কামরুগ্ন, মুমূর্ষু প্রাণীর
ক্লিন্ন আবেষ্টন যার শরীরে বিধৃত।
জানে না আত্মীয় উৎস। অতএব অনতিগোচরে
নিয়ে চলো আমাকে সে রূপদক্ষ সীমার উত্তরে।

যদি একবার আমি ছেড়ে আসি প্রাকৃতনির্মোক
রূপের সন্ধানে আর ফিরিব না পদার্থ জগতে

মেনে নেব সে আধার গ্রীক-শিল্পী যার সংগঠক
নিপিষ্ট স্বর্ণের বক্ষে কারুকর্মশোভিত সম্পদে
তন্দ্রালস নৃপতিকে দেব সদাজাগ্রত আলোক,
সুবর্ণশাখায় বসে কণ্ঠ ঢেলে দেব যে ধ্রুপদে
বাইজানসিয়াম-বাসী তার শ্রোতৃবৃন্দ অভিজাত
বুঝিবে আমার কণ্ঠে ব্যক্ত গত, অধুনা, অজ্ঞাত।

দেবতোষ বসু

পৌর চিত্রশালা পুনঃপ্রদক্ষিণ

১

আমাকে বেষ্টন করে প্রতিবিম্ব ত্রিশ বছরের :
ওৎ পেতে উদ্যত সেনা ; দীর্ঘকায় তীর্থঙ্করদল ;
আদালতে কেসমেণ্ট চতুর্দিকে প্রহরীর ঘের
গরাদে অর্ধেক ঢাকা ; দেখে গর্বী গ্রিফিথ্ পাগল ;
কেভিন ও' হিগিনসের মুখচ্ছবি যেন মুখোশের
সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নম্র, অথচ সে লুকাতে বিফল
স্থিতি কিংবা অনুতাপে অপারগ আপন আত্মাকে ;
বিদ্রোহীদলের সেনা নতজানু আশীর্বাদ মাগে ;

২

ত্রিবর্ণলাঞ্ছনে দেয় মঠপতি বা কোনো যাজক
বরাভয় মুদ্রায় আশিস।   বলি 'নয় এ আমার
যৌবনের মৃত আয়ার্ল্যাণ্ড, উৎফুল্ল ও ভয়ানক
কবিকল্পনায় জাত অন্যদেশ এ দেশ আমার।'
সহসা দাঁড়াই থমকে, রমণীর চিত্র দেখি এক
ভেনিসনন্দিনী যেন বিনম্র সে সুন্দরীতমার।
শিল্পীর অঙ্কনকক্ষে তার সঙ্গে দেখাশোনা হয়
পঞ্চাশ বছর আগে মাত্র কুড়ি মিনিট সময়।

৩

আবেগে হৃদয়বিদ্ধ মূর্ছাপন্ন চেতনা হারাই ;
হৃদয় উন্মুদ্র হয় যদিচ মুদ্রিত দুটি চোখ ;
যেদিকে তাকাই দেখি চারিদিকে শুধু দেখতে পাই
আমারই বহুল চিত্র দুল্যমান নিত্য ও ক্ষণিক :
অগাস্টা গ্রেগ্‌রির পুত্র ; আর তাঁর ভগ্নীর তনয়,
হিউ লেন, যিনি এই সমস্তের 'একক জনক' ;
হ্যাজেল লাভেরি, তার মৃত্যু ও জীবন, সে কাহিনী
চারণকবির গাওয়া পাঁচালির সঙ্গে তুলনীয়।

৪

মাক্কিনি অঙ্কিত এই অগাস্টা গ্রেগ রির প্রতিকৃতি
সীঞ্জের মতানুযায়ী 'রেমব্রাঁর পরে মহত্তম' ;
উচ্ছ্বসিত মহীয়ান সে বিষয়ে নেই অনিশ্চিতি ;
কিন্তু সে তুলিকা কই যার স্পর্শ ফোটাতে সক্ষম
সমস্ত মহিমা তাঁর আর তাঁর সমস্ত বিনতি ?
বিষাদে নিমগ্ন হই, ভাবি হয়তো কালের নিয়ম
জন্ম দেবে নরনারী অতঃপর সম্মত নক্সায়
সক্ষম হবে না কিন্তু অনুরূপ উৎকর্ষ আনায়।

৫

এ মধ্যযুগীয় জানু নতপ্রায় স্বাস্থ্যের অভাবে,
কিন্তু এ নারীর কাছে, তাঁর গৃহস্থালিতে সংসারে
মানীর সম্মান ছিল, অভাব পূরণ হতো লাভে।
অপুত্রক, তবুও ভেবেছি আমি, 'সন্ততি আমার
সেই গৃহে পাবে যাহা মৌলিক গভীর', লুপ্ত হবে
ভাবিনি তা, লুপ্ত হলে অশ্রুজলে করিনি তর্পণ ;
ভালুকে মার্জিত গুহা নোংরা করে শৃগাল কখনো !

৬

(এ চিত্রকল্পের উৎস লোকভাষা এবং স্পেনসার)।
ছিলাম একমত সীঙ্গ, আমি আর অগাস্টা গ্রেগরি
আমাদের সর্ব কর্ম চিন্তা গান পাবে মৃত্তিকার
আবশ্যিক স্পর্শ, আর সেই স্পর্শ থেকে পতঙ্গেরই
সূক্ষ্মশুঁড়সম নেবে ক্রমাগত সামর্থ্য অপার।
শুধু আমরা তিনজন একালে পরীক্ষা সব করি
একমাত্র মানদণ্ডে এইমাত্র নিকষ পাথরে,
যেই স্বপ্ন ভিখারি ও বর্ণশ্রেষ্ঠ অভিজাত স্মরে।

৭

আর এই জন্ সীঙ্গ, মেদিনী-নিহিত তাঁর মূল,
'বিস্মৃত মানবভাষা', সেই মুখ গভীর গম্ভীর।
আমাকে যাচাই যারা করতে চাও, হবে না নির্ভুল
এ বই ও বই দেখে, এসো এই পবিত্র মন্দির—
আমার বান্ধবদের প্রতিকৃতি দেখো গে দোদুল ;
আয়ারের ইতিবৃত্ত চোখে-মুখে খোঁজো গে নিবিড় ;
ভাবো, কোন উৎসে আদি অন্ত মানে লোকের গৌরব,
বলো, এরা বন্ধু ছিল, এইমাত্র আমার বৈভব ॥

অশ্রুকুমার সিকদার

ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার

পরীর পরিহাস

"জানালা খুলিয়া তাকাবে না কিগো মিসেস্ জিল্?"
বাগান হইতে মাথা দুলাইয়া কহিল পরী ;
"জানালা খুলিয়া তাকাতে পারো না, মিসেস্ জিল্?"
কহিল সে পরী স্নিগ্ধ হাসিতে বাগান ভরি।

বাতাস নিথর, চেরীশাখাগুলি কাঁপানো আর,
জানালার নিচে লতা-ঝোপ তার থির নিসাড়,
জানালা-বাহিরে তাকাল না ফিরে মিসেস্ জিল,
বাগান ভরিয়া পরিহাস রাখি গেল সে পরী।

"কী করেছে ওরা, কী করেছে হায় মিসেস জিল্ ?"
ফুলবনে চাহি উজ্জ্বল চোখে কহিল পরী।
"কোথায় তোমারে লুকায়ে রেখেছে মিসেস্ জিল্ ?"
মেঘের মতন লঘু পায়ে নাচি কহিল পরী।

রাতের চাদরে ঢেকে গেল ধীরে পাহাড়তল,
কালো কারখানা, উপরে উজল তারার দল,
হিমেল কুটিরে, সাড়া নাহি দিল মিসেস্ জিল্,
বাগান ভরিয়া চপল চরণে নাচিল পরী।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রতিধ্বনি

'কে ডাকে ?' বললাম যেই, সে শব্দ আমার
বনানীর ফাঁকে,
এখানে ওখানে যত বিহঙ্গ জাগাল—
—'কে ডাকে ? কে ডাকে ?'

গাছের পাতারা সেই শব্দ আওড়াল,
রৌদ্রে স্পন্দমান,
গাঢ় হাওয়া ভাসাল সে স্বর,
মূর্ছার সমান।

ছায়ায়, সবুজে আর স্তব্ধ ঝোপেঝাড়ে
চোখেরা উৎসুক,

তারা বলল আমি যা বললাম—
যেন কী কৌতুক।

রুদ্ধকণ্ঠে বলি—'কেউ নয়?'
হাওয়া পড়ে এলো :
স্তব্ধতায় 'কেউ নয়? কেউ নয়?'
কাঁদে এলোমেলো।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

এডোয়ার্ড টমাস

অ্যাড্‌ল্‌স্ট্রপ

হ্যাঁ। আবছা মনে পড়ে অ্যাড্‌ল্‌স্ট্রপ—
অদ্ভুত নাম। আচমকা এক্‌স্‌প্রেস
থেমে পড়ল হঠাৎ দুপুরবেলা,
গ্রীষ্ম দুপুর। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ।

বাষ্প ফোঁসে। ঝাড়ল কি কেউ গলা।
নামল না কেউ, উঠল না কেউ; ধূ-ধূ
লম্বা শোয়া একলা প্ল্যাটফর্ম,
তারই প্রান্তে লেখা শুধু-শুধু
—অ্যাড্‌ল্‌স্ট্রপ।

উঁচু আকাশ। আকাশে ক্ষীণ মেঘ,
সুন্দর মেঘ, নির্জন মেঘ; নিচে
ঠায়-দাঁড়ানো শুকনো খড়ের গাদা,
উইলো কটা, ঘাস, কত কী-যে।

মাঠের মধ্যে ডেকে উঠল পাখি
সেই মুহূর্তে, হঠাৎ গেল শোনা।
গলা মেলায়, পাখি কালোপাখি
ছিল যত পরগণা-পরগণা
—না মেলাতে স্বর।

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডি. এইচ. লরেন্স

মাত্র এই চাই

যখন আমার হৃদয়ে একজন মহিলার জন্য মধুর আকাঙ্ক্ষা জাগে,
আমি শুধু এটুকু চাই যে আমার কাছে সে নম্র হয়ে আসুক
আর আমাদের দুজনের মধ্যের অশ্রুত ঘণ্টাধ্বনির মতো
শান্ত, কোমল কম্পন জেগে থাক।
আর-কিছু চাই না।
যাদের মধ্যে ভালোবাসার কণামাত্র নেই,
সেই সব ভয়ংকরী রমণীর শাসনে আর ভালোবাসার দাবিতে
আমি ক্লান্ত, ক্লান্ত।

অরবিন্দ গুহ

ভালোবাসার চেষ্টা

মানুষকে ভালোবাসার ব্যর্থ চেষ্টায়
আমি জীর্ণ।

এখন আমি সাব্যস্ত করেছি
আমি কাউকে ভালোবাসি না, আমি কাউকে ভালোবাসব না,
এ-সম্পর্কে কোনো মিথ্যা উচ্চারণ করব না
এবং এই শেষ কথা।

কোথাও যদি কোনো মানুষ কিংবা মানুষী থাকে
যাকে আমি সত্যি-সত্যি পছন্দ করতে পারি,
আমার পক্ষে সেই যথেষ্ট।

আমার হৃদয়ে যিনি সাড়া জাগিয়েছিলেন
সেই মহিলা যদি কোনো যাদুমন্ত্রে চলে আসতেন
তাকে নিয়ে আর আমার উষ্ণ হৃদয়কে নিয়ে আমি আনন্দিত হতাম
যতক্ষণ পর্যন্ত সব কিছু কথায়-কথায় শূন্য হয়ে না যেত।

অরবিন্দ গুহ

পাখির গুঞ্জন

আমি কল্পনা করতে পারি, আদিম মূক আরেক জগতে,
সুদূর অতীতের সেই বিশাল ভয়ংকর স্তব্ধতায়,
কেবল নিশ্বাসের কষ্ট আর গুঞ্জনধ্বনি,
ছোটো পাখিরা দ্রুতছন্দে পথে-পথে ঘুরে বেড়াত।

প্রাণের অস্তিত্বের আগে,
জীবন যখন ছিল প্রক্ষিপ্ত পদার্থ, অর্ধ-অচেতন,
এই ছোটো পাখি খণ্ডে-খণ্ডে দীপ্তি নিয়ে এসেছে,
অলস, বিশাল, রসাল ডালপালার মধ্য দিয়ে শনশন শব্দে চলে গেছে।

আমার বিশ্বাস তখন কোথাও ফুল ছিল না,
সেই পৃথিবীতে সৃষ্টির প্রারম্ভে এই পাখি সহসা বেরিয়ে এসেছে।
আমার বিশ্বাস লম্বা ঠোঁটে সে শান্ত উদ্ভিদশিরা বিদীর্ণ করেছে।

হয়তো সে বৃহৎ ছিল
যেমন শ্যাওলা, টিকটিকি, লোকে বলে, এককালে বৃহৎ ছিল।
হয়তো সে ছিল হিংস্র, ভয়ংকর দানব।

কালের লম্বা দূরবীনের উল্টো দিক দিয়ে তাকে আমরা দেখি, আমাদের সৌভাগ্য।

অরবিন্দ গুহ

সীগ্‌ফ্রিড সস্থুন

স্বপ্নপ্রয়াণ

চেয়ে দেখেছিলে আমাকে নিবিড় সুখে,
বিচ্ছেদে আজ খেদ, ক্ষতি নেই তাই;
যেখানেই থাকো, সেখানে, দীপ্র মুখে
স্বপ্নকে দিও আঁধার শয়নে ঠাঁই॥

ঘুমে বুজে আসে তোমার তরল আঁখি,
বিবশ রসনা মানে না তথাপি মানা;
মিলনে যে-কটি কথা রয়ে গেল বাকি,
অবাধ হয়েছে বিরহে তাদের হানা॥

ঘুমাও, ঘুমাও, আরামে ঘুমাও তবে,
আমার আশিসে তোমার শিয়র পূত;
সংবৃত তুমি অধুনা যে-গৌরবে,
আমি সে-রহসে নিয়ত আবির্ভূত॥

কৃপণ গানের অমৃত সঞ্চয়নে
ব্যক্ত তোমার অনুপম পরিচিতি;
বাসা বেঁধেছিলে আজ যে আলিঙ্গনে,
তাতে বার বার ফেরাবে তোমাকে স্মৃতি॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

রুপার্ট ব্রুক

মৃত্যুর পরে

নয়নের মণিপদ্মে দৃষ্টি-মধু যবে নাহি রবে,
সব আলো নিভে যাবে, রুদ্ধ হবে চেতনা-তোরণ ;
কর্ণে কোনো কলকণ্ঠ পশিবে না—বসন্ত উৎসবে
নৃত্যপরা যুবতীর সনূপুর চারু-বিচরণ ;
যেথা হতে বিকাশিল—সেই শূন্যে হবে অপলাপ
জলধনু আর সে গোলাপ !—
সে অনন্ত কালে তবু রহে যেন একটুকু ঠাঁই
মেলিয়া ধরিতে মোর মৃদুগন্ধ স্মৃতি সবকটি—
নীলাকাশ, ফুল, গান, মুখগুলি যেন না হারাই !
বসিয়া গণিব সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে উলটি-পালটি
মধুর ভাবনাভরে ; যথা দীর্ঘ দীপ্ত দিনমান
শিশুদের খেলা হেরি, সন্ধ্যালোকে একেলা জননী
কর্মক্লান্ত কর দুটি গুটাইয়া, বিমুগ্ধ-নয়ান,
চেয়ে থাকে শিশুদের সুপ্তমুখে— আমিও তেমনি !

মোহিতলাল মজুমদার

এডিথ সিটওয়েল

দীপ হাতে সুকুমারী

কোনো দুরাত্মা নেই গোলাপের গূঢ় অভ্যন্তরে,
কালো জটেবুড়ি শুধু সন্দেহ করে
সব মিছে, ভ্রমাতুর ।

ও অপ্রতিম রূপের প্রদীপ হাতে
যে চলেছে হোথা, বিদায়ী মূর্ছনাতে,
সে চলে দূরাতিদূর ।

সেই রমণীর বিদায়ক্ষণের প্রজ্ঞার পারমিতা
ভয়ানক বিষনজরে দেখেছে কালো সে-জটেবুড়িটা,
ফুঁসেছে শঙ্খচূড়!

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জনৈকা বর্ষীয়সী

সূর্যের আলোয় আছি, আমি এক বর্ষীয়সী নারী,
প্রতীক্ষায় থাকি পথিকের, আমার সে তুলে-ধরা
মুখে আছে স্মরণীয় দিবসের সমস্ত মহিমা,
আদিম সে মৃত্তিকার পবিত্র গরিমা
যে জেনেছে মহাবান, স্বর্গ-অবজ্ঞার ফলে
শুষ্কতার সমস্ত অসুখে, সূর্য তার একক প্রেমিক।

কেননা সূর্যই হলো পৃথিবীর প্রথম প্রণয়ী,
সে দেয় আশিস সকল বিনীত জীবে, প্রাণদ সে,
আয়ুর অন্তিমক্ষণে, কর্মসমাধায়
শুচি আর অশুচিকে, মাটিতে নিহিত ধাতু, এবং যে দীপ্তি
দ্বিতীয় সূর্যের মতো বাস করে মানবহিয়ায়।

সংসারে হয়েছে অন্ধ, উত্তোলিত সে মুখে যখন
তরুণ আলোর ঝরনা গভীর নদীর মতো ধারা
উচ্ছল তরল নেমে শান্তির মতন শায়ী,
নশ্বর ও দরিদ্রের ছদ্মবেশে শাশ্বত তখন
সে আশায় করেছে গ্রহণ—
উদ্ভাসিত করে দেয় শয্যা ছেড়ে এইমাত্র-ওঠা
নবীন প্রণয়ীযুগ্মে, প্রবীণ কামুকে, স্বর্ণ ছড়ায়
একই সঙ্গে ভিক্ষুকের প্রত্যাশাবিহীন পথে,
কৃপণের হৃদয়ের অন্ধকারে।

বক্রতা-কুটিল ছায়া আলো করে সরল তাহারে,
সংকীর্ণ প্রদেশ সব ফিরে পায় সামর্থ্য তাদের—
হৃদয়ের মরুক্ষেত্র, বন্ধ্যা ইন্দ্রপুরী, আর অনুর্বর গিরি
ভুলে যায় তারা যে শীতল।
মানুষের হাতে-গড়া যে সব পরিখা করে মানুষে পৃথক
মতের ভাষার, সকলই ভরাট হয়, আলোক অপাপবিদ্ধ
পুনশ্চ নির্মাণ করে শুভতায় নর বস্তু সমস্ত জগৎ।

শৃগালে দিলেন যিনি পশমের সোনালি আশিস
কিংবা যিনি ঘন পক্ক স্বর্ণশ্মশ্রুবান
গ্রহদের মতো, পৃথিবীর আবরণ শস্যের সুবর্ণ শিষে
জোগালেন জগতের পবিত্র আহার, মৃণ্ময়ী শরীরে পাই তারই আশীর্বাদ :
আমি যে সামান্যা নারী পূষণের তাতে কিছু আসে না যায় না,
আনন্দিত তার কাছে আমার বাহুর যত শিরা ও ধমনী
সেবাব্রতী হাতের কুঞ্চন, সকলই পবিত্র অতি
যেমন পবিত্র শাখা, কৃষিকর্মে-চিহ্নিত মেদিনী·· তার কাছে
এক সূত্রে গাঁথা, পৃথিবীর তাপ আর হৃদয়স্পন্দন,—
ধরণীর উৎস থেকে যেই প্রেম পেয়েছে উদ্ধার,
ঊর্ধ্ববাসী স্বর্ণময়ে সে রাখে নির্দিষ্ট পথে স্থান যেথা যার,
গতিতে চঞ্চল রাখে পশুর রক্তের ধারা হৃদয়স্পন্দন,—
সে ব্যতীত ধূমকেতু, সূর্য বা উদ্ভিদ, যাবতীয় জীবিত জগৎ
পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপ হিম হয়ে যাবে।
আমি শুদ্ধাচারী কিনা পূষণের তাতে কিছু যায় বা আসে না,
তার কাছে, আমার নশ্বর বেশ
পবিত্র ও অঙ্গ বসুধার ; আমার ঐশ্বর্য, ধাতু,
কলঙ্ক বা শস্যের ভাণ্ডার, সব নিয়ে একখণ্ড আমি পৃথিবীর
—তারই 'পরে জ্বলে সূর্য সিদ্ধিদাতা, হৃদয় আমার।

যদিও হারায় দৌড়ে দ্রুতগামী দৌড়বীর জ্যোতির্ময় ধূলি,
একদা ছিলাম আমি স্বর্ণময়ী, নন্দনের পারিজাতবনে

ভ্রমণে নিরত যারা তাদেরই মতন ; আজ একান্ত জরতী,
আগুন জ্বালিয়ে বসে নিরুপায় মুখে দেখি ঠাণ্ডা হয় জ্যোতি,
—গ্রাম্য বিধিলিপি হলো গৃহস্থালি, তাই দিয়ে ভাগ্য জাল বোনে।
অথচ তবুও সূর্য ভালোবাসে আমাকে এখনো, পৃথিবীর
অঙ্গ তবু আমি। সায়াহ্নে যখন কর্মীদল গৃহকোণে ফেরে,
উদ্‌ভ্রান্ত পথিক ফেরে গৃহচ্ছায়া, ফিরে যায় ঘরে মৃতশিশু,
অজাত সন্তান ফেরে, মার গর্ভে যে কখনো হলো না সম্ভব
মাতৃবক্ষে ঘরে ফেরে সেও, তখন একাকী আমি দেখি বসে
অগ্নির স্বর্ণবীজ মূর্ছায় মরণে, জলপাত্রে জল ফোটে
মধুর যে শব্দ হয় মনে হয় মধুচক্রে মধুপগুঞ্জন :
আমার পথিক ফিরবে বিশ্রামের গৃহে, আমি তারই প্রতীক্ষায়—
ধূলিতে সর্বাঙ্গ তার আচ্ছন্ন ধূসর, যেন সে কর্মিষ্ঠ ছিল
কোনো সুখী সচ্ছল বাগানে, অথবা পবিত্রপূত কৃষিক্ষেত্রে
মানুষের রুচিপুষ্টি নির্জনে নির্মিত হয় শান্তিতে যেখানে।
আমার ঘুমন্ত শিশু, বড়ো ছোটো, ধরব তাকে বুকের ছায়ায়,
মৃত সে, আমার কাছে রূপান্তরহীন,—যেন সান্ত্বনাদায়িনী
শস্যমাতা বসুন্ধরা, যে জন ফেরে না আমি তাহার সেবিকা।

বিচক্ষণ বসুন্ধরা, সৌভাগ্য ও শোকে দেয় সমান সান্ত্বনা
স্বর্ণ নায়কবৃন্দে দর্পিত যাদের দেখি তরঙ্গের মতো বড়ো ধনী,—
তাদের কবরে আর তাদেরো আশ্রয় দেয় মহতী ধরণী,
বসুধার গল্প মহীয়ান।
যদিও নিঃশব্দে ঝরে হিমকরকার মতো কুঞ্চনের রেখা
অনেক স্বর্ণিল গালে, মতবাদ হারায় বার্ধক্যে বল;
মানে রূপান্তর ;—অথচ হৃদয়, সেই সূর্য,
বেঁচে থাকে পরাজিত করে যত প্রেতাতঙ্ক আদিম রাত্রির :
পৃথিবীর জরোত্তাপ জলে, জ্যোতিষ্মান হয়, তারপর একান্ত শীতল,
অথচ নক্ষত্রগ্রহ, প্রেমমগ্ন যুবকযুবতী দীপ্ত হয় জ্যোতি দেয়,
স্বর্ণ প্রেমিকদল পবিত্র সে ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ
শ্মশ্রুবন্ত গোত্রপিতা সূর্যদেব সর্বজীবজনক যেখানে

ফলকথা নির্ঘোষে রটায়; এবং শিশিরসিক্ত উদ্ভাসিত বিশ্বলোক গায়
অবনীর, মানুষের, পশু ও শস্যের আন্দোলিত শৈশবশয্যায়,
যা দোলে শান্তিতে মগ্ন ঈশ্বরের মনে। আর আমি, প্রাকৃপুরাণিক মাটি
যে জেনেছে পৃথিবীর দুঃখ শোক, নবান্নের মুখ,
মানুষের অন্ধকার বীজ-কাল দেখে আমি এনেছি আশিস,
পূত জ্যোতিধারার মতন সর্বজনে ক্ষমা করি, করি আশীর্বাদ ॥

অশ্রুকুমার সিকদার

টি. এস. এলিয়ট

পূর্বরঙ্গ

[১]

পথে-যেতে পাওয়া মাংসের ঘ্রাণে
শীতের সন্ধ্যা সন্নিহিত।
ছ'টি ঘণ্টার ধ্বনিতে দিনের
ভস্মাবশেষ নির্বাপিত।
এবং সহসা ঝোড়োবর্ষণে
রুগ্ন ও ম্লান ছিন্নপত্র
এলোমেলো জমে তোমার চরণে
মৃতখবরের পাংশু ছত্র।
জলধারাপাত আঘাতে কাঁপায়
ভগ্ন শার্সী ও ধূমনালী।
রাস্তায় ঘোড়া পাকুটে হাঁপায়
আলো জেলে দেয় গৃহস্থালী।

[২]

এলো ভোর স্বস্থ চেতনায়
অস্পষ্ট মদের বাসি ঘ্রাণে।

যেন কীর্ণ কয়লাতের গুঁড়ো
রাস্তা থেকে মেখে এলো পায়ে
সকালের স্পন্দিত চাঘর।
ছদ্মবেশী অভিসারে ধৃত
সময়ের যা কিছু উদ্ধার
সঙ্গে আনে ম্লান বাহু, যার
উত্তোলনে যবনিকাবৃত
সুসজ্জিত ঘরের সম্ভারে।

[৩]
আবরণ ফেলে দিয়ে দূরে
নিতম্বে শয়ান বরতনু।
প্রতীক্ষায় তন্দ্রালস, রাত্রির দর্পণে
ফোটে লক্ষ চিত্রিত বীজাণু।
তোমার আত্মাকে তারা গড়ে
ছড়ায় অস্থিরপ্রভা ঘরে।
পৃথিবীর পুনরাগমনে
আসে আলো নিঃশব্দচরণ
বদ্ধ জলপ্রণালীতে চড়াইএর ধ্বনি
দৃশ্যকাব্য রচে পথে পথে।
পথে তার নেই কোনো মানে।
বিছানার প্রান্তঘেঁষা শিথিল শয়ানে
কুঞ্চিত অলক নিয়ে খেলা করো তুমি,
অথবা তোমার ম্লান বাহুর অতলে
চেপে ধরো বিবর্ণ গোড়ালি।

[৪]
আকাশের নীলে তোমার আত্মার ঋজু বিস্তার
বদ্ধ নগরীর পিছনে অপস্রিয়মাণ।
অথবা অবিচ্ছিন্ন পদভারে পিষ্ট

চারটে, পাঁচটা অথবা ছ'টায়।
এবং হ্রস্ব শরীরের ধূমপ্রজ্বলন
পত্রসেবী সন্ধ্যা আর মদিরেক্ষণ
কোনো নিশ্চয়ে নিশ্চিত,
অন্ধকার রাস্তার বিবেক
পৃথিবীকে সিদ্ধান্তে আনতে অস্থির।

এই সব বক্র ভ্রান্তিবিলাস আমাকে ক্লান্ত করে
যা বিবিধ ভাবচ্ছবির আশ্রয় ও আগাছা
সর্বতোভদ্র কোনো আদর্শের অপ্রমেয় দুঃখবহন।

হাত দিয়ে মুছে নাও মুখ, হাসো ;
প্রাচীন বুড়ির মতো ঘূর্ণ্যমান এ-পৃথিবী
অর্থহীন ইন্ধনের সঞ্চয়ে তৎপর।

দেবতোষ বসু

তীর্থযাত্রী

কন্‌কনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা,
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সবচেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে দুর্জয় শীত।
ঘাড়ে-ক্ষত পায়ে-ব্যথা মেজাজ-চড়া উটগুলো
শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা-বরফে।
মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে
যখন মনে পড়ে পাহাড়তলিতে বসন্তমঞ্জিল, তার চাতাল ;
আর শরবতের পেয়ালা হাতে রেশমি সাজে যুবতীর দল।
এদিকে উটওয়ালা গাল পাড়ে, গন্‌গন্ করে রাগে,
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে।
মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না।

নগরে যাই; সেখানে বৈরিতা; নগরীতে সন্দেহ;
গ্রামগুলো নোংরা, তারা চড়া দাম হাঁকে।
কঠিন মুশকিল।
শেষে ঠাওরালেম, চলব সারারাত
মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে,
আর কানে কানে কেউ-বা গান গাবে—
এ সমস্তই পাগলামি ॥

ভোরের দিকে এলেম যেখানে মিঠে শীতে সেই পাহাড়ের খদে,
সেখানে বরফসীমার নিচেটা ভিজে-ভিজে, ঘন গাছগাছালির গন্ধ।
নদী চলেছে ছুটে, জলযন্ত্রের চাকা আঁধারকে মারছে চাপড়।
দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে।
বুড়ো শাদা ঘোড়াটা মাঠ বেয়ে দৌড় দিয়েছে।
পৌঁছলেম শরাবখানায়, তার কপাটের মাথায় আঙুরলতা।
দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে,
পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো।
কোনো খবরই মিলল না সেখানে,
চললেম আরো আগে।
যেতে যেতে সন্ধে হলো;
সময় পেরিয়ে যায় যায়, তখন খুঁজে পেলাম জায়গাটা।
বলা যেতে পারে, ব্যাপারটা তৃপ্তিজনক ॥

মনে পড়ে এসব ঘটেছে অনেক কাল আগে,
আবার ঘটে যেন এই ইচ্ছে, কিন্তু লিখে রাখো,
এই লিখে রাখো,—এতো দূরে যে আমাদের টেনে নিয়েছিল
সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর।
জন্ম একটা হয়েছিল বটে,
প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই।
এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও,—
মনে ভাবতেম তারা এক নয়।

কিন্তু এই যে জন্ম এ বড়ো কঠোর,
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।
এলেম ফিরে আপন আপন দেশে, এই আমাদের রাজত্বগুলোয়।
আর কিন্তু স্বস্তি নেই সেই পুরোনো বিধিবিধানে
যার মধ্যে আছে সব অনাত্মীয় আপন দেবদেবী আঁকড়ে ধরে।
আর-একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাঁপা মানুষ

১

আমরা সব ফাঁপা মানুষ
আমরা সব ঠাসা মানুষ
ঠেস দিয়ে এ ওর গায়ে
মাথার খুলি খড়ে ঠুসে! হায় রে!
যখন ফিসফিসিয়ে আলাপ করি
আমাদের শুকনো গলা শোনায়
চাপা অর্থহীন
যেন শুকনো ঘাসে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস
কিংবা যেন আমাদের সরাবখানার ফাঁকা ভাঁড়ারে
ভাঙা কাঁচের উপর ইঁদুরের আনাগোনা

রূপহীন কিম্নাকার, বর্ণবিহীন ছায়া
পক্ষাঘাতগ্রস্ত বেগ, অঙ্গভঙ্গি নিশ্চল;

যারা পার হয়
প্রত্যক্ষ নয়নে যারা মরণের পরপারে যায় অলকায়
তারা আমাদের মনে রাখে—যদি রাখে
মনে রাখে শুধু

ফাঁপা মানুষ
ফাঁপা মানুষ ব'লে।

২

স্বপ্নেও সে চোখগুলির চোখাচোখি সয় নাকো
মরণের স্বপ্ন অলকায়
তারা আসে নাকো :
সেখানে সে চোখগুলি নিস্পলক জাগে
খর রৌদ্র যেন ভাঙা মর্মরের স্তম্ভের গায়ে
সেখানে একটা গাছ অবিশ্রাম দোলে
আর কণ্ঠস্বরগুলি মনে হয়
বাতাসের করতালে খোলে
নিভন্ত নক্ষত্রের চেয়ে
আরো দূর আরো গম্ভীর-তন্ময়।

চাই না আর যেন যাই না আরো কাছে
মরণের স্বপ্ন অলকায়
আমিও যেন পরতে পাই বেছে বেছে
ছদ্মবেশ
ইঁদুরের জামেআর, পরচুলা কাকের পালক
কাকতাড়ুয়ার লাঠি আড়াআড়ি হাতে
পোড়ো ক্ষেতে
কাজ—যা করায় হাওয়াতে
আরো কাছে নয়

সে চরম সম্মিলন নয়
সন্ধ্যা অলকায়।

৩

এই তো শ্মশানদেশ
ফণিমনসার দেশ

পাষাণের মূর্তিগুলি
এখানে স্থাপিত এই, এখানে তারা পায়
মৃতের হাতের কাতর মিনতি
নিভন্ত নক্ষত্রের জলে ওঠায়।

সে কি এমনিতর
মরণের সেই অলকায়
সঙ্গীহীন জেগে উঠে
যখন মাধুর্যে বিধুর কাঁপি থর থর
ওষ্ঠাধর চুম্বনে উদ্যত
আচম্বিতে ভাষা পায় প্রার্থনায় ভাঙা পাষাণের পায়ে লুটে

৪

এখানে সে চোখগুলি নেই
কোনো চোখই নেই
এই ম্রিয়মাণ নক্ষত্রের উপত্যকায়
এই শূন্য উপত্যকায়
আমাদের এই ভ্রষ্ট রাজ্যের ভগ্ন জহ্নু-জানুতে
সম্মিলনের এই শেষ মেলায়
আমরা সব হাৎড়ে হাৎড়ে মরি
আর আলাপের মুখ চেপে ধরি
জড়ো হয়েছি সবাই
শোথস্ফীত এ-নদীর বালুকাবেলায়

•

দৃষ্টিহীন, যদি না
সেই চোখগুলি আবার ফিরে আসে
ধ্রুবতারা যেন আকাশে
শতদল স্বর্ণ কমল
মরণের সন্ধ্যা অলকায়

ফাঁকা মানুষের
একটিমাত্র আশা।

৫
ইকড়ি মিকড়ি চামচিকড়ি
কাঁকড়ার দল চলে
ইকড়ি মিকড়ি চামচিকড়ি
মাকড়সা দেয়ালে
ইকড়ি মিকড়ি চিম্‌সে পাখা
চামচিকেরা মেলে
শ্যাওড়া-কাঁটায় ভোর চারটেয়
ছেলেরা সব খেলে।

প্রত্যয় আর প্রত্যক্ষের মধ্যে
প্রবৃত্তি আর কার্যের মধ্যে
পড়ে কালছায়া
প্রভু তোমারই তো সব মায়া
ধারণা আর সৃষ্টির মধ্যে
আবেগ আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে
পড়ে কালছায়া
এ জীবন দীর্ঘ অফুরান

বাসনা আর তৃপ্তির মধ্যে
বীজ আর সত্তার মধ্যে
তত্ত্ব আর অবতারের মধ্যে
পড়ে কালছায়া
প্রভু তোমারই তো সব মায়া
প্রভু তোমারই
এ জীবন
প্রভু তোমারই তো এই

এই চালে ভাই তুনিয়ার শেষ
এই চালে ভাই তুনিয়ার শেষ
এই চালে ভাই তুনিয়ার শেষ
হাঁক দিয়ে নয়, কাৎরানিতেই ॥

বিষ্ণু দে

লাফিয়ে উঠল হাওয়া

চারটে নাগাদ লাফিয়ে উঠল হাওয়া
লাফিয়ে উঠল, ভাঙল ঘণ্টাঘড়ি
জন্ম-মরণে দোদুল্যমান হাওয়া।
হেথা, মরণের স্বপ্নরাজধানীতে
অন্ধ দ্বন্দ্বে জেগেছে প্রতিধ্বনি
একি স্বপ্ন কিংবা অন্য কিছুই হবে
কালো নদীটার রূপে মনে হয় যবে
অশ্রুর ঘামে ভিজা সে কারো বা মুখ?
দেখেছি সে কালো নদীর অপর পারে
ছাউনি আগুন নাচায় বর্শা কত
হেথা মরণের অপর নদীর পারে
তাতার সওয়ার নাচায় বর্শা যত ॥

বিষ্ণু দে

দি ড্রাই স্যালভেজেস

১

দেবতার কথা আমি জানি না বিশেষ। শুধু যেন মনে হয় এই
নদী এক সমর্থ ধূমল দেব, অনম্য, অনাব্য, ক্রূর।
কিছু দূর সহ্য করে সব, প্রথমে তো মনে হয় সীমাপট;
উপযোগী, কিন্তু নির্ভরতাহীন বাণিজ্যবাহিনী;
তার পরে একমাত্র দুরূহতা দেখা দেয় সেতুর নির্মাণে।
কিন্তু একবার মিটে গেলে, ধূমল দেবেরে ভুলে যায়,
ভোলে সব জনপদবাসী—যদিও সতত অস্থিরতা

তার কাল স্থির রাখে, আক্রোশে বিনাশে ঠিক স্থির রাখে স্মৃতি
সকলে যা ভুলে যেতে চায়। অমানিত, সে অন্তত থেকে যায়
যন্ত্রপূজারীর কাছে। তবু সে প্রতীক্ষা করে, দেখে, চেয়ে থাকে।
শিশুর ঘুমের ঘরে স্পন্দ তার জেগে ছিল ঠিক,
চৈত্রের দুয়ারপ্রান্তে কৃষ্ণচূড়া সারিতে সে ছিল,
অথবা আমের গন্ধে জ্যৈষ্ঠের ভাঁড়ারে,
আর ছিল সন্ধ্যাবেলা গ্যাসের আলোর বৃত্তে শীতে।

নদী আমাদেরই মধ্যে, সমুদ্র সবার চারিভিতে ;
সমুদ্র ভূমিরও প্রান্ত, স্পর্শ করে যায়
গ্রানিটের স্তর আর তটভূমিবক্ষে দেয় ছুঁড়ে
প্রাক্তন বিচিত্র যত সৃষ্টির ইঙ্গিত :
হাঙর, কাঁকড়ার খোল, প্রকাণ্ড তিমির শিরদাঁড়া ;
অথবা নিথর জলে সবার উৎসুক চোখে
ধরা পড়ে সমুদ্রের জলজ উদ্ভিদ্, প্রাণীকুল।
ছুঁড়ে দেয় আমাদের হৃত রত্নগুলি রত্নাকর,
ছেঁড়া জাল, ভাঙা দাঁড়, বিধ্বস্ত বল্লম, আর
ভিন্‌দেশী মৃতদের জীর্ণ বাস। সমুদ্রের আছে বহু স্বর,
বহুল দেবতা, বহু স্বর।
বুনো গোলাপের বুকে লবণশীকর,
কুয়াশা-উথাল ঝাউশাখা।
সমুদ্রগর্জন আর
সমুদ্রশ্বসন, এসব বিচিত্র স্বর প্রায়
একত্র পুঞ্জিত শোনা যায় : দড়িদড়া-টানা আর্তনাদ,
জলে ভেঙে পড়ে ঢেউ আদরে-তর্জনে অবিরাম,
দূরাগত প্রতিঘাত শানিত গ্রানিটে,
আর তীব্র সতর্কতা উচ্চারিত আসন্ন ভূভাগে
সবই তো সমুদ্রকণ্ঠ, আর সেই গৃহমুখে ফিরে-যাওয়া
জলভাঙা আর্তনাদ, আর সেই সামুদ্রিক পাখি ;
আর স্তব্ধ কুহেলির বুকচাপা গভীরতা থেকে

ঘণ্টা গুরুগুরু
পরিমাপ করে কাল অন্বর সমুদ্রসংক্ষোভে
আমাদের কাল নয়, এ আরো প্রাচীনতর,
সকল সময়যন্ত্র অতীত এ-কাল, সে আরো প্রাচীনতর,
যতকাল ধরে জাগরশয়নে
উৎকণ্ঠাকাতর মহিলারা মনে মনে ভবিষ্যৎ রচে,
জট খুলে নিতে চায়, স্পষ্ট করে নিতে চায়,
যা ঘটেছে, ঘটবে যা, ভিন্ন ভিন্ন করে তারে বুঝে নিতে চায়
গভীরা রজনী আর প্রভাতের মাঝখানে
যখন অতীত শুধু মনে হয় প্রবঞ্চনা, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎহীন,
উষার প্রহরা সামনে যখন সময় থেমে যায়,
ফুরোয় না সময় কখনো ;
আর আছে সৃষ্টির প্রথম থেকে ছিল এই সমুদ্রসংক্ষোভ
ঝনন্‌ন্
ঘণ্টা ওঠে বেজে ॥

২

শব্দবিহীন আর্তনাদের কোথা অবসান!
নিঃসাড়ে ঝরা হেমন্তে শুধু ঝরে-যাওয়া ফুল
স্থির পড়ে থাকে পাপড়িখসানো শুধু গতিহীন ;
কোথা অবসান ভাসমান এই সর্বনাশের,
আর কতদিন এ অস্থি তটে মন্ত্র-অতীত
মন্ত্র জাগাবে মহাদুর্যোগ ঘোষণায় ?

নেই অবসান, আছে শুধু যোগ : দিনের পিছন
আছে আরো দিন, সময়ের পরে সময় অকুল,
হৃদয় যখন কাছে টেনে নেয় এই হৃদিহীন
জন্মযাপন, বিকীর্ণ যত ধ্বংসরাশির
স্তূপ, একদিন সবচেয়ে ছিল প্রত্যয়ধৃত—
সমস্ত কিছু অস্বীকারের আজই তো সময়।

তারপরে আছে অন্তিম যোগ, ভাঙে খরশান
দর্প অথবা দেখি বিক্ষোভে শক্তি বিপুল
ভেঙে পড়ে যায়, বিবিক্ত রতি যেন রতিহীন
মনে হয় আজ ; ভাসমান নায়ে ছিদ্র ত্রাসের,
কী অনিবার্য ধ্বনি এসে লাগে নিথর শ্রুতিতে
ঘণ্টারণন গুরুগুরু শেষ ঘোষণায়।

কোথায়-বা এর অবসান, এই জেলের ভাসান
বাতাসের পিছে, ওৎ পেতে আছে কুয়াশা আমূল !
এমন কাল তো ভাবতে পারি না জলধিবিহীন
অথবা জলধি কল্পনাতীত যদি-না ধ্বংসের
ক্ষয়ে ভরে বুক, অথবা এমন ভবিষ্যতি তো
ভাবাও যায় না, অতীতেরই মতো ভ্রষ্ট যে নয়।

দড়িদড়া খোলে, ঘোরায় জাহাজ, যখন ঈশান
ভেঙে নামে, ওরা অবিরত জল সরায় তুমুল,
অপরিবর্ত্য ক্ষীণ তটরেখা ক্ষয়ক্ষতিহীন—
কড়ি গোনে ওরা, পাল খুলে রাখে ডকের পাশে ;
যদি-না মূল্য মিলত ওরা কি কোনো পাড়ি দিত ?
প্রাপ্তি যদি-না দেখা যেত সব সমীক্ষণায় ?

কণ্ঠবিহীন আর্তনাদের নেই অবসান,
নেই শেষ নেই ঝরিয়ে দেবার এই ঝরা ফুল,
ব্যথা অবিরাম চলে ব্যথাহীন আর গতিহীন,
সমুদ্র ধায় ভাসমান সব সর্বনাশের,
মৃত্যুর কাছে অস্থি যে তার ঈশ্বর চায়। কোনোমতে শুধু মন্ত্র-প্রতীত
মন্ত্র কী মহা আবির্ভাবের ঘোষণায় !

যতই বয়স বাড়ে, মনে হয়
অতীতের অন্য কোনো নকশা আছে, কেবল সে পরম্পরা নয়—

এমন-কি পরিণামও নয় : শেষটি তো আংশিক বিভ্রম
এই ভ্রান্তি উদ্দীপিত লঘুকল্প বিবর্তনবাদে,
গণমনে যার অর্থ অতীতেরে অস্বীকার করা।
আনন্দমুহূর্তগুলি—সে তো শুধু সুখে নয়,
চরিতার্থ তৃপ্তি কিংবা নিরাপত্তা অথবা হৃদ্যতা,
এমন-কি দিব্যি একটি ভোজে নয়, সে কেবল চকিত উদ্ভাসে—
অভিজ্ঞতা ছিল আমাদের কিন্তু তার অর্থ গেছে মুছে,
অর্থের সন্ধানে গেলে অভিজ্ঞতা ফিরে পাই ভিন্ন অবয়বে
আনন্দেরও অর্থের ওপারে। একথা তো আগেও বলেছি
নব-অর্থে উদ্ভাসিত সমস্ত প্রাচীন অভিজ্ঞতা
সে তো শুধু এ-জন্মের অভিজ্ঞতা নয়,
জন্মের জন্মের—তাকে ভোলা যায় না অনির্বচনীয় :
ইতিহাস-লিখনের নিশ্চয়তা অতিক্রম করে
দূরে চলে যায় দৃষ্টি, আড়চোখে ঘোরে দৃষ্টি
অতীত আদিম ভয়ংকরে।
এখন ক্রমেই বুঝি (সে কি ভুল বুঝি বলে অথবা তা নয়,
ভুল আশা ছিল বলে কিংবা ভুল ভয়,
সে প্রশ্ন ওঠে না) বুঝি, যন্ত্রণামুহূর্তগুলি ততোই শাশ্বত
যেমন শাশ্বত কাল : এ-ও আরো ভালো বোঝা যায়
নিজেকে জড়িয়ে যদি অনুভব করি অন্য সবার যন্ত্রণা,
আমাদের নিজের চেয়েও।
কেননা কর্মের স্রোতে সবাকার আচ্ছন্ন অতীত,
কিন্তু অপরের দাহ শুধু থেকে যায় অচিহ্নিত অভিজ্ঞতারূপে
অনুগামী শোচনাবিহীন।
ওরা অন্য হয়ে যায়, ওরা হাসে : যন্ত্রণা তো থেকে যায় ঠিক।
যে কাল বিনাশী সে-ই পালয়িতা কাল,
যেন নদী বহে নিয়ে চলে যায় মোরগের খাঁচা আর গাভী আর
নিগ্রোদের শব,
দষ্ট আপেলের ভার, তিক্ত কটু ফল।
আর সে অশান্ত জলে রূঢ় শিলাস্তূপ,

ঢেউ তারে ধুয়ে যায়, কুহেলি গোপন করে রাখে ;
গভীর প্রশান্ত দিনে যেন স্মৃতিচূড়া,
নাব্যদিনে সামুদ্রিক দিক-নির্দেশিকা
স্থির করে পথ, কিন্তু দুর্যোগের দিনে
কিংবা আকস্মিক রোষে সে চিরাচরিত।

৩

মাঝে মাঝে মনে হয় কৃষ্ণও কি তাই বলেছেন ?—
অন্য সব, তার মধ্যে এ-ও এক —কিংবা একই কথা ঘুরিয়ে বলার
ভিন্ন রূপ—
ভবিষ্যৎ যেন কোনো মুছে-যাওয়া গান, রাজসী গোলাপ, কিংবা
অগুরুছটায়
তাদের সবার জন্যে পরিতাপ, শোচনার জন্য যারা এখনো এখানে নেই,
না-খোলা পুঁথির কোনো হলুদ তুলোট পাতা চাপা।
আর ঊর্ধ্বে চলে যাওয়া তারই অর্থ নেমে যাওয়া, সামনে যাওয়াই
পিছে যাওয়া।
মুখোমুখি এর দৃঢ় দাঁড়াতে পারো না, কিন্তু এ তো নিশ্চিত যে
সময় শুশ্রূষা নয় : রোগীও এখানে নেই আর।
ট্রেন ছেড়ে দেয় আর যাত্রীদল মন দেয়
আহারে, মাসিকে কিংবা দলিলে দপ্তরে
(বিদায় জানাতে যারা এসেছিল ছেড়ে চলে যায় প্ল্যাটফর্ম)
শোক থেকে সরে এসে তাদের মুখের ছায়া আপাতত নিরুদ্বেগ,
শতেক ঘণ্টার ছন্দ নিদ্রালুতাভরে।
চলে যাও ভ্রাম্যমান ! কিন্তু অতীতের পরিত্রাণে
অন্য কোনো জন্মে নয়, অন্য কোনো ভবিষ্যতে নয় ;
স্টেশন ছেড়েছে যারা তোমরা ঠিক সেই লোক নও,
অথবা গন্তব্যে কোনো পৌঁছে যাবে যারা তাও নও,
পিছনে তাকালে দ্রুত সম্মিলিত হয়ে যায় রেললাইন দুটি
আর এই প্রহতধ্বনিত দূর জাহাজে উপর-পাটাতনে
ক্রম-প্রসারিত আল দেখে দেখে পিছে তোমাদের

ভেবো না 'অতীত শেষ' অথবা ভেবো না
'ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে আছে পড়ে'।
নেমে আসে রাত, দূরে বায়বীবিথারে আর জাহাজঘাটার আয়োজনে
ভাসে এক মন্দ্র স্বর (যদিও শ্রবণে নয়,
আর, কোনো ভাষাতেও নয়, সময়ের শঙ্খ গুরু গুরু)
"যাও সামনে চলে যাও যারা ভাবো তোমরা যাত্রীদল ;
যারা দেখেছিল যেতে বন্দর পিছনে সরে যায়, অথবা যাদের
নেমে যেতে হবে, তোমরা কেউ তারা নও।
দূরে ও নিকটে তীর, মধ্যতলে তার
অবস্থিত সময় যখন, অতীতে ও ভবিষ্যতে
সমান বিচার কোরো মনে।
যে-মুহূর্তে ক্রিয়া নেই নিষ্ক্রিয়তা নেই
তেমন মুহূর্তে শুধু শুনতে পারো 'শোনো, সত্তার যে কোনো তলে
স্থিরলগ্ন হতে পারে মানুষের মন
মরণের কালে'—এই এক কর্ম (আর,
প্রতিটি মুহূর্ত সে তো মরণের কাল)
যা অন্য সবার জন্যে ফলপ্রসূ দেখা দেবে, আর
ফলের প্রত্যাশা কোনো রেখো না হৃদয়ে,
সামনে চলে যাও।

যাত্রীদল, হে নাবিকদল,
তোমরা বন্দরে এলে সমুদ্রের যতেক লাঞ্ছনা
পরীক্ষা শাসন সব সয়ে যায় তোমাদের দেহ,
এই জেনো তোমাদের সত্য পরিণাম।"
এই মতো কৃষ্ণ : যবে অর্জুনেরে উপদেশবাণী
রণাঙ্গনে।

শুভের প্রত্যাশা নয়—
সামনে চলে যাও যাত্রীদল!

৪

প্রার্থনা করো শৈল-অন্তরীপের চৈত্যে দেবী,
তাদের জন্য, তরণী যাদের ভাসাল এবং যারা
মীনোপজীবক, যারা
সকল বৈধী চলাচলে হলো নিবিষ্ট, আর যারা
তাদের চালনা করে।

ওদেরও পক্ষে একবার তুমি করো প্রার্থনা ফিরে,
ওই নারী যারা পতিপুত্ররে ভাসায়ে দিয়েছে জলে,
ফেরেনি পুনর্বার,
হে কন্যা তব পুত্রের, তুমি
স্বর্গে অধীশ্বরী!

তাদেরও জন্যে আরবার তুমি করো প্রার্থনা, যারা
ছিল তরণীতে, যাত্রা যাদের সমাপ্ত বালুচড়ায়,
সাগরের ঠোঁট, আঁধারকণ্ঠ দেবে না যাদের ফিরে,
এখন যাদের ছুঁতেও পারে না সমুদ্রঘণ্টার
বিরামবিহীন স্তব!

৫

মঙ্গলগ্রহের কাছে চলে যাওয়া, প্রেতেদের সঙ্গে আলাপন,
প্রতিবেদনের ইচ্ছা সমুদ্রদৈত্যের আচরণ,
ঠিকুজির বর্ণনা অথবা খড়ি পেতে কোষ্ঠী খুলে দেখা,
লেখা থেকে রোগের নির্ণয়, জীবনীর আহরণ
করতলগত ভাঁজ থেকে, আর আঙুলগড়নে
সর্বনাশ আবিষ্কার, অমঙ্গল দূর করে দেওয়া
দেবমন্ত্র উচ্চারণে কিংবা চা-পাতায়, তাসের খেলায়
অনিবার্য ধাঁধার মোচন, শিকড় কবচ আর
বিচিত্র তুকতাক নিয়ে খেলা, দীর্ণ করে যাওয়া
আবর্তিত চিত্রগুলি প্রাকৃচেতনার ভয়ংকরে—

জঠর, কবর আর স্বপ্নরাজি উন্মোচিত করে যাওয়া ; এ সবই
তো স্বাভাবিক
বিনোদন, অনুপান, সংবাদপত্রের উপাদান :
আছেও, থাকবেও,—এর মাঝে কিছু তো অন্তত
চিরকাল থেকে যাবে, যখন বিপন্ন বিহ্বল সব দেশ—
এজ্‌ওয়্যার রোড কিংবা এশিয়ার তটে।
মানুষের কৌতূহল অতীতেরে ভবিষ্যতে স্পষ্ট দেখে নিতে চায়, আর
স্থির ধরে রাখে সেই তল। কিন্তু বুঝে নেওয়া
কোথায় সময় এসে নিঃসময়ে মেলে
সে তো শুধু সন্তদের কাজ।
কাজও ঠিক নয়, শুধু দেওয়া আর নেওয়া
সমস্ত জীবনব্যাপী সপ্রেম মরণ,
উত্তাপ, আত্মতাহীন, আত্মসমর্পণ।
প্রায় তো সবার জন্যে থেকে যায় শুধু
অলক্ষ্য মুহূর্ত এক, কালে কিংবা কালের অতীতে,
সূর্যের রশ্মিতে হারা বিপন্ন মূর্ছায়,
অজানা পাতার বুনো গন্ধ কিংবা শ্রাবণী বিদ্যুৎ
অথবা প্রপাত কিংবা গান
এমন গভীর শোনা যেন-বা অশ্রুত মনে হয়,
তবু তুমিই সংগীত যতক্ষণ বিরাজে সংগীত।
এসব ইঙ্গিত, অনুমান, ইঙ্গিতের অনুগামী অনুমান ;
আর বাকি সব
প্রার্থনা, পালন, চিন্তা, কর্ম ও শৃঙ্খলা।
অর্ধ-অনুমিত এ-সঙ্কেত, অর্ধ-উপলব্ধ উপহার,
এই তো বিগ্রহ মূর্তিমান্!•

মিলেছে এক অসম্ভব মিলে
ভিন্নতল সত্তা এইখানে,
বিজিত হলো, সম্মিলিত হলো
ভবিষ্যৎ অতীত এইখানে,

গতির কোনো উৎস নেই যার
যাকিছু তবু চালিত অবিরত,
কর্ম—সে তো সেই গতিরই নাম—
তাড়িত অপ্রাকৃত বলাধারে।
অতীত থেকে, ভবিষ্যৎ থেকেও
মুক্তি—এ-ই কর্ম। এই ধ্রুব
লক্ষ্য সবার পাবে না পূর্ণতা
এপারে। তবু আমরা অদমিত
যেহেতু শুধু সাধনা করে গেছি।
আমরা পরিতৃপ্ত থেকে যাব
যদি আমরা উজ্জীবিত রাখি
ইহকালীন উত্তরাধিকারে
(অশ্বত্থের অনেক দূরে নয়)
নিগূঢ় এই মৃত্তিকার জীবন ॥

শঙ্খ ঘোষ

উইলফ্রেড ওয়েন

নির্বুদ্ধিতা

ওকে নিয়ে চলো সূর্যের ঘরে—
সূর্য করস্পর্শে একদা জাগাত স্বদেশে ওকে,
শস্য-না-বোনা মাটি ওর শ্রুতিকুহরে।
ফ্রান্সেও ওর সুপ্তি ভাঙত সূর্যালোকে,
আজ অবশ্য ভিন্ন সকাল, হিমানি তুষার,
ওকে যদি কেউ জাগাতে পারে তো সে কথা আর
বুড়ো দয়াময় সূর্য ছাড়া কে জানে আবার ?

ভাবো তো সূর্য কীভাবে ফোটান বীজাঙ্কুরে—
জাগিয়েছিলেন কবে এ শীতল পিণ্ড, জানো ?
কষ্টার্জিত অঙ্গ, সকল অঙ্গ জুড়ে
স্নায়ুর প্রবাহ—এখনো উষ্ণ—দুরূহ তারে কাঁপানো ?
এরি জন্য কি জড়পিণ্ডটি বড়ো হলো এরকম ?
—হায়, কেন মূঢ় কিরণমালীর এতো পণ্ডশ্রম,
ধরণীর ঘুম ভাঙানোর প্রয়োজন ?

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ডায়েরি থেকে

পাতাগুলি
অযুত কুহরে গুঞ্জন করে আলো-আলো গাছে সাড়া তুলি।
প্রাণগুলি
পাহাড়ে পাহাড়ে জেগে ওঠে ঐ লহরে লহরে প্রাণ খুলি।
পাখিরা সব
ভোরবেলা গায় রামকেলি সুর ভরা উজান।
কবিরা সব
গেয়ে গেয়ে ওঠে চৈতালি খড় কাটার গান।
মৌমাছিরা
পাতার ফুলের ঘনানো শিশির ঝরিয়ে যায়।
ছেলের দল
কাজল-দীঘির জল ভেঙে জল ছড়িয়ে যায়।
ছলকানি
কাঁপে সাঁতারুর কারুকাজ কাঁপে শীতল জলে।
দেহের বাণী
সিক্ত মুকুর শিহরে কনক গগন তলে।
ও এক মাঠ
ঝর্নারা ওকে চেয়েছে সুরের সীমারেখায়
ও এক মেয়ে

আমায় ঘিরেছে গরবিনী তাই হাসি ছড়ায়।
রৌদ্র তাপ
টিলায় চূড়ায় দোটানায় দোলে : বুকের জ্বালা।
হৃদয় তার
আমার মগ্ন কপোলের তলে জ্বলে উজ্জ্বালা।
বেয়ে চলে
দিশারী আগুন ঐ পাহাড়ের ভ্রমণ্ডলে,
নিশ্চলা
ধৃতির সাধনা দীর্ঘশ্বাস কুঞ্জতলে।
থরোথরো
চিকণ পাতার দীর্ঘ আর্তি পাপড়ি করে
তারাগুলি
লক্ষতারার মঞ্জরী খোলে নীলাম্বরে॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

রবার্ট গ্রেভস

পাগুলো

রাস্তাটা ছিল
চড়াই কোথাও,
উৎরাই কোনোখানে,
পাকদণ্ডী ও প্রবেশ নিষ্ক্রমণ।

চলছিল শুধু পাগুলো
হাঁটু থেকে শুরু পাতায় শেষ
যাচ্ছে আসছে
অবিরাম।

নর্দমাগুলো কলকল করে
বৃষ্টির জলে ভেসে
লাঠিগুলো ফুটপাতে
ঠক্ ঠক্ করে অন্ধের মতো, ঠক্ ঠক্ করে শুধু।

পাগুলোকে টেনে
নিয়ে চলে অবিরাম
পা হবার সেই
নিয়তি মূঢ় ভয়াল।

পায়ের জন্যে পথ আর শুধু
পায়ের জন্যে পা
দৃঢ়তায় চলে
দু-দিকে নিরুদ্দেশে।

এই গোলে অন্তত
আমার পা দুটো ছিল না।
রাস্তার ধারে ঘাসে
দাঁড়ালাম সম্পূর্ণ।

থামা অসাধ্য
পাগুলো চলছে দেখলাম।
হোঁচট খায় না
একবারও পায় পায়

হেসেছি মুচকে
পাগুলো পায়নি দেখতে।
হাসলাম জোরে
পাগুলো শুনতে পেল না।

মাথাটা ঘুরল তারপর
হঠাৎ ভাবনা হলো,
আমিও কি ওই হাঁটুভর পা-ই
হতে পারি হাঁটবার

আস্তে ছুঁলাম পা দুটোর হাড় ;
সন্দেহে তারা হলো শৃঙ্খলমুক্ত
কুড়িটা জলের খোদল পেরিয়ে
তাদের ফিরে পেলাম।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমের কবিতা

যেহেতু এমন সাহস নেই যে
তোমার কাছে কিছু উপহার চাইব,
কিছু মধুর কাজ কিংবা প্রেমিকের প্রতিশ্রুতি ;
অথচ প্রত্যাখ্যান অসাধ্য
আমি যা দিতে পারি এবং তুমি চাইতে পার—
করুণা করো আমাদের উভয়কে
গ্রহণ করো যা উত্তম
এই ঋজু পর্বতশৃঙ্গের একদিকে মৃত্যু
নরক অন্যদিকে ॥

মৃগাঙ্ক রায়

উইনিফ্রেড্ হোলটবী

ফ্রান্সের ট্রেন

সারা দীর্ঘরাত্রি অদৃশ্য পাহাড়ের পথে
ট্রেনগাড়ি
অগ্নি-চক্ষু ট্রেনগাড়ি,

ডাকে পরস্পরকে তীব্র খোঁজের চিৎকারে ;
আর আমি
ভেবেছিলেম সব ভুলেচি আমি যুদ্ধের কথা—
হঠাৎ ঝল্‌সে উঠল মনে সেই ক্যামিব্রর্সের এক রাত্রি
জেগে শুয়েছিলেম ঘন অন্ধকারে,
শুনেছিলেম ট্রেনের শব্দ,
পশু, চিৎকার করা ট্রেন-পশুগুলো
ডাকচে পরস্পরকে তাদের শিকারের গর্জনে।
দুর্নিবার, অমোঘ, হিংস্র পশুর মতো
ছুটচে শিকারের সন্ধানে।
সৃষ্টি করেচে এই জন্তেই তাদের নির্মাণকর্তা,
সেই তারা, ব্যবসা যাদের ধরা এবং গ্রাস করা
আমাদের রক্তমাংসের একান্ত আপন জনদের।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা
ক্রুদ্ধ অসহায়, শুয়েছিলেম একা সে রাত্রে
শুনছিলেম শিকার করচে তারা তোমাকে, প্রিয় আমার, আর তোমাকে,
শুনছিলেম ছুটে নিয়ে চলেচে তারা তোমাকে মৃত্যুর মুখে,
অসহ্য চেষ্টা করলেম সাবধান করতে তোমাকে পশুদের হাত থেকে
হায় রে, ঐ পশুদের হাত থেকে !
তার পরে মনে হলো, না,
এতো বিশ্রী স্বপ্ন সত্য হতেই পারে না !
ক্ষণেক শান্ত হলো মন, তখন ট্রেনের শব্দ আর শোনা যাচ্চে না—
কিন্তু হঠাৎ, ঐ যে, নিস্তব্ধের বুক চিরে কম্পিত হলো গর্জন,
শুনলেম, ঐ দূরে, আরো দূরে,
ভীষণ বজ্র-নিনাদ তাদের আনন্দহীন ভোজে—
ধরেচে তোমাকে পশুরা, তাহলে, ধরেচে ঐ পশুগুলো, ঐ পশুগুলো—
জানলেম
আমার নিশাচর স্বপ্ন তবে সত্য ॥

অমিয় চক্রবর্তী

সেসিল ডে-লুইস

কে যায় ঐ

(ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিনে)

কে ঐ যায় ?
কোন্ অতিদূর উপত্যকার গহন মাটি
থেকে এলে, হাতে চাঁদের কিরণ রুপার কাঠি
খোলা হাওয়ায় ?
এলেই বা তুমি কী করে এখানে, জলকণা যেন স্তব্ধতার
খাড়া-খাড়া কান, উদ্যত স্নায়ু বাঁকে-বাঁকে হলে কেমনে পার ?

খুঁটি বানিয়েছি জ্ঞান মহীরুহ থেকে,
অবিশ্বাসীর কী আস্পর্ধা চর্মচক্ষে দেখে ?
শাদাসিধে পথে আমার পরিক্রমা,
বায়ুসম, তবু সত্যনিষ্ঠ জানি তো মৌমাছিকে,
আমি—অজ্ঞাতনামা।

এটা কি তোমার জানা
যে অনধিকার প্রবেশ করেছ রণাঙ্গনে ?
ভাবা-ই শক্ত, ইন্দ্রজালিক কোন্ কারণে
পেতে পারে মার্জনা
যে দেশে তাদের হাল্‌কা চলায় বিপন্ন হবে সুশৃঙ্খলা
কী কাজ তোমার সংসারে যার লক্ষ কঠিন ঝট-ঝামেলা ?

দিয়েছি তাদের যে-শিশির ছিল ধরার আদিস্রোতে
প্রথম বন্য গোলাপের থেকে আগুন এই জগতে।
কিন্তু আমার প্রতিভা কোথায় জানি—
তাদেরি ক্ষুধিত ক্ষুব্ধ এবং বিজিত হৃদয় হতে
বয়ে আনি আমি বাণী।

যাও, হে বন্ধু। তোমার মধ্যে যত
মন্ত্রশক্তি, পোড়-খাওয়া আর পার্থিব মানুষের
দরকার নেই হয়তো-বা ; তবু সে সব কিছুর ঢের
অমূল্য দাম মেনে নিই অন্তত।
যাও হে বন্ধু, বিদায়, সহজে চলুক পথিক-ধারা,
যা-কিছু জরুরি আমরা ভুলেছি, বয়ে এনে দেবে তারা।

স্বপর্ণা সেন

বহু দূর যেতে হবে ?

বহু দূর পথে যেতে হবে ?
মাত্র এক পা, তার বেশি নয়।
যাওয়া কি ভীষণ শক্ত হবে ?
প্রশ্ন রাখো গলিত তুষারে,
ঘূর্ণিত পাখায়।

কী সেখানে নিয়ে যেতে পারি ?
একবিন্দু কিছু না, কিছু না।
কী এখানে রেখে যেতে পারি ?
প্রশ্ন করো ত্বরিত বাতাসে,
নিষ্প্রভ তারায়।

দীর্ঘপথ পার হতে হবে ?
সে-রাজত্বে চিরদিন কার
করতলে ? এই জিজ্ঞাসার
ভাষা রাখো প্রস্তরের স্তরে,
এবং আমার গীতস্বরে।

কে শোনাবে বিদায়ের ভাষা ?
ঘণ্টা, ঘণ্টাধ্বনি।

আমার অভাবে কেউ শোকাহত হবে ?
সাধ্য নেই সেই উক্তি করি উচ্চারণ—
দ্রুত, হে গোলাপ, দাও আমাকে চুম্বন।

অরবিন্দ গুহ

লুইস ম্যাকনীস

আত্মকথা

দেখেছে আমার সেই শিশুকাল মৃত্তিকার
সবুজ বৃক্ষ বৃক্ষে সবুজে ছিল অপার।

ফিরে এসো দ্রুত নতুবা কখনো এসো না আর।

আলুথালু লোক বাবার পোশাকে হট্টগোল
বেঁধেই থাকত, দেয়ালে তুলত তুমুল রোল।

ফিরে এসো দ্রুত নতুবা কখনো এসো না আর।

মার পরনের পোশাক থাকত হলুদশ্রীর ;
নম্র, নম্র, মা ছিল আমার নম্র ধীর।

ফিরে এসো দ্রুত নতুবা কখনো এসো না আর।

সবে পাঁচে এসে দেখি এলো কালো স্বপ্ন সব ;
তারপর নেই তেমন দৃশ্য সে-কলরব।

ফিরে এসো দ্রুত নতুবা কখনো এসো না আর।

মৃত্যুর সাথে কথা বলে বসে অন্ধকার ;
শয্যার পাশে প্রদীপের আলো হলো শিকার।

ফিরে এসো দ্রুত নতুবা কখনো এসো না আর।

ঘুম ভেঙে গেল তখনো বেহুঁশ কথোপকথা
চলছে ; আর তো নেই, কেউ নেই, নির্জনতা।

ফিরে এসো দ্রুত নতুবা কখনো এসো না আর।

যখন আমার স্তব্ধ ভয়ের আর্তস্বর
তোলে চিৎকার, না, কেউ দিল না তার উত্তর।

ফিরে এসো দ্রুত নতুবা কখনো এসো না আর।

উঠে পড়লাম ; পা বাড়াই একা এ-বিহ্বল
দেখলু সূর্য প্রভাতী সূর্য হিমশীতল।

ফিরে এসো দ্রুত নতুবা কখনো এসো না আর।

সুনীলকুমার নন্দী

ডব্লু. এইচ্. অডেন

মিরাণ্ডার গান

আমার প্রিয়তম শুধুই সে আমার, যেমন দর্পণ গোপন নির্জন
যেমন দীনহীন দুঃখী মানুষেরা ধন্য নৃপতির সমুখে সত্য
এবং ঐ উঁচু সবুজ টিলাখানি সদাই পাশে বসে থাকে সমুদ্রের।

উচ্চে লাফ দিল কালো মানুষটা, আড়ালে থেকে ঐ বৃদ্ধ বৃক্ষের
শূন্যে ডিগবাজি খেয়েই দৌড়োল, যেন-বা ঢেউয়ের মতন মত্ত
আমার প্রিয়তম শুধুই সে আমার, যেমন দর্পণ গোপন নির্জন।

চেঁচাল ডাইনিটা, অতীব কর্কশ, তীব্র কূটময় বিষের শরীরের
সবটা গলে গিয়ে আলোর রূপ হলো, যেমন জল থেকে ঝর্না মত্ত,
এবং ঐ উঁচু সবুজ টিলাখানি সদাই পাশে বসে থাকে সমুদ্রের।

পথের মোড় থেকে করেছি প্রার্থনা, আমারই জন্যে, সে প্রাচীন বৃদ্ধের
শীর্ণ গাল বেয়ে গড়ায় অশ্রুর উতল জলধারা, সুখের তত্ত্ব,
আমার প্রিয়তম শুধুই সে আমার যেমন দর্পণ গোপন নির্জন।

একটি চুম্বনে জাগাল সে আমায়, বাজেনি কারো বুকে কিছুই দুঃখের
সূর্যে ঝলোমলো পাথর, জলযান, এবং চোখ, যত কিছু সমস্ত
এবং ঐ উঁচু সবুজ টিলাখানি সদাই পাশে বসে থাকে সমুদ্রের।

স্মরণ করে নিতে এখন সুতরাং সতত বদলানো বাগান আমাদের
আমরা জুড়ে আছি, যেমন বাচ্চারা সকলে হাত জুড়ে লাগায় নৃত্য,
আমার প্রিয়তম শুধুই সে আমার যেমন দর্পণ গোপন নির্জন
এবং ঐ উঁচু সবুজ টিলাখানি সদাই পাশে বসে থাকে সমুদ্রের।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ওকে ধরে ধরে

ওকে ধরে ধরে নিয়ে যাও সৈকতে,
আর সযত্নে বসাও বৃক্ষতলে,
যেখানে শুধুই শাদা পারাবত সারাদিন সারারাত
দিগ্বিদিকের বাতাসের সহবতে
গায় মনে-লাগা মনে-মনে লাগা পূর্বরাগের গান।

কনকাঙ্গুরী পরাও আঙুলে তার —
বক্ষের কাছে আশ্লেষে আনো বুক
সরসীর যত শফরী সে-ছবি তুলুক এক নজরে,
অপিচ ধ্রুপদী কলাকার মণ্ডুক,
গায় মনে-লাগা মনে-মনে লাগা পূর্বরাগের গান।

যত পথ ঝেঁকে আসবে তোমার মিলনের মণ্ডপে,
যত বাড়ি বাড়ি তাকিয়ে দেখবে ঘুরে,

টেবিল চেয়ার ঠিক লাগসই মন্তর পড়বেই,
তোমার বাহন ঘোড়াগুলো গান গাবে
সেই মনে-লাগা মনে-মনে লাগা পূর্বরাগের গান ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

স্বপ্ন শেষ

প্রথম যেবার আমি স্বপ্নমগ্ন ঠিক সে বছর
গৃহযুদ্ধ, পলাতক উর্ধ্বশ্বাস আমরা ক্লান্তপদে
এক উপত্যকা ছাওয়া তস্করে ও আহত শ্বাপদে
পিছনে খামার জ্বলছে ডাইনে বাঁয়ে বহু পথ পর
—অবশেষে কবে উত্তরাধিকারী ফিরবে তাই বলে
হাঁ করে কপাট খুলে রাখা এক বিশাল বাড়িতে
আমরা ঢুকলাম এসে ; অন্দরের সামনের সিঁড়িতে
এক বৃদ্ধ কেরানীর পাশ কেটে যেই যাব চলে
তখনি সে মাথা তুলে দেখে বলল, 'ফেরো' ; অনুনয়,
অনুরোধে আমাদের বহুবিধ প্রার্থনা কাতর
সব শুনে বিচলিত কম্পিত অক্ষম কণ্ঠস্বর
সে বৃদ্ধ ফেরাল তবু, সে দুর্দিনে কে দেবে আশ্রয় !

* * *

আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন শুরু এক নিদাঘ বিপিনে
নগ্নকান্তি তুমি পাশে শুয়ে আছো, সুনীল করুণ
তোমার নয়নে মিলত ভালোবাসা, অথচ আগুন
যেমন চমকিয়ে ওঠে হঠাৎ হাওয়ায় সেই দিনে
আমার চুম্বন মাত্র তুমি ছিটকে দূরে সরে গেলে
চতুর্দিকে বিস্তারিত স্তব্ধ মৃত শুষ্কতা সম্বল
সহসা সম্মুখে এলো অনন্ত আরণ্য সমতল
বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে উন্মোচিত তুমি গেলে ফেলে
ধূ ধূ অজন্মার কালে প্রমাদবিহীন পরমাদ
সেদিন একান্তে বসে সারা বেলা ভেবেছি কেবল

যে বস্তু আমার হাতে এতো শক্ত এমন শীতল
কেন সে তোমার হাত, কোনো এক মানুষীর হাত!

*　　　　*　　　　*

এবং সমস্ত শেষে সেই স্বপ্ন সেই যে যেবার
মাথায় মুকুট পরে যুদ্ধশেষ বিজয় উৎসবে
প্রথম সারিতে সামনে সম্মানিত সুন্দর গৌরবে
আমরা দুজন বসে, সে বছর মুকুটের ভার
অবশ্য মাথায় ছিল সকলেরই কিন্তু সেই সব
হাল্কা কানেজের তৈরি একমাত্র শুধু আমাদের
সোনার মুকুট ছিল, সেই দিন শৌর্য ও প্রেমের
পাশাপাশি দুটি ছায়া অমূল্য দর্পণে, পরাভব
তবু মেনে নিতে হলো—কেননা যখন বাজনার
তালে তালে সকলেই নাচতে উঠল আমরা দুজন
মুকুটের ভারে বড়ো ক্লান্ত তাই অচল চরণ
থেমে ছিল ; চতুর্দিকে নৃত্যরত আনন্দ সংসার।

স্বপ্ন শেষ।　কোথাও ছিলে না তুমি, তবু এই ক্ষণে
যখন দুশ্চিন্তা এসে মিলেছে লজ্জায়—খুঁজে পাই
সমস্ত স্বপ্নের সূত্রে গেঁথে রাখা আমার ইচ্ছাই
একটি ভর্ৎসনা হয়ে বারবার মনের দর্পণে
দেখা দেয়, যে তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসতে চাই
নিষ্ফল কামনা শুধু পেয়ে পেয়ে কেবল হারাই ॥

তারাপদ রায়

এক্‌সপ্রেস্‌ ট্রেন

প্রথম সহজ প্রবল ঘোষণার পরে
যন্ত্রের কালো জানানি দিয়েই বিনা দ্বিরুক্তিতে
সম্রাজ্ঞীর মতো গড়িয়ে চল্‌ল, স্টেশন ছেড়ে।
নামাল না মাথা, সম্বরিত ঔদাসীন্যে
বিনম্র বাড়ির ভিড় গেল কাটিয়ে,
এবং গ্যাসের কারখানা; শেষে উল্‌টিয়ে গেল ঐ ভারি পৃষ্ঠা
মৃত্যুর, সিমেট্রির কবরের পাথরে ছাপানো।
শহরের বাহিরে দেশ রয়েছে খোলা—
গতি বাড়াল দ্রুততায়, ঘনিত হলো তার রহস্য।
সমুদ্রে চলা জাহাজের উদ্দীপ্ত আত্মসমাহিতি এখন তার।
এবার আরম্ভ কর্‌ল তার গান—প্রথমে খুব ধীর শব্দে,
তার পরে জোরে, শেষে একেবারে উন্মত্ত শীৎকারে—
চলার বাঁকে বাঁকে বাজে তার বাঁশির চিৎকার-গান,
বধির-করা শব্দের ঝড় ঝংকৃত হল সুরঙ্গে, যন্ত্রে যন্ত্রে
অগণ্য কলকব্জায় অন্তর্লীন সংঘর্ষে।
আর সব খন হাল্কা, বায়বীয়
চলেচে আনন্দিত ছন্দ তার চাকার তলায়।
লৌহ ল্যাণ্ড্‌স্কেপ পেরিয়ে তার লাইনের পর দিয়ে বাষ্পবেগে
ঝাঁপিয়ে পড়ল এখন সে পাগল নূতন সুখের অধ্যায়ে,
যেখানে গতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেল্‌ছে নব নব অদ্ভুত আকার,
প্রশস্ত বাঁকা রেখা,
সমযুগ্মরেখা বন্দুকের ষ্টীলের মতো পরিষ্কার।
অবশেষ এডিনব্রো, রোমের চেয়েও দূরে।
পৃথিবীর চূড়ান্ত ছাড়িয়ে, পৌছল রাত্রিতে—
যেখানে কেবলমাত্র এক অবনত স্ট্রীমলাইন উজ্জ্বলতা
ফস্‌ফরাস্‌-এ শাদা হয়ে উঠেচে টলমল পাহারার 'পরে।
আহা! ধূমকেতুর মতো অগ্নিশিখায় বিমুগ্ধ সে চলেছে এগিয়ে

তুরীয় আপন সংগীতে,—কোনো পাখির গান, না,
মধুভরা কুঁড়িতে ফেটে যাওয়া কোনো পল্লবও তার কাছে লাগে না ॥

অমিয় চক্রবর্তী

প্রাতঃস্মরণীয় তাঁরা

সর্বক্ষণ তাঁদের চরিত ভাবি যাঁরা প্রকৃতই মহৎ ছিলেন।
যাঁরা, মাতৃগর্ভ থেকে, মনে রেখেছেন মানবমনের ইতিহাস,
আলোকের দালানে-দালানে, যেখানে প্রহরগুলি সূর্য সব
অন্তহীন এবং সংগীতে উন্মুখর। যাঁদের উচ্চাশা কমনীয়,
যাঁরা শুধু চান যে তাঁদের ওষ্ঠাধর, তখনও আগুনে রাঙা,
বলুক আত্মার কথা গানে-গানে ঢেকে দিয়ে আপাদমস্তক।
এবং সঞ্চয় যাঁরা করেছেন বসন্তের ডালপালা থেকে
সাধ ইচ্ছা, ঝরেছে যা তাঁদের শরীর বেয়ে মঞ্জরীর মতো।

মহামূল্য নীতি হলো কখনও না ভুলে যাওয়া
রক্তের মৌলিক হর্ষ, অক্ষয় নির্ঝর থেকে ভরা,
ভেদ করে বহু শিলা আমাদের পৃথিবীর কালেরও আগের।
সকালের সরল আলোয় কখনও না অস্বীকার করা তার সুখ
অথবা কদাচ তার সুগভীর সায়ন্তন প্রেমের প্রার্থনা।
কখনও না ক্রমিক অভ্যাসে ট্রাফিকের গোলমালে ধোঁয়া কুয়াশায়
মানসের মরশুমের মুখ চেপে ধরা।

তুষারের সন্নিকটে, সূর্যের সান্নিধ্যে, সর্বোচ্চ প্রান্তরে
চেয়ে দেখো কেমন এঁদের নাম সংবর্ধনা পায় ঘাসের হিল্লোলে
আর শুভ্র মেঘে-মেঘে পতাকা নিশানে
এবং নিবিষ্ট নীলাকাশে বাতাসের আনম্র মর্মরে।
তাঁদের সবার নাম, যাঁরা আজীবন লড়েছেন জীবনের তরে,
যাঁরা নিজেদের হৃদয়ের পাশে রেখেছেন অগ্নিকেন্দ্র।

সূর্যের সন্তান তাঁরা, কিছুকাল যাত্রীও ছিলেন সূর্যলোকে,
এবং ভাস্বর হাওয়া ভরে দিয়ে গিয়েছেন নিজেদের গৌরবস্বাক্ষরে।

বিষ্ণু দে

দিবা-বিভাবরী

আমি অন্ধকার ভেঙে প্রাঞ্জল দিবসে চলে যাব,
এই এক প্রতিজ্ঞা আমার।
আমার শব্দেরা যেন নিশীথে চক্ষুর মতো; তারা
আলোর কেন্দ্রকে খুঁজে ফেরে।
আমার কর্মের সীমা দারুণ আক্ষেপে
দূরে প্রসারিত; তবু মিলিত চেষ্টায়
তারা অন্ধকারে যেন বেঁধে দিতে চায়
সেই পথ, যা আমাকে প্রাঞ্জল দিবসে নিতে পারে।

অথচ প্রাঞ্জল সেই দিনকে এড়িয়ে
আমার আঁধার আমি রক্ষা করব, এই এক প্রতিজ্ঞা আমার
আমার শব্দেরা যেন লাজুক চক্ষুর মতো; তারা
আলোয় মীলিত হয় দুর্বোধ আঁধার ভালোবাসে।
আমার শব্দেরা যেন দারুণ আক্ষেপে
বিরোধী সীমায় গিয়ে ভেঙে দেয় শৃঙ্খলার পথ।
কেন্দ্রকে এড়িয়ে তারা বৃত্তের বাহিরে ঘুরে মরে।

এই অন্ধকার থেকে আলোকের কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে নিতে গিয়ে
যখন পরাস্ত আমি, তখনই প্রকট হয় অশক্তি আমার।
অথচ পালাতে গেলে পথের কঠিন
বলয় সহসা তোলে বাধা।
এ-মুখে আলোর রশ্মি পড়ুক, অথবা
আমার নিজের দৃষ্টি আমার দৃষ্টির থেকে পালিয়ে ফিরুক,—
কেন্দ্র ও পরিধি, দু-ই অশক্তির প্রতীক আমার।

এ কী যুগ্ম পরিচয় প্রতিজ্ঞার, অশক্তির! এ কী
দারুণ তরঙ্গে আজ আমার শব্দেরা মাথা কোটে!
ঘূর্ণিত আঁধারে এ কী দারুণ উন্মত্ত পলায়ন!
এ কোন্ ভীষণ আলো খুঁজে ফেরে মুখশ্রী আমার!
এ কোন্ ভীষণ রাত্রি আতঙ্কে আমাকে ঢেকে রাখে!
অথচ প্রতিজ্ঞা জ্বলে; সমস্ত আতঙ্ক দুর্বলতার পিছনে
জ্বলে সুবিশাল সূর্য, সিলুয়েট চিত্রের মতন।

ওই সূর্য, অন্ধকার থেকে যে নির্মাণ
করে দিন, আমি তাকে গ্রহণ করার জন্য ক্রমেই প্রস্তুত
হয়ে চলি। যেন অন্ধকার
থেকে আলো ছোটে, আর আলোর ভিতর থেকে ভীষণ আঁধার
ছুটে যায়, কালোয় শাদায় গড়া সামগ্রিক শূন্যতার দিকে।
আমার জীবন, এই বিশ্ব যেন একসূত্রে ক্রমে বেঁধে নেয়
আঁধার এবং আলো। মিলন ঘটিয়ে তবু বিশ্লেষ করে সে
প্রাঞ্জল দিনের থেকে আঁধারের মত্ততা আমার।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডিলান টমাস

এই যে রুটিকে ছিঁড়ি

এই যে রুটিকে ছিঁড়ি একদা এ শস্য ছিল মাঠে
এই মদ বিদেশী লতার
ফলের শরীরে ডুবে ছিল।
দিবসে মানুষ কিংবা রাত্রির বাতাস
আনত করেছে শস্য, ভেঙে গেছে আনন্দ দ্রাক্ষার।

একদিন এ-বাতাসে গ্রীষ্মের শোণিত
আঘাত করেছে মাংসে ; যাতে সুসজ্জিত ছিল আঙুরের লতা,
একদিন এ-রুটিতে
শস্য ছিল হাসিখুশি এমন বাতাসে ;
মানুষ ভেঙেছে সূর্য, বাতাসকে নামিয়েছে টেনে।

এই যে মাংসকে ছেঁড়ো, রক্তকে নির্গত করো তুমি
নিঃসঙ্গ নৈরাশ্য আনো আমার শিরায় ;
এই শস্য এবং আঙুর
যদি জন্ম পেয়ে থাকে ইন্দ্রিয়ের শিকড়ে ও রসে,
তাহলে আমার মদ পান করো, আমার রুটিকে ছেঁড়ো তুমি।

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

এমন সময় ছিল

এমন সময় ছিল কখনো কি যখন সার্কাসে
বেহালার ছড় টেনে নাচিয়েরা ভুলে যেত সকল অসুখ ?
তখন পুস্তকপাঠে কাঁদাও সম্ভব ছিল, আজ
সময় ছড়িয়ে গেছে বীজাণু তাদের পথে-পথে।
খণ্ডিত রেখার নিচে আকাশের তারা আজ নিরাপদ নয়।
যা-কিছু অজ্ঞাত তা-ই নিরাপদ এমন জীবনে।
আকাশী-চিহ্নের নিচে যারা বাহুহীন
তারাই নির্মলপাণি, এবং হৃদয়হীন প্রেত
একাকী অক্ষত আর অন্ধজন সব-চেয়ে চোখে দেখে ভালো।

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

মৃত্যুর শাসন

এবং মৃত্যুর কোনো অবাধ শাসানি থাকবে না।
মৃত লোকগুলি, নগ্ন, এক হয়ে যাবে তার সাথে

যে-মানুষ আছে লীন পশ্চিমের চাঁদ আর বায়ুর জগতে ;
যখন তাদের হাড় পরিপাটি জড়ো করা হবে
যখন সে পরিচ্ছন্ন হাড় যাবে মিশে,
তাদের কনুইয়ে-পায়ে তারার আকাশ তারা পাবে ;
যদি-বা পাগল হয় তবু তারা সুস্থ-স্বাভাবিক,
যদি-বা সমুদ্রে ডোবে তবু তারা উঠে আসবে ফের ;
যদি-বা প্রেমিক ব্যর্থ, প্রেম ব্যর্থ নয় ;
এবং মৃত্যুর কোনো অবাধ শাসানি থাকবে না।

এবং মৃত্যুর কোনো অবাধ শাসানি থাকবে না।
সমুদ্রের বাঁকে বাঁকে মোচড়ে মোচড়ে
দীর্ঘকাল শুয়ে থেকে ঝোড়ো মৃত্যু মরবে না তারা,
যন্ত্রণার শূলে ঘুরে পেশীগুলি যখন শিথিল,
চক্রে বাঁধা, তবু তারা ভেঙে পড়বে না ;
তাদের বিশ্বাস হাতে দ্বিখণ্ডিত হবে সহজেই
একশৃঙ্গ দুরদিষ্ট তাদের বিনষ্টিবহ যে ;
নানাখানা সবদিক তবু তারা হ'বে না খান্‌খান্‌ ;
এবং মৃত্যুর কোনো অবাধ শাসানি থাকবে না।

এবং মৃত্যুর কোনো অবাধ শাসানি থাকবে না।
কোনোদিন আর চিল কানে কানে কান্না শোনাবে না
অথবা সমুদ্রতীরে ঢেউগুলি সরবে হানবে না ;
যেখানে একটি ফুল ফুলে উঠত তুলবে না আর
বর্ষার আঘাতে মাথা তুলবে না আর ;
যদি-বা উন্মাদ তারা, অথবা নখের মতো জড়
তাদের মগজগুলি তারা-ফুলে রূঢ় হানাদার ;
ততক্ষণ সূর্যভাঙা যতক্ষণে সূর্য ভেঙে পড়ে,
এবং মৃত্যুর কোনো অবাধ শাসানি থাকবে না।

নিখিলকুমার নন্দী

মৃত্যু ও মিথুন

প্রেমিক ॥ জ্যোৎস্নায় অস্থির হলো কাঁটাগুল্মগুলি।
এসেছি অনেক দূরে, পথের ক্লান্তিতে
হৃদয় আমার আর্ত, দেখো প্রিয়তমা।

নারী ॥ এবং আমিও এক অন্ধ কারাগারে
বন্দিনী, শুভেচ্ছা তাই জানাতে পারি না।

প্রেমিক ॥ হাওয়ায় বিদীর্ণ হয় মেঘের শরীরে
যেমন, আমারই এই ইচ্ছার আঘাতে
বিদীর্ণ হয়েছে শান্ত মুখশ্রী আমার।
মূর্খের মতন এই ঠাণ্ডা মুখ আমি
রেখেছি তোমার দিকে, যেমন কুকুর
ঠাণ্ডা মুখ তুলে ধরে চন্দ্রমার দিকে।

নারী ॥ এনেছো পাণ্ডুর চাঁদ এবারে, এনেছো
শীতার্ত বৃষ্টির ধারা। না, আমি দুয়ার
খুলব না, যেহেতু সেই প্রকৃত প্রেমিক
তুমি নও। তুমি তার প্রেতমূর্তি, তুমি
ফিরে যাও, এসো না এখানে।

প্রেমিক ॥ প্রিয়তমা,
রক্ত ঝরে পায়ে। তুমি ডেকেছো, তোমার
মুখশ্রী ডেকেছে, তাই সুদীর্ঘ পথের
দুঃখকে করেছি তুচ্ছ, এসেছি এখানে।

নারী ॥ ফিরে যাও, ফিরে যাও আশ্রয়ে তোমার।
ছলনার সময় গিয়েছে।

প্রেমিক ॥ চেয়ে দেখো,
আমি এক দুঃস্থ যুবা। পথের কিনারে
দাঁড়িয়ে যে ভিক্ষা করে তোমার প্রণয়,
তাকে দয়া করো।

নারী ॥ হায়, দয়ার সময়
নেই আর। যাও কোনো নগরে বরং,
মূঢ়তার অন্যতর আশ্রয় সেখানে
খুঁজে পাবে। তুমি নও প্রেমিক আমার।
দিয়েছি সর্বস্ব যাকে, সে কোথায়? তার
কোথায় সন্ধান পাব?

মৃত্যু ॥ তোমার পিছনে।
এসো প্রিয়তমা, ওই কামার্ত হাওয়ার
থেকে সরে এসো এই কক্ষের গভীরে।
এখানে শয়ন করো। কী করে সান্ত্বনা
দিতে হয়, জানি আমি। জানি, কী কৌশলে
অশান্ত হৃদয়ে শান্তি নিয়ে আসা যায়।

নারী ॥ দাঁড়াও, জানালা বন্ধ করি। হে ঈশ্বর,
এতো অনায়াসে শান্তি পাওয়া যেতে পারে

মৃত্যু ॥ এখানে আমার পাশে শান্তিতে শয়ন
করো, নারী। অর্থহীন সমস্ত কল্পনা
যা তোমাকে রাত্রিদিন পীড়ন করেছে,
নষ্ট হবে ঈশ্বরের হাতে।

প্রেমিক ॥ আমাকেও
হত্যা করো। ঈশ্বরের যে রুক্ষ বিশাল
আঙুলে আমিও বন্দী, বিক্ষিপ্ত মেঘের
যে-মত্ত আঙুলে, তার নির্দয় আঘাতে
কণ্ঠ রুদ্ধ করে দাও, কণ্টক-নখরে
মুক্ত করো আত্মাকে আমার, তৃপ্তি দাও।
নারী তা দেবে না।

নারী ॥ এ কী, এতো দৃঢ় কেন
এই হাত? এতো ঠাণ্ডা কেন? বলো, তুমি
শত্রু কিনা। নাকি ব্যর্থ প্রেমিক আমার?
কে তুমি রেখেছো হাত কণ্ঠের উপর?

মৃত্যু ॥ শান্ত হও, আমি মৃত্যু, নিদ্রার নিষ্ঠুর সহোদর।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

বৃথাই বিষাদগীতি। সে এখন নিষ্ক্রান্ত মুখর
উপত্যকাতলে কিংবা ক্ষীণকায় শৈলশিরাতলে
পাথরে দাঁড়ায় এসে। শুনতে পাবে তার কণ্ঠস্বর
বিচূর্ণ প্রান্তর বেয়ে নেমে আসে বালক যেন-বা।
তাঁর পরাজয় নেই কোনোদিন, অথবা মরণ।
যদি তার অস্থিরাশি আর্দ্র মৃত্তিকার গর্ভে শায়িত অথবা
যশের কঠিন শবাধারে লয় অনন্ত শয়ন
পুনশ্চ জাগ্রত হবে প্রথম বর্ষার ধারাজলে,
অতিক্রম করে যাবে পর্বত ক্রমশ অন্বেষণ
বিশ্রামের যা এখন মেঘে মেঘে ধর্ষিত প্রান্তরে।
সে ছিল ঝড়ের দিন, গ্রানিটের চূড়া বিদ্ধ করে
নভস্তল, চেয়ে দেখে পাদদেশে শব্দের চরণ
বাসন্তী পুষ্পের প্রায় ঝোলে লম্বমান বৃক্ষদলে
শূন্যতা যদিও শুষ্ক মুখে কিংবা উপত্যকাতলে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

টম গান

দম শেষ

'দম শেষ হয়ে আসে কারণ
কাতর দুঃখ, কাৎরানি, আর কষ্ট করুণ শ্বাসটানা
মেলাতে চেষ্টা করেছি, প্রকৃত আমি যখন
ছিলাম অধিক উন্মুখ ঘুমে ষোল আনা।

সন্দেহ হয় আমার সাধ্য আছে কি ওই
তীব্র দহন বহনের। ঢের ভালো বরং,
আমি ভাবি, বেশি জ্বলুনিতে সাড়া ফুঁ-দিয়ে রই :
"ফুঁ-দিয়ে" বলাই সঠিক। কোথাও বসব কোন্

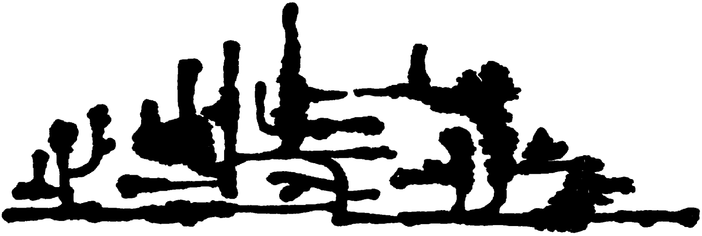
নোংরা আলোয় মিটমিট করা যে-কোনো বার
পাশে বসা একা মাতাল সাঙাত মদ্যে চুর
দৃষ্টি মেলতে সহযোগী হবে খোলা দুয়ার
আর তাস খেলে গোটা শনি রবি হবে ফতুর।

স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন, এই।'
'কী নিয়ে বাঁচবে ?'—'একই বিবর্ণ ছককাটা
পথ বেয়ে যাওয়া কাজ হবে। আমার একেবারেই
দম না-ছেড়ে ও-পথ হাঁটা।'

'দম শেষ হলে মৃত্যু।'—'বেশ !
গোপনে আমার দম নেব ফের দম ফেরাই
মৃদু প্রশ্বাসে। নতুবা আমার এ-অভ্যেস
কী করে টানবে সিগারটাই ?'

স্নীলকুমার নন্দী

মার্কিন কবিতা



পাপড়ি মেলিল বিশ্ব



কন্দর্পদেব

তাঁরা তো তর্জনী দিয়ে চেপে ধরে রাখেন অধর,
দ্যুলোকের শক্তিধর, স্বচ্ছন্দে তাঁদের যাওয়া-আসা,
সমুদ্র খণ্ডিত করে তাঁদের দ্বীপের কত চর,
মহাসাগরের তলে ডোবে কত চন্দ্রমা ভাস্বর,
তাঁরাও বাসেন ভালো কিন্তু নামহীন ভালোবাসা ॥

বিষ্ণু দে

রঢোরা

সিন্ধুর বাতাস যবে ধ্বস্ত করে বিবিক্তি মে-মাসে,
রঢোরার সজীবতা হেরি আমি শান্ত বনবাসে,
নিষ্পত্র কুসুমগুলি ফুটে আছে নিভৃতির কোণে
মরু আর ক্ষীণকটি তটিনীর তুষ্টি বিতরণে।
লাজবর্ণ দলগুলি খসে-যাওয়া, ছোঁয় পুষ্করিণী
কাজল ও জলরাশি রূপরঙ্গে করে ঝলোমল।
পালক জুড়াতে আসে রাঙা পাখি রংরেজিনী
যেহেতু সুলভ সাজ, প্রেমে তাই বাঁধে ফুলদল।
রঢোরা, কখনো যদি শুধান তোমাকে মুনিঋষি
কেন বৃথা রূপরাশি ঝরে মর্তে-নভে দিবানিশি
সুলক্ষণা, বলো তবে, যদি দৃষ্টি তরে অক্ষিদুটি
তাহলে সৌন্দর্য ফুটে করে কিবা মিছে দোষ-ত্রুটি :
গোলাপের প্রতিদ্বন্দ্বী কেন তুমি, কেন প্রতিষ্ঠিত
এই প্রশ্ন কোনোদিন মানসে হলো না জাগরূক।
তবু, অজ্ঞানতা বলো, আমি ভাবি, সে শক্তি অমিত
এনেছে আমাকে ঘটে, তোমাকে এনেও তারই সুখ।

সুনীল বসু

এডগর অ্যালান পো

হেলেন

হেলেন, তোমার মুখ নিসিয়ার জাহাজের মতো
পাড়ি দিত গন্ধময় একখানি সমুদ্রের বুকে,
ঘরহারা নাবিকেরে পরিচিত তীরে পৌঁছে দিত,
নিরাপদ নীড়ে তার, জন্মভূমি, উত্তরিত শোকে,
পুরাকালে লক্ষ্যভেদী অমোঘ যাত্রায় সুখে-দুখে।

বেপরোয়া ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ঢের ঘুরে ক্লান্ত বহুদিন—
তোমার ধ্রুপদী মুখ, ভেসে আসা হায়াসিন্থ্ চুল,
হে নায়াড, তোমার লীলা, হে অপ্সরী বিলীন
জলের বিভঙ্গে,—তুমি উন্মোচিত করো মর্মমূলে
রোমের ঐশ্বর্য আর গ্রীসের মহিমা প্রাচীন।

দেখো, শুধু চেয়ে থাকি, অপলক, অদূরবর্তিনী
গবাক্ষে আশ্রিত তুমি, সন্নিকট নিঃশব্দ মূর্তি
মূর্চ্ছাহত, মায়াবিনী, যেন থেমে গেছে তার গতি,
হাতখানি ধরে আছে ধাতুর প্রদীপ। বলতে নেই,
আ, তুমি সাইকী, তুমি তীর্থভূমি হতে আনা রতি।

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জোন্স ভেরি

শেষ বর্ষণ

উৎকণ্ঠী দ্রুততায় ঝরে যায় শেষের বর্ষণ
রবিকরে দগ্ধ মাঠে মাঠে ওই বৃক্ষের শাখায়
শুষ্ক আগাছাকে করে শিথিল বৃষ্টির অন্বেষণ
জলধারা শক্তিহীন শিকড়ের লাগে শুশ্রূষায়।

বসন্তকালের মতো তৃণখণ্ডে কই সবুজিমা
প্রসারিত করে না তো কোনো শাখা পত্রালি-নিচয়
গায়ক পক্ষীরা পশে যবে শস্তকালে মধ্যসীমা
খুঁটে খায় খসা বীজ ছড়ানো যে-সব নয়-ছয়।
কান্তিহীন জলধারা, ভূপতিত পরিপক্ক ফল
বেঁধা-জল বাদামের ছালে, যত আখরোট খোলে,
চষা ক্ষেতে শুধু হাসে সীমাহীন হলুদ ফসল
আরোপিত, বিকশিত প্রতি বীজ আপাতত বলে :
প্রাক্-বর্ষণের স্বাদ যারা পেয়েছিল সুসময়
ফলাফল ব্যর্থ নয় তাদের, হয়নি অপচয়॥

সুনীল বসু

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান

লুইসিয়ানাতে ওকগাছ

লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তাজা ওকগাছ বেড়ে উঠছে;
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো থেকে শ্যাওলা পড়ছে ঝুলে।
কোনো দোসর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।
এর কড়া খাড়া তেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে আমারই নিজেকে।
আশ্চর্য লাগল, কেমন করে এগাছ ব্যক্ত করছে খুশিতে ভরা
আপন পাতাগুলিকে

যখন না আছে ওর বন্ধু না আছে দোসর।
আমি বেশ জানি, আমি তো পারতুম না।
গুটিকয়েক পাতাওয়ালা একটি ডাল তার ভেঙে নিলেম,
তাতে জড়িয়ে দিলেম শ্যাওলা।
নিয়ে এসে চোখের সামনে রেখে দিলেম আমার ঘরে;
প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ করবার জন্যে যে তা নয়।

(সম্প্রতি ঐ বন্ধুদের ছাড়া আর কোনো কথা আমার মনে ছিল না।)
ও রইল একটি অদ্ভুত চিহ্নের মতো,
পুরুষের ভালোবাসা যে কী তাই মনে করাবে।
তা যাই হোক, যদিও সেই তাজা ওক গাছ
লুইসিয়ানার বিস্তীর্ণ মাঠে একলা ঝল্‌মল্‌ করছে,
বিনা বন্ধু বিনা দোসরে খুশিতে ভরা পাতাগুলি প্রকাশ করছে
চিরজীবন ধরে,

তবু আমার মনে হয়, আমি তো পারতুম না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিখুঁত

ঘাসের ডগাও যা
নক্ষত্রদের চলাও তাই, আমি জানি
কালির একটি কণা, আর পিঁপড়ে, আর
বাবুই পাখির ডিম সবই সমান নিখুঁত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘাস

শিশুটি বললে : ঘাস কী ? দু-হাত ভরে একমুঠো আমার কাছে তুলে ধরে,
শিশুটিকে কী করে জবাব দিই ? ওর বেশি কিছু আমিও জানি না।
ঘাস বোধ করি আমার স্বভাবের নিশান, আশার সবুজ কাপড়ে বোনা।
কিংবা বোধ করি ঈশ্বরের রুমাল,
এক সুবাস উপহার, এক স্মারক, স্বেচ্ছায় খসে-পড়া,
মালিকের নামটি কোথাও এক কোণে লেখা, যাতে আমরা দেখব আর
বলব : কার ?
কিংবা বোধ করি ঘাসও এক শিশু : উদ্ভিদ বিশ্বের লালিত সন্তান॥

বিষ্ণু দে

শুনছি আমেরিকার গান

আমেরিকা গাইছে, আমি শুনতে পাই
শুনি বিচিত্র তার সংগীত।
গাইছে মিস্ত্রিরা নিজের, নিজের গান
জোরাল উল্লাস তাদের কণ্ঠে।
গাইছে ছুতোর তার কাঠের গুঁড়ি কি তক্তা
মাপতে মাপতে
রাজমিস্ত্রি গাইছে কাজের আগে বা পরে,
মাঝির গান তার নৌকোর সম্পত্তি নিয়ে
মাল্লা গাইছে স্টীমারের পাটাতনে।
মুচিরা গাইছে বসে তার কাছে,
টুপিওয়ালা তার দোকানে দাঁড়িয়ে,
কাঠুরে আর লাঙল কাঁধে চাষী,
গাইছে সকাল দুপুর আর সন্ধ্যায়,
কাজের শুরুতে বিশ্রামের ফাঁকে আর কাজের শেষে।
মায়ের মধুর গান ; গান তরুণী বধূর,
সেলাই কি ধোলাইয়ের কাজে মেয়েদের গান।
যার যার নিজস্ব সব গান সারা দিন,
তার পর রাত্রে মিশুক প্রাণবন্ত সব তরুণ-তরুণী,
গাইছে মুক্তকণ্ঠে বলিষ্ঠ তাদের গান।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ব্রুকলিনের খেয়া

১

নিচে উদ্দাম জলস্রোত! আমি মুখোমুখি দেখছি তোমাদের!
পশ্চিম আকাশের মেঘ,— সকালবেলার প্রথমে সূর্য—
তোমাদেরও দেখছি মুখোমুখি।
গতানুগতিক পোশাক-পরা হাজার-হাজার মানুষের ভিড়,
কী রহস্যময় তোমরা আমার কাছে।

খেয়া নৌকয় যারা বাড়ি ফিরছে সেই অসংখ্য মানুষ ভাবতে পারবে না কতটা রহস্যময় আমার কাছে, এবং তুমি ভবিষ্যতে যে এক তীর থেকে অন্য তীরে যাবে আমার কাছে আরো বেশি রহস্যময়, আমার কল্পনায় আরো বেশি রহস্যময়, আমার কল্পনায় আরো বেশি উজ্জ্বল, ভাবতে পারবে না তা কতটা।

২

প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি বস্তু থেকে উদ্ভূত এই আমার বিশেষ দুর্বোধ্য উপজীবিকা,
সরল, সংযত, নিপুণ পরিকল্পনা, সেখানে আমি নেই, সেখানে কেউ নেই, অথচ আমরা সকলেই সেই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত,
অতীতের সারূপ্যে এবং ভবিষ্যতের-ও,
পথ দিয়ে যখন হাঁটি, নদীর ওপর দিয়ে যখন ভেসে চলি সেই মহান সূত্র মালার মতো আবেষ্টন করে থাকে আমার দৃষ্টি, আমার শ্রুতি,
স্রোত কী দ্রুত প্রবাহিত, ভাসিয়ে নিয়ে যায় সুদূরে, আগামী-কালের মানুষ তাদের সঙ্গে আমার সংযুক্তি, তাদের বিশ্বাস, তাদের জীবন, প্রেম, দৃষ্টি, শ্রুতি সবার সঙ্গে।

আরো অনেকে খেয়াঘাটে উপস্থিত হবে, যাবে এক তীর থেকে অন্য তীরে,
দেখবে উদ্দাম জোয়ারের জল,
দেখবে উত্তর-পশ্চিম জুড়ে মানহাট্টানের জাহাজের যাওয়া-আসা, দক্ষিণ-পুবদিকে ব্রুকলিনের দৈর্ঘ্য,
দেখবে ছোটো-বড়ো কত দ্বীপ,
পঞ্চাশ বছর পরে নদী পার হবার সময় আরো অনেকে দেখবে এই দৃশ্য, দেখবে সকালবেলার প্রথম সূর্য-ওঠা,
একশো বছর পরে কিংবা হাজার-হাজার বছর পরেও সকলে এই এক-ই দৃশ্য দেখবে,

উপভোগ করবে সূর্যাস্ত, বন্যাস্রোতের খরতা, জোয়ারের জলের সাগর-সম্মিলন।

৩

দেশ-কালের কথা ভাবি না, মিথ্যা মনে হয় সময়ের ব্যবধান,
আমার সমসাময়িক তোমরা, আমি তোমাদের সঙ্গী, যেমন আমার সখ্য আগামীকালের সকল মানুষের সঙ্গে,
নদী কিংবা আকাশ-দেখা তোমাদের অনুভবের সঙ্গে আমার অনুভবও অভিন্ন,
প্রাণময় জনস্রোতের অন্যতম যেমন তোমরা, আমিও সেইরকম ছিলাম
আমিও উজ্জীবিত হয়েছি তোমাদের মতো আনন্দিত নদীর উজ্জ্বল প্রবাহে,
রেলিংয়ে ভর দিয়ে যেমন তোমরা দাঁড়াও, ভেসে যাও খরস্রোতে, আমিও সেইরকম দাঁড়িয়েছি এবং ভেসেছি, যেমন তোমরা দেখো অসংখ্য জাহাজের মাস্তুল, স্টিমারের মোটা নল, আমিও সেইরকম দেখেছিলুম।

আমিও অনেকবার পার হয়েছি সেই পুরোনো নদী, দেখেছি ঊর্ধ্বাকাশে তরুণ শঙ্খচিল সমস্ত শরীর স্পন্দিত করে স্থির ডানায় ভেসে চলেছে,
দেখেছি কেমন করে দ্যুতিময় হলুদ ঝলমল করে ওঠে তাদের দেহের এক দিকে, পরিত্যক্ত অন্যদিকে প্রগাঢ় তমসা, দেখেছি শ্লথগতি ডানার বৃত্ত, দক্ষিণের দিকে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে,
দেখেছি জলের ভিতর গ্রীষ্মের আকাশের ছায়া, আমারও দৃষ্টি ঝলসিত হয়েছে আলোকরশ্মির প্রদীপ্ত কম্পনে, লক্ষ্য করেছি রৌদ্রদীপ্ত জলে কেন্দ্রচ্যুত আলোকবৃত্ত আমার মুখের ছায়া পরিবৃত করে, লক্ষ্য করেছি দক্ষিণদিকে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পাহাড়ের উপর কুয়াশা,
ভায়োলেট রঙে রঞ্জিত পশমের মতো বাষ্প ভেসে চলেছে,

নিম্ন উপসাগরের দিকে তাকিয়ে থেকেছি জাহাজের আগমন লক্ষ্য করার জন্য,
দেখেছি তাদের অভিগমন, সুস্পষ্ট দেখেছি তাদের যারা আমার নিকটবর্তী ছিল,
দেখেছি ছোটো-বড়ো জাহাজের দ্রুতগতি, দেখেছি নোঙর-রুদ্ধ জাহাজগুলি,
নাবিকেরা ব্যস্ত জাহাজের সাজ-সজ্জায় কিংবা বড়ো-বড়ো পা ফেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে,
আবর্তিত মাস্তুল, দোলায়মান জাহাজ, উন্নত সর্পিল পতাকা,
ছোটো-বড়ো স্টিমার চলেছে, পরিচালকেরা রয়েছে পরি-চালকদের ঘরে,
পিছনে ফেলে-আসা শুভ্র ফেনিল জলরেখা, কম্পমান চক্রের দ্রুত আবর্তন,
সকল জাতির পতাকা, সূর্যাস্তে তাদের অবনমন,
শামুকের মতো বিসর্পিল তরঙ্গ ম্লান প্রদোষের আলোয়, পানপাত্র, আনন্দিত চূড়ার দ্যুতি,
বিস্তৃত সুদূর ক্রমশ ম্লান থেকে ম্লানতর, ডেকের পাশে গুদামঘরের ধূসর দেয়াল,
নদীতে ছায়াচ্ছন্ন অর্ণবশ্রেণী, স্টিমারের দুইপাশ ঘিরে বজরার সারি, খড়-বোঝাই নৌকো, বিলম্বিত অনাবৃত বড়ো নৌকো,
নিকটবর্তী উপকূলে কারখানার চিমনির দীপ্ত প্রজ্বলন রাত্রির অন্ধকারে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, প্রগাঢ় রক্তিম এবং হলুদ আলোর পাশে তাদের তামসী চঞ্চল প্রভা ছড়ায় বাড়ির চূড়ায়, রাস্তার ফাটলে।

৪

এই সমস্ত দৃশ্য এবং বাকি আর সবকিছুই তোমাদের কাছে যেমন আমার কাছেও ঠিক তেমন ছিল,
ভালোবেসেছিলুম সেই শহরগুলিকে, ভালোবেসেছিলুম মহিমান্বিত দ্রুতগতি নদী,

পরিচিত সকল মানুষই ছিল আমার আপন, অন্যেরাও ঠিক তেমনই—তারা আমার দিকে ফিরে চেয়েছিল যেহেতু আমি চেয়েছিলুম তাদের দিকে, (সময় আসবে, যদিও আজ এখানে থেমেছি)

৫

তাহলে আমাদের মধ্যে ব্যবধান কোথায় ?
আমাদের ভিতর হাজার-হাজার বছরের দূরত্বের হিসেব করার কী অর্থ ?

সে যা-ই হোক, সবকিছুই অর্থহীন, দূরত্ব অথবা স্থানের ব্যবধান,
আমিও বেঁচেছিলুম, অসংখ্য পাহাড়-ভরা ব্রুকলিন ছিল আমার,
মানহাট্টান দ্বীপের পথে-পথে আমিও হেঁটেছি, স্নান করেছি তার চারিদিকের সমুদ্রে,
আমিও অনুভব করেছি আমার হৃদয় কম্পিত করেছে রহস্যময় সচকিত প্রশ্ন, ভিড়ের মধ্যে দিনেরবেলায় কখনও তারা এসেছে, কখনো গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরবার পথে অথবা বিছানায় শুয়ে তাদের জেনেছি
আমিও শাশ্বত সমাধানের স্রোত থেকে হয়েছি বিচ্যুত, শরীরের মধ্যবর্তিতায় ছিল আমারও পরিচিতি,
ভেবেছিলুম আমার শরীর-ই আমি এবং ভবিষ্যতে যা আমি হব তা আমার শরীর-ই।

৬

কেবল তোমাদের উপরেই নামেনি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অন্ধকার,
অন্ধকার তার কদর্য পিণ্ড ছুঁড়েছে আমার দিকেও,
সকল শুভ প্রচেষ্টাকে মনে হয়েছে অর্থহীন, সংশয়াচ্ছন্ন, যাকে মনে করেছিলুম মহৎ পরিকল্পনা, বস্তুত, তা কি ছিল না নিতান্ত সামান্য ?

পাপের যন্ত্রণা কেবল তোমরা একাই জানোনি, আমিও
জেনেছি পাপ কাকে বলে,
আমিও সংযোজিত করেছি দুই বিপরীতের দ্বন্দ্ব, হয়েছি
বাচাল, লজ্জা পেয়েছি, ক্রুদ্ধ হয়েছি, মিথ্যা বলেছি, করেছি
অসন্তোষের প্রকাশ,
আমার মধ্যেও ছিল শঠতা, ক্রোধ ছিল, কামুকতা ছিল,
ছিল অনুচ্চার্য উন্মত্ত কামনা,
আমিও ছিলুম যথেচ্ছাচারী, দাম্ভিক, লোভী, শূন্যগর্ভ, চতুর,
কাপুরুষ এবং বিদ্বেষী,
আমার মধ্যেও ছিল নেকড়ে বাঘের হিংস্রতা সাপ আ
শুয়োর,
প্রতারকের দৃষ্টি, নির্বোধ উক্তি, ব্যাভিচারীর কামনা কোনো
কিছুর-ই অভাব ছিল না আমার মধ্যে,
অস্বীকৃতি, ঘৃণা, দীর্ঘসূত্রতা, নীচতা, আলস্য, কোনো
কিছুর-ই অভাব ছিল না আমার মধ্যে, আর সকলের-ই
মতো আমি, আর সকলের-ই মতো প্রতিদিনের সাধারণ
ঘটনার,
যাওয়া আসার পথে তরুণেরা আন্তরিক, দীপ্ত কণ্ঠে আমাকে
ডেকেছে আমার ডাক নাম ধরে,
যখন-ই উঠে দাঁড়িয়েছি আমার কাঁধে হাত রেখেছে তারা,
যখন-ই বসেছি অনুভব করেছি তাদের অলস স্পর্শ সমস্ত
শরীর ভরে,
অনেক প্রিয়মুখ দেখেছি রাজপথে, খেয়ানৌকোয়, জনসভায়,
কোনো কথাই বলিনি তাদের সঙ্গে, সকলের মতোই বেঁচেছি,
আহার-নিদ্রা আর আনন্দে, সকলেরই মতো, ফিরে
তাকিয়েছি অভিনেতা অভিনেত্রীর দিকে, সেই এক-ই
ভূমিকায়, যে ভূমিকা আমরা নিজেরাই রচনা করেছি, যত
মহৎ করা সম্ভব ততোটা, কিংবা যত ক্ষুদ্র করা সম্ভব
ততোটা কিংবা একই সঙ্গে ক্ষুদ্র এবং মহৎ করে রচনা করেছি
তাকে।

৭

অত্যন্ত আপন, তবু প্রশ্ন করি,
এখন আমার সম্বন্ধে কী ভাবছ তোমরা, তোমাদের
অনেক কিছুই জানি আমি, অনেক আগে থেকেই জানি,
তোমাদের জন্মের আগে দীর্ঘদিন গভীরভাবে ভেবেছি,
ভেবেছি তোমাদের কথা,
কী আছে আমার ভাগ্যে কে জানে?
কে বুঝবে সবকিছুই আমি উপভোগ করছি?
কে বুঝবে, যদিও দূরত্ব অসীম, তবু স্পষ্ট দেখছি তোমাদের
যদিও তোমরা কেউই আমাকে দেখতে পাচ্ছ না?

৮

মাস্তুলের মুকুট-পরা মানহাট্টানের চাইতে আর কী আমার
কাছে মহিমান্বিত বিস্ময়ের?
নদী, সূর্যাস্ত, শামুকের মতো বিসর্পিল তরঙ্গ,
সমস্ত শরীর স্পন্দিত করে শঙ্খচিলের উড়ে-যাওয়া, গোধূলির
আলোয় খড়-বোঝাই নৌকো, শ্লথগতি অনাবৃত বড়ো নৌকো
এর চাইতে আর কী বিস্ময়ের?
কোন্ ঈশ্বর আরো নিবিড়ভাবে আমার দু-হাত হাতে নিতে
পারেন, কে আমাকে ডাকতে পারে আরো স্বতঃস্ফূর্ত প্রিয়
স্বরে আমার ডাক-নাম ধরে?
কে আমাকে বাঁধতে পারে আরো নিগূঢ় বাঁধনে এই সব
পরিচিত নরনারীর চাইতে?
যা আমাকে মিলিয়েছে তোমাদের সঙ্গে, তোমাদের ভিতর
খুঁজে পেয়েছে আপনার অর্থ?
তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি? বুঝতে কি পারিনি?
আমার অকথিত প্রতিজ্ঞা কি সমর্থন করো না তোমরা?
কোনো অনুশীলন-ই যা শেখাতে পারে না, কোনো ধর্মীয়
নির্দেশই যা অর্জন করতে পারে না, তা অর্জিত হয়েছে,
হয়নি কি?

প্রবাহিত হও নদী, প্রবাহিত হও জোয়ার আর ভাঁটায় !
করো খেলা করো বঙ্কিম তরঙ্গমালা, ফেনার চূড়া মাথায় পরে !
সূর্যাস্তের বিচিত্রিত মেঘ সিক্ত করো আমাকে তোমার বর্ণালিতে, সিক্ত করো তাদের যারা আসছে আমার পরে— সেই ভাবীকালের নরনারী !
অগণন যাত্রী তোমরা যাও এক কূল থেকে অন্য কূলে, মানহাট্টানের উন্নত মাস্তুল ওঠো দাঁড়িয়ে ওঠো, দাঁড়িয়ে ওঠো ব্রুকলিনের অপরূপ পাহাড় ।
হও স্পন্দিত হও সংশয়াকুল সংবেদনী চেতনা ! বিকীর্ণ হোক জিজ্ঞাসা এবং সমাধান !
সর্বত্র প্রবাহিত হোক সমাধানের শাশ্বত তরণী !
তাকাও, উৎসুক প্রিয় দৃষ্টি, তাকাও প্রতিটি বাড়িতে, রাজপথে, জনতার ভিড়ে !
মুখর হও, হে তরুণ কণ্ঠ, মধুর উচ্চকণ্ঠে ডাকো আমায় আমার ডাক নাম ধরে !
জাগো, পুরোনো জীবন ! অবতীর্ণ হও সেই ভূমিকায় যা ফিরে চায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর দিকে !
সেই পুরোনো ভূমিকা, যার মহত্ত্ব অথবা ক্ষুদ্রতা নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছার উপর !
একবার মনে করো, তোমরা, যারা এই কবিতা পাঠ করছ, অন্তরাল থেকে হয়তো তোমাদের আমি দেখছি, সুদৃঢ় হও, জাহাজের দু-পাশের রেলিং, রক্ষা করো তাদের যারা রেলিংয়ের ভর দিয়ে অলসভাবে দাঁড়িয়ে ভেসে যায় খরস্রোতে,
উড়ে যাও সাগর-পাখিরা, উড়ে যাও এক প্রান্ত ধরে অথবা ঊর্ধ্বাকাশে রচিত করো ডানার বিশাল বৃত্ত,
গ্রহণ করো জলস্রোত গ্রহণ করো গ্রীষ্মের আকাশ, নিবিড়-ভাবে রাখো তোমার বুকে, আমাদের নতদৃষ্টি যতক্ষণ তার ছবি দেখবে তোমার ভিতর ।

বিকীর্ণ হও আলোকবৃত্ত, রৌদ্রদীপ্ত জলে আমার কিংবা আরো কারো শরীরে প্রতিফলিত হয়ে!
নিম্ন উপসাগর থেকে উপনীত হও ছোটো-বড়ো সকল জাহাজ, যাত্রা অথবা প্রত্যাবর্তনের পথে ভাসিয়ে দাও শ্বেত-পাল

উন্নত করো সকল জাতির পতাকা, নমিত করো গোধূলি-বেলায়।
প্রজ্বলিত করো কারখানার চিমনি, প্রজ্বলিত করো তোমার আগুন, রক্তিম হলুদ আলো ছড়াও বাড়ির চূড়ায়-চূড়ায়!
এই সমস্ত দৃশ্য বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে, তোমাদের স্বরূপে নির্দেশবহ,
অনিবার্য অবগুণ্ঠনে পরিবৃত করো আত্মা,
স্বর্গীয় সৌরভে পরিপূর্ণ হোক সকলের,
সমৃদ্ধ হও নগরী, অসংখ্য স্বচ্ছল নদী আনো তোমাদের পণ্য, আনো তোমাদের গৌরব,
বিস্তৃত হোক সেই সত্তা যার চাইতে গভীরতর সম্ভবত আর কিছু নেই, চিরস্থায়ী হোক সকল দেশ যার চাইতে শাশ্বত আর কিছু নেই।
তোমরা অপেক্ষা করেছ, তোমরা অপেক্ষা করো, হে নীরব অপরূপ পরিচালক,
পরিশুদ্ধ চেতনায় গ্রহণ করলাম তোমাদের, আকাঙ্ক্ষা আর আমাদের পরিতৃপ্ত হবে না,
আর পারবে না আমাদের নিরাশ করতে, এড়িয়ে যেতে পারবে না আমাদের
তোমাদের নিয়েই জীবন, কখনো ভুলিনি তোমাদের, চির-স্থায়ী প্রতিষ্ঠা করেছি তোমাদের আত্মার গহনে,
কোনোদিন জানতে চাইনি তোমাদের, কেবল ভালোবেসেছি,
জেনেছি তোমাদের ভিতরেও আছে পরিপূর্ণতা,
অনন্তের দিকে বিস্তৃত করেছ তোমাদের সাধনা,

সামান্ত অথবা অপরিমেয় যাই হোক, আত্মার পরিপূর্ণতায়
বিস্তৃত করেছ তোমাদের সাধনা।

আলোক সরকার

এমিলি ডিকিনসন

কখনো দেখিনি

আমার এ জীবনে সাগর দেখিনি তো—
কেমন রূপ ধরে শ্যামল জলাভূমি
তবুও জানি কাঁপে কী করে উলুবন—
সাগরে ঢেউ তোলে কী ছাঁদে মৌস্থমী।

হৃদয়ে বিশ্বাস কোথাও খুঁজে পাব
কেমন ঈশ্বর কেমন মুখ তাঁর
যদিও স্বর্গের গড়ন জানিনাক

চেনা সে দিশা যেন পথের ঠিকানার।

কবিতা সিংহ

তির্যক রোদ্দুর

শীত এলে এক তির্যক রোদ্দুর
বিকেলগুলিতে ঝরে
নির্জিত করে, যেন গির্জের সুর
হৃদয়কে চেপে ধরে।

সৌর আঘাতে সে অবসন্ন করে ;
কিন্তু দেখি না যত,

পার্থক্যটা আছে অভ্যন্তরে
সঙ্কেত গুহাহিত।

একে তো শেখাতে পারবে না কোনো জন,
যাতনা, অভিজ্ঞান
আমাদের দিকে বায়ুপ্রেরিত সে যে
সন্তাপ মহীয়ান।

সে যখন আসে, দৃশ্য নীরবে শোনে,
ছায়া রুদ্ধশ্বাস,
যখন সে যায়, মৃত্যুর চোখে যেন
দৃষ্টি দূর, উদাস॥

সুপর্ণা সেন

আত্মা বেছে নেয় তার পথ

আত্মা বেছে নেয় তার পথ
তারপর রুদ্ধ করে দ্বার।
তার সেই স্বর্গীয় স্বমত
কখনো কোরো না অস্বীকার।

নির্বাক সে শোনে মৃদু শকটের যতি
তার ক্ষুদ্র সদর দরজায়।
নিশ্চল সে সম্রাটের অষ্টাঙ্গে প্রণতি
দেখে তার ভূমিষ্ঠ কাঁথায়।

আমি যে দেখেছি তাকে বহুর সমাজে
নাও বেছে এক।
তারপর দেয়ালেতে যত দৃষ্টিপথ খোলা আছে
সমস্ত মিলাক।

দেবতোষ বসু

একটি হলুদ তারকা···

একটি হলুদ তারকা ঊর্ধ্বে নীলিমায়
চরণ রাখল লঘুভার,
চন্দ্র সরাল পবিত্র মুখ থেকে
বাঁধন রুপালি টুপিটার।
যেন বা সন্ধ্যা অস্ফুট জলে
নাক্ষত্রিক হর্ম্যে—
'হে পিতা, তোমরা নিয়মনিষ্ঠ'
স্বর্গকে আমি জানালাম এই মর্মে।

মানস রায়চৌধুরী

এমি লোয়েল

সুন্দরী

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি—
যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর
বাজছে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।
কিংবা তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায়
যেন রেশমের আসবাব, তাতে রোদ পড়েছে।
তোমার চোখের আয়ুহারা মুহূর্তের
ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে।
তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,
ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে রাখা মাথাঘষা মশলার মতো তার ঝাঁজ।
তোমার অতিকোমল সুরের আমেজ আমার লাগে ভালো,—
তোমার ঐ মিলেমিশে-যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে
আমার মন ওঠে মেতে।

আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পয়সা

তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।

ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,

তার ঝকমকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রেখালেখ্য

হেঁটে যাই আমি বাগানের পথ ধরে,
এবং ওখানে সমস্ত ড্যাফোডিল
পুষ্পিত হয় এবং দীপ্ত নীলাভ অপরাজিতা।
হেঁটে যাই আমি রূপকল্পিত বাগানের পথে
এই অনম্য বুটিদার এক রেশমি ঘাগরা পরনে আমার।
রঙ্-করা চুল, পাথর বসানো হাতপাখা নিয়ে
আমিও একটি বিরল
আলেখ্য। আমি হেঁটে চলে যাই
বাগানের পথ ধরে।

বসনে আমার জমকালো কারুকাজ,
এবং দীর্ঘ ঘাগরা
এঁকে যায় ফিকে গোলাপি রূপালি ছোপ
কাঁকরে এবং পরিমিত-রেখা
লুটানো পাড়ের।
চলতি ছাঁদের একটি নমুনা,
উঁচু-হিল জুতো রেশমি ফিতেয় সাজানো, আমার লঘুপায়ে হাঁটা
আমার মধ্যে কোথাও একটু পেলবতা নেই
শুধুই ব্রোকেড, পোশাকে তিমির-হাড়।
তারপর বসি লেবু গাছটার
ছায়ার আসনে। আমার কামনা
বুটিদার ওই ব্রোকেড সরাতে চায়।

ড্যাফোডিল আর অপরাজিতারা
উড়ছে বাতাসে
খুশিমতো তারা।
তবু আমি কাঁদি;
কেননা এ লেবুগাছটি এখন ফুটবার মুখে
কখন একটি ফুল ঝরিয়েছে ঢেকে-রাখা বুকে

জলবিন্দুর এই জালিকাজ
মর্মর ঝর্নায়
বাগানের পথে যেতে দেখা যায়
জল ঝরানি যে কখনো থামে না।
আমার শক্ত ঘাগরার তলে যেন ডুবে আছে
মর্মরে-গাঁথা বেসিনে কোমল স্নানরতা নারী
বেসিন গোপন লতাগুল্মের ভিতরে,
এত ঘন ঝোপ তাই সে দেখতে পায় না প্রেমিক লুকানো
সে আছে কাছেই অনুমিত হয়
জলের ভিতরে পিছল স্পর্শে
মনে হয় ছোঁয়া পিঠের উপরে
মোহনিয়া কোনো হাতে।
গ্রীষ্ম কেমন নয়ন-সুভগ কারুকাজ করা ঘাগরায়।
আমি চাই এই সজ্জিত-ভূষা মাঠের উপরে পড়ে আছে এলোমেলো
এর সমস্ত গোলাপি-রুপালি একতাল হয়ে ঘাসে।

ছুটন্ত, এই পথ ধরে গেলে আমি তো হতাম গোলাপি-রুপালি
আমার হাসিতে হত-বিহ্বল
প্রণয়ী আমার পড়ত পিছিয়ে।
দেখতে পেতাম ঝলসায় আলো অসির হাতলে, জুতোয় ধাতব-
বকলেস।

ঈপ্সা আমার
তাকে নিয়ে যেত আঁকিবুঁকি কাটা পথ ধরে এক গহীন ধাঁধায়
ভারি-জুতো পরা প্রেমিক আমার মনোহর আর কৌতুকী এক
গোলকধাঁধায়,
যতক্ষণ না আমাকে সে বাঁধে ছায়ার বাঁধনে,
আশ্লেষে নিলে কোটের বোতামে পিষ্ট আমার তনু
পীড়িত, আর্দ্র নির্ভয় ?
কাননের ছায়া রৌদ্রদীপ্তি
এদিকে ক্ষরিত জলের বিন্দু
আমাদের ঘিরে সবই আছে এই অবারিত বেলাশেষে।
হয়তো এখনই মূর্ছিত হব
বুটিদার এই রেশমি জামার ভারে,
ছায়ার চালুনি ঝরায় দিনের আলো।

ঝরিত ফুলের একটু নিচেই
আমার বক্ষলীন
একটি লিপিকা গোপন রেখেছি।
এই লিপি বয়ে এনেছে সকালে ডিউকের এক পত্রবাহক
'শ্রীমতী, আমরা গভীর দুঃখে নিবেদন করি লর্ড হারো'য়েল
বিষ্যুদবার সন্ধ্যারাত্রে মারা গিয়েছেন যুদ্ধে।'
সকালে শুভ্র আলোয় এ লেখা
কেঁপে উঠেছিল সর্পিল।
'কিছু উত্তর দেবেন ভদ্রে ?' পরিচারকের গলা।
বললাম তাকে—কিছু না।
'দেখো যেন ওই পত্রবাহক অন্তত কিছু জলযোগ করে যায়,
আর, না, না কোনো উত্তর নয়।'
তারপর যাই বাগানের দিকে
বন্ধুর সেই ভঙ্গিল পথে
শক্ত নিখুঁত ব্রোকেডে আচ্ছাদিত।

হলুদ এবং নীল-ফুলগুলি গর্বিত মাথা তুলেছে, সূর্যে
প্রতিটি প্রসূন,
আমিও তেমনি উঠে দাঁড়ালাম দীপ্র,
নিজেকে শাসিত রাখি বিন্যাসে
ঘাগরার কঠিনতা।
উঁচু-নিচু পথে হেঁটে চলে যাই
উঁচু আর নিচু।

এক মাস গেলে সে হতো আমার স্বামী
এক মাস পরে এখানেই লেবুগাছটার তলে
এই আঙ্গিক ভেঙে ফেলতাম আমরা
সে হতো আমার, আর আমি তার
সেনাধিনায়ক, আমি তার গৃহকর্ত্রী।
তার ছিল এক অন্ধ ধারণা
সূর্যকিরণে রয়েছে আশীর্বাদ।
আমি বলতাম—'তুমি যা ভাবছ হয়তো তা আছে'
এখন সে মৃত্যুর।

গ্রীষ্ম এবং শীত ঋতুতেও আমি হেঁটে যাব
অসমান এই
বিভঙ্গময় বাগানের পথে
এই অনন্ত বুটিদার ঘাগরায়।
অপরাজিতা ও ড্যাফোডিল ঝরে ঠাঁই করে দেবে
স্তম্ভপ্রতিম গোলাপগুলিকে, আর এস্টার এবং তুষারকণিকা।
আমি যাব এই
উঁচু-নিচু পথ
পরনে আমার ঘাগরা।
বিচিত্র অম্বুপুঞ্জ
অস্থিতে গাঁথা এবং কঠিন।

আমার তন্থর পেলবতা বাঁচে আশ্লেষহীনতায়
প্রতিটি বোতাম, অঙ্কুশ আর জরিদার ফিতে।
যেজন আমাকে অগোছালো করে দিত সে এখন মৃত,
ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে ডিউকের সহগামী
যুদ্ধ নামক কোনো এক মূর্তনে,
যিশু! বলো এই রূপবিচিত্রা কিসের জন্যে?

মানস রায়চৌধুরী

রবার্ট ফ্রস্ট

যে পথ হয়নি ধরা

দুটি পথ চলে গেছে পাণ্ডাশ জঙ্গলে,
হায় আমি পারব না দুটিতেই যেতে
একই পান্থ; ভাবি, বনবাদাড়ের তলে
একটি কোথায় মিশে কতদূর চলে
দেখি তাই নত হয়ে দুই চোখ পেতে;

তারপরে অন্যটিই ধরি, সেও বেশ,
হয়তো সেটার দাবি বেশি তুলনায়,
কারণ সেটিতে ঘাস সবুজ সরেশ,
যদিও তা পায়ে পায়ে একই শেষমেশ
অন্যটিরই মতো হবে তাতে ভুল নাই;

সেদিন সকালে দুটি পথের উপরে
একই সদ্য পাতা, পায়ে পায়ে কালো নয়,
প্রথমটি রেখে দিই অন্যদিন তরে,
অথচ একটি পথ অন্যপথে পড়ে
জানি, তাই ফিরি কিনা ছিল সে সংশয়।

কোথাও অনেকযুগ পরে কোনো দিন
দীর্ঘশ্বাসে এই কথা বলব হঠাৎ :
জঙ্গলে চলেছে দুটি পথ, আমি, দীন
আমি ধরি যেটি কম পান্থপদলীন ;
তাতেই হয়েছে এই যা-কিছু তফাৎ ॥

বিষ্ণু দে

আগুন আর তুষার

কেউ বলে, এই পৃথিবী পুড়বে আগুনে
কেউ বলে, যাবে তুষার-জাহান্নামে,
বাসনা কিংবা তৃষ্ণা যা দেখে শুনে
সায় দিতে হয় 'সবাই পুড়ব আগুনে',

কিন্তু ডুবার যদি হয় ছারখার
মনে হয়, আমি ঘৃণাও দেখেছি যত
ঠাণ্ডা বরফ, বরফের শাদা পাহাড়
তাও কালসংগ্রামে
যথেষ্ট অন্তত ॥

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

শীতসন্ধ্যায় বনের কিনারে থেমে

মনে হয় জানি, জানি এ বনানী কার।
হতে পারে তার গাঁয়েতেই আস্তানা ;
সে তো দেখল না আমি যে দেখছি তার
বনে আর বনে ছেয়েছে হিমতুষার।

ছোট্ট ঘোড়াটা ভাবে এটা কী-ব্যাপার
গোলাঘর ছাড়া দাঁড়ানো কী-দরকার

হিমার্দ্র হ্রদ আর বনানীর মাঝে
এ-সাঁঝেই যত আঁধার বছরকার।

নির্ঘাৎ কোনো গলতি হয়েছে ভেবে
ঘন্টিগুলোকে কাঁপায় সে কেঁপে-কেঁপে
ঝিরিঝিরি হাওয়া পাৎলা বরফ কুচি
ছড় টেনে যায় আরেক স্বরক্ষেপে।

বনানী গভীর শ্যামসুন্দর নাকি,
তবু তো কথায় দিতে পারব না ফাঁকি,
ঘুমোবার আগে আযোজন পথ বাকি,
ঘুমোবার আগে আযোজন পথ বাকি।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কার্ল স্যাণ্ডবার্গ

মাছের ফিরিওয়ালা

ম্যাকস্‌ওয়েল স্ট্রীটের ওদিকে মাছের ফিরিওয়ালা এক ইহুদিকে আমি চিনি; তার গলা শুনলে মনে হয় যেন কাটা-ফসল ক্ষেতের উপর দিয়ে পৌষালি হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।
সম্ভাব্য খরিদ্দারদের সামনে হেরিংমাছগুলো দোলাবার সময় তার মধ্যে এতো আনন্দ ফুটে ওঠে যে ঠিক মনে হয় যেন পাভলোভার নাচ হচ্ছে।
তার মুখ দেখলে মনে হয়, তা এমন একটি লোকের চেহারা যে মাছ বিক্রি করতে পারছে বলে মহা খুশি, এবং ভগবান যে মাছ সৃষ্টি করেছেন আর খরিদ্দার সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের কাছে যে সে ঠেলাগাড়ি করে তার পণ্য ফিরি করতে পারছে এতে তার আনন্দ আর ধরে না॥

অজিত দত্ত

সুখ

যে-সব অধ্যাপক জীবনের মানে বোঝান, আমি তাঁদের অনুরোধ করেছি সুখ কী আমাকে বলে দিতে।
আর বড়ো বড়ো খ্যাতিমান্ সব কর্মকর্তা, যাঁরা হাজার হাজার লোকের কাজের উপর প্রভুত্ব করেন, আমি তাঁদের কাছেও গিয়েছি।
তাঁরা সকলেই মাথা নেড়ে নেড়ে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছেন যেন আমি তাঁদের সঙ্গে রসিকতা করছি।
তারপর এক রবিবার বিকেলে ডেস্‌প্লেইন্‌স্ নদীর পাড় ধরে ধরে আমি ঘুরে বেড়ালাম—
দেখলাম সেখানে গাছের নিচে একদল হাঙ্গেরীয়ান বসে আছে ;—তাদের সঙ্গে রয়েছে মেয়েরা আর শিশুরা—আর রয়েছে এক পিপে মদ, আর একটা একর্ডিয়ান্ ॥

অজিত দত্ত

ঘাস

অস্টারলিৎস্ আর ওয়াটার্লুতে দেহগুলিকে স্তূপ করে রাখো।
তারপর কোদাল চালিয়ে সেগুলিকে মাটির নিচে চালান করে দিয়ে
আমাকে কাজ করতে দাও—
আমি হচ্ছি ঘাস, আমি সব ঢেকে দিই।
আর গেটিসবার্গে সেগুলি দিয়ে উঁচু স্তূপ বানাও,
উঁচু উঁচু স্তূপ করো ইপ্রেস আর ভার্দুনে।
তারপর কোদাল মেরে সেগুলিকে মাটির তলায় ঢুকিয়ে
আমায় কাজ করতে দাও।
দু বছর, দশ বছর, তারপর যাত্রীরা কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করে,
এটা কোন জায়গা ?

আমরা এখন কোথায় রয়েছি ?
আমি হচ্ছি ঘাস।
আমাকে কাজ করতে দাও॥

অজিত দত্ত

ওয়ালেস স্টিভেন্‌স্‌

নির্জন প্রাসাদ

মন্দ হলো ? আশা করেই এসেছিলাম,
এসে দেখি সেই বিছানায় কেউ নেই।

থাকত যদি এলোচুলের সর্বনাশ,
ঠাণ্ডা হাতের কঠিন চোখের বিরুদ্ধতাও।

থাকত যদি খোলা পাতায় একলা আলো
একটি-দুটি হৃদয়হীন পদ্যে ফেলা।

থাকত যদি পরদা জুড়ে অন্ধকার
শুধু হাওয়ার অন্তহীন নির্জনতা।

হৃদয়হীন পদ্য ? দুটি-চারটি কথায়
কেবল সুর বাঁধা যে সুর বাঁধা যে সুর বাঁধা।

ভালোই হলো। সেই বিছানায় কেউ নেই,
ভব্যতার শক্ত ভাঁজে পরদা ফেলা।

বুদ্ধদেব বসু

সৈনিক, মনের মধ্যে যুদ্ধ

সৈনিক, আকাশ আর মনের মধ্যেই আছে দ্বন্দ্ব,
চিন্তা ও দিনের কিংবা রাত্রির মধ্যেও। সে কারণে
কবি তো সমস্তক্ষণই সূর্যে অবস্থিত,

ঘরে বসে চাঁদকে তিনি ভার্জিলীয় রীতির সহিত
জোড়াতালি দেন, নিচে ওপরে, ওপরে আর নিচে।
এ এমন দ্বন্দ্ব যার কোনোদিন কোনো শেষ নেই।

তথাপি এ তোমার ওপরে একান্ত নির্ভর। দেখো দুটিতেই এক।
ওরা যে বহুবচন, দক্ষিণ এবং বাম, একটি জোড়াই,
দুইটি সমান্তরাল মিশে যায় কেবল তখনই

তাদের ছায়ার সম্মিলনে, কিংবা ও-সাক্ষাৎ
ব্যারাকে বইয়ের মধ্যে, মালয়ের একটি চিঠিতে।
তোমার যুদ্ধের কিন্তু শেষ হয়। তুমি তারপরে ফিরে যেও

সঙ্গে নিয়ে ছ'টুকরো মাংস আর বারোটি বোতল মদ অথবা না পেলে
অন্য কোনো ঘরে যেও…মঁসিয়ে কমরেড,
কবির পংক্তির চিহ্ন না থাকলে দরিদ্র সৈনিক,

তার ছোটো স্বরপর্ব, শব্দগুলি মারতে থাকে ঘা,
অনিবার্য আন্দোলিত রক্তের ভিতরে।
যুদ্ধের জন্যেই যুদ্ধ, প্রত্যেকেরই আভিজাত্য আছে।

কল্পনার নায়ক দেখো হে কী সহজে বাস্তবের হয় ;
কী আনন্দে যোগ্য বাণী দিতে দিতে সৈনিকটি মরে
অবশ্যই মরতে যদি হয়, অথবা সে বিশ্বস্ত বচনে বেঁচে থাকে।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

ফুলদানির দিকে তাকিয়ে মেয়েটি

বুঝি বা বজ্রই স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল
পিয়ানোতে সে-মুহূর্তে, যখন সূর্য ও আকাশের
পুঞ্জ পুঞ্জ অমার্জিত ঈর্ষাজর্জর তেজঃপ্রভা
স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাগানে ছড়ানো ইতস্তত,
যেন বায়ু গলে মিশে হয়ে গেল এক ঝাঁক পাখি,
মেঘগুলি হয়ে ওঠে বিমুনিবিন্যস্ত কুমারিকা,
এ যেন সমুদ্রটাকে ঢেলে দেয়া পুবালি বাতাসে
রাত্রিবেলা জোরে জোরে জানালার শার্সিতে আছড়ায়।

স্‌স্‌স্‌স্‌ ছোট্ট পেঁচা স্বতঃস্বননে, কী উপায়ে
সুদূর সুনীলশূন্য স্থানকালে বিশেষিত হলো
পাতায় কুঁড়িতে আর কী করে যে রক্ত-রঙ শেষে
দিকে দিকে শতনরী হাওয়ায় হাওয়ায় সন্ধিক্ষণে
হয়ে উঠল—কী করে যে রক্তের প্রধান মধ্যমণি
কৌশলে এড়িয়ে গেল একাকার আকারশূন্যতা
প্রথমে নিদাঘ, শেষে আরো কোনো স্বল্পায়ত ঋতু
তারপরে হয়ে গেল লিচুর, ন্যাসপাতির ত্বক।

লক্ষ্মীপেঁচা শাসাচ্ছিল কী করে যে নিসর্গের রঙ
জমছিল সেইখানে ও যেখানে উপবিষ্ট ছিল,
মানুষের মধ্যে সব মিটিয়ে নেওয়ার মতো, নাকি
প্রাজ্ঞতর সুরাহার মতো, সেই ঘটনা যেন-বা
দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত অস্তিত্বের স্বীকৃতি মহান্,
কী করে যে অমার্জিত বিরূপাক্ষ আকাঙ্ক্ষাশূন্যতা
রূপ হলো, বিষয়ের সত্তা হলো, সত্তার সুবাস
সূক্ষ্ম অতিমানসের চাতুরী ছাড়াই, তার পাশে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

উৎসর্গ

হে অদিতি,
এ হৃদয়
প্রভু ও পামর
ক্ষমো আমাদের পাপ
যেমন আমরা
ক্ষমা করি
আর-সকলের পাপ
আমাদের বিরুদ্ধে যা।
আমরা তোমার কাছে নত,
চৈত্রদিনের ফুল যেরকম
তোমার সমীপে সমর্পিত
তোমার রীতির কাছে
অসম্ভবের এক বসন্তে
মানুষ
এই ফুলের মতন
তোমার চরণে হবে সমর্পণে লীন।
বসন্ত যেমন দূর
শীত থেকে
আমরা তেমনি
তোমার নিকট থেকে। আমরা আসিনি
অনায়াসে
তোমার নগরে
এসেছি তো বেদনায়
বালুকা মাড়িয়ে
বালুবিক্ষত চরণে।

যে দাহ সয়েছি
সে তো আমাদের
প্রাপ্য ছিল বলে।
এসেছে শীতের দিন
যে-পাখিরা উড়ে গিয়ে
যন্ত্রণা এড়াতে
জানে
তারা উড়ে গেছে।
কেবল মানুষ
সেই প্রাণী
উড়তে শেখেনি বলে
জ্বলে মরে
আসিনি বিনা কারণে
এসেছি শোচনা বয়ে
অর্ধনারীশ্বর,
তোমার সকাশে।
আমি দেখেছি আইভি-লতা
বিভয় প্রাচীরে
জড়িয়ে জড়িয়ে ওঠে
বল্‌তে পারো
কে কার নির্ভর?
অর্থাৎ, এখন
যাকে ঘিরে আছি আমি
সে-রমণী
যদি-বা শিথিল হয়,
একযোগে ধ্বংস হব দুজনেই তবে।

হে অদিতি, দেবমাতা—
দেখেছি তোমাকে তুমি
তুচ্ছ ফুলেরও কাছে নত

তুলে তো নিয়েছ তাকে

গালে বুলিয়েছ।

আমি ডেকে উঠতে পারতাম হয়তো

মহানন্দে

কিন্তু তুমি পরক্ষণে গেছ সরে।

তুমিও যে নারী,

মানবীর ছলাকলা

প্রয়োগ করেছ।

আমি ঘোষণা করছি

প্রাণে মনে

জর্জরিত মন

যুগ্মজানুর কম্পন

তবুও ঘোষণা করি

বিধাতার নাম নিয়ে

এ অনৃত নয়। আমাদের

আনত বিনত করো তাঁর কাছে।

এমন মানুষ জানি

যারা বাঁচে

সুযোগী হাওয়ায় ফাঁদ পেতে

নারীর প্রশান্ত পায়,

উপরন্তু প্রণয়, নিষ্ঠুর

মার্জারের নখ যেন···

তোমারই প্রেমিক নেই

শুভ্র আকাশের তলে

যে তোমায় ফুল এনে দেবে.

মৃদুকণ্ঠে

শোনাবে কাকলি কত

কুঞ্জতলে

তবু

তুমি তো যৌবনা।

আর নায়িকা হবার যোগ্য, ভালোবাসবার।

যে চন্দ্র ওদের হাতে

লাঞ্ছিত সম্প্রতি

সে এখনো

তোমার সুগ্রহ

যথা শুক্রগ্রহ।

ওরা বুঝি

ভেবেছে জাহাজযোগে

আয়ত্ত করবে

মৃত্যু তাদের যে-ধন

ইতিপূর্বে দেয়নি?

হোক

ওদের জাহাজ হোক ভিতরের দিকে

সঞ্চালিত কিন্তু আমি

এখন বুড়ো মানুষ। আমি

যথেষ্ট পেয়েছি।

প্রকৃতি পরমা শক্তি বিশ্বজগতের

ত্রাণের উপায়

এসেছি অন্তিমে

তারি তো সকাশে।

দয়াময়ী, হে মমতা, হে মূর্ত মাধুরী

জননী জননী!

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

গান

লঘুপায়ে হাঁটো কবরে আমার, আমি

তোমাকে চেয়েছিলাম,

সেই চাওয়াই তো দুঃখের,
সর্বনাশের

গন্ধবিহীন ফুলের গুচ্ছ
মাল্যভূষিত

সারকথা এই বিষাদান্ত সে-উপকথার :
এখানেই বাস করে

শ্যামল চৈত্র যাকে ফিরিয়েছে।

স্বপর্ণা সেন

ছবি

জানলা দিয়ে দৃশ্য কুসুম
হলুদ, ল্যাভেণ্ডার

বদলে গেছে শ্বেত পর্দায়—
গন্ধ স্বচ্ছতার—

বেলাশেষের সূর্যকিরণ
কাচের থালার উপর

কাচের সোরাই, পানপাত্র
উলটে রাখা, যার অদূরে

একটি চাবি শয়ান এবং
অমন শাদা শয্যা।

মানস রায়চৌধুরী

স্বর্ণমৃগ

দেখিয়াছি তারে মেঘের মাঝারে,
পাহাড়ের জঙ্গলে,
দুঃখে গলে না স্নেহে সে ভোলে না,
কেবলি নাচিয়া চলে!

তবু তার সেই চাহনিটি যেন
পূর্বরাগের চাওয়া,
দোলাইয়া যেন যায় বনে বনে
প্রভাত—শুভ্র হাওয়া!

চিরকামনার স্বর্ণমৃগ সে
কীর্তি তাহার নাম;
শিকারী এবং কুকুরদলে
দেয় না সে বিশ্রাম।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অমরতার গান

প্রেমের গান গাও, কুড়েমি করো,
প্রেমের গুণ গাও, কুড়েমি করো,
কী হবে আর সব দিয়ে বা।

খুব তো ছোটা হলো দূরের পিছে
চোখের মাথা খেয়ে পুঁথিও লুঠ,
প্রেমের মুন খেলে ও-সব মিছে,
কী হবে আর সব দিয়ে বা।

মনস্তাপে ফুল যায় তো ঝরে যাক,
আমার সুখ সে তো আমার আছে ;
প্রেমের গানে সব আবার বাঁচে,
কী হবে আর সব দিয়ে বা।

কেমনে তিব্বতে রাস্তা খুঁড়ি,
কেমনে তেহেরানে মন্ত্রী হই,
কেমনে কাবুলের তক্তে চড়ি—
কুড়ের গান সে তো ফুরায় না।

বুদ্ধদেব বসু

ছবি

এই মৃত মহিলার দু-চোখের ভাষা আমি শুনি,
কেননা এখানে ছিল প্রেম যার ধ্বংস অসম্ভব ;
এবং এখানে ছিল আকাঙ্ক্ষা যা চুম্বনে অজেয়।
এই মৃত মহিলার দু চোখের ভাষা আমি শুনি।

অরবিন্দ গুহ

ধ্যান

যখন আমি সতর্ক হয়ে কুকুরের সন্ধানী স্বভাবের কথা ভাবি
আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই
যে মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী।

যখন আমি মানুষের সন্ধানী স্বভাবের কথা ভাবি,
বন্ধু, আমি স্বীকার করি, আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই।

অরবিন্দ গুহ

নিউ ইয়র্ক

আমার শহর, আমার প্রিয়, আমার শ্বেত। আঃ দুর্বল
শোনো। আমার কথা শোনো,
আমি তোমার মধ্যে একটি আত্মার নিশ্বাস পাই
কোমল করে বাঁশিতে হাত রেখে, শুশ্রূষা করো আমায়।

আমি উন্মাদ তা কি এখন জানি আমি
কারণ এখানে লক্ষ মানুষ নিশ্চিত বাণিজ্যে লিপ্ত
এরা কেউ কুমারী নয়
যদি বাঁশি থাকত আমার, আমি বাজাতে পারতাম না।

আমার শহর, আমার প্রিয়
স্তনহীন কুমারীর মতো তুমি
রুপালি বাঁশির মতো দুর্বল তুমি
আমার কথা শোনো, সঙ্গে থাকো আমার,
আমি তোমার মধ্যে একটি আত্মার নিশ্বাস নেব
এবং তুমি বেঁচে থাকবে চিরকাল।

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

হ্রদের দ্বীপ

হে ঈশ্বর, হে ভেনাস, হে মার্কারি, চোরের ঠাকুর,
সময়ে আমাকে দিও, অনুরোধ করি, ছোটো তামাক-দোকান,
যেখানে ঝকঝকে ক্ষুদে সব বাক্সগুলি
পরিপাটি জড়ো-করা থাকবে ঠিক তাকের ওপরে
খোলা সুরভিত ক্যাভেণ্ডিশ আর শ্যাগ
এবং উজ্জ্বল ভার্জিনিয়া
কাচের ঢাকার মধ্যে খোলা পড়ে থাকা,
একটি নিক্তিও থাকবে, বেশি-তেলা হয়ে পড়েনি যা,

এবং বেশ্যারা সব যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়বে কিছু বলার জন্যেই
একটি চটুল কথা, এবং চুলগুলো সব ঠিকঠাক সামলে-সুমলে নেবে।

হে ঈশ্বর, হে ভেনাস, হে মার্কারি, চোরের ঠাকুর,
আমাকেই ধারে দাও ছোট্ট একটি তামাক-দোকান,
অথবা যা-খুশি কোনো পেশা দিয়ে বসাও আমাকে
লেখা-লেখা এই বাজে পেশাটুকু ছাড়া
যেখানে সমস্তক্ষণই মস্তিষ্কের প্রয়োজন লাগে।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

শিল্প, ১৯১০

সবুজ আর্সেনিক ঘসে গেছে শ্বেতডিম কাপড়ের 'পরে
চূর্ণ স্ট্রবেরিগুচ্ছ! চলে এসো দৃষ্টির ভোজনোৎসবে।

উৎপলকুমার বসু

একটি মেয়ে

প্রবেশ করেছে করতলে সেই গাছ,
উদ্ভিদরস উঠেছে দু'বাহু বেয়ে,
আমার বক্ষে জায়মান সেই গাছ—
নিম্নমুখ,
শাখা-প্রশাখায় আমাকে ফেঁড়েছে, বাহুর মতো।

সেই গাছ তুমি,
শৈবাল তুমি,
তুমি ভায়োলেট-শীর্ষ বাতাসতীর্ণ।
তুমি শিশু এক—এতোই উচ্চ—সেই সে তো তুমি,
তবু সব কিছু মর্ত্যভূমিতে উপহসিত।

উৎপলকুমার বসু

মনোহর এক সামগ্রী মন

এক বিমুগ্ধ সামগ্রী
আলোর ঝলকে যেন
ফড়িং-পাখার ঝক্‌মকি
সূর্যে বহুধাবিভক্ত
যতক্ষণ না ডোরাকাটা জাল নিযুত লক্ষ
কে যেন বাজায় স্বরমণ্ডলে সোনাটা।

পক্ষবিহীন ক্ষুরধার
চঞ্চু যেন, অথবা
ওড়না-ঝালর ভুঁইঠোকরার
রোমশ পালক, মন
অন্ধের মতো অনুমানে সচেতন
মাটিতে দৃষ্টি যখন করে গমন।

আর আছে ওর স্মৃতির শ্রবণ
কান ছাড়াই ও
শুনছে বিলক্ষণ।
ঘূর্ণনবীক্ষণের যন্ত্র
পতনশব্দ যা অভ্রান্ত
রাজকীয় ঋজু ধ্রুব গতিসঞ্চারে ;

এ এক ক্ষমতা বটে
তীব্র সম্মোহনের। ও
যেন বা পারাবতের
কণ্ঠ যা রঞ্জিত
সূর্যকিরণে ; স্মৃতির শ্রবণ সে তো
অসংলগ্ন অথচ সুবিবেচিত।

ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে পর্দা ; টুকরো করে
প্রলোভন, আর
কুয়াশা যা জমে হৃদয়মনের 'পরে
দৃষ্টি থেকেও,—যদি হৃদয়ের
মুখ থাকে কোনো, দুঃখের জের
মুছে নেয়। ও যে আগুন কপোতকণ্ঠে

রং-ছিট্‌ছিটে চিত্রগ্রীব, জ্বলে
অসংলগ্নতা
স্বরমণ্ডলে।
বিনা দ্বিধা দেয় যুক্তিকে তার
বিশৃঙ্খলা প্রত্যুপহার
মন নয় সেই হেরোডের পণ বদল হয় না যার।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কনরাড আইকেন্

নামহীন যারা

দয়া করো এই নামহীন আর পরিচয়হীনদের, এখন যেখানে
হৃদয়ে তিক্ততা নিয়ে প্রতীক্ষানিরত তারা প্রস্তর সোপানে,
অবনত দেয়ালের দিকে, বিস্মৃত, তুহিন হাওয়া
তুলনায় তিক্ত নয় যত আজ তাদের মনের সব প্রান্তদেশ ছাওয়া ;

তারা লৌহযবনিকা থেকে লুপ্তপ্রায় দৃষ্টিতে তাকায়
একটি মুহূর্ত, তারপর জলন্ত দিগন্তপ্রান্তে, হতাশায়
আলোস্পর্শে সংকুচিত, ক্ষত আঘাতের মতো হঠাৎ কাতর,
কুঁকড়ে ওঠে এক কোণে, পুনর্বার অবনত দেয়ালনির্ভর ;

যেখানে খেলনা নৌকা ভেসে যায় রেখাঙ্কিত জলের উজানে
রেলিং-এ হেলান দিয়ে দেখব দাঁড়িয়ে তারা আছে সেইখানে ;
পাথরের ধাপ বেয়ে যে নৌকো নেমেছে নিচে ভেসে যেতে জলের ওপরে,
ঘৃণায়, অথবা বাসনায়, জলে সূর্যালোক তরণীশিখরে ;

কখনো দেখব হয়তো সংকীর্ণ গলিতে, যেখানে ছাই-এর পাত্র
সদা প্রতীক্ষিত
প্রতি দ্বারপ্রান্তে, অনটন, অপচয়ে, তারা প্রতীকচিহ্নিত ;
সূর্যে প্রকাশিত—যেন মিশে যাবে বলে ওই জনতার স্রোতে,
নিজেরা নিশ্চুপ খুব, অন্যদিকে পৃথিবী সরব তার ব্রতে ;

বিধ্বস্ত গোপন যত ছায়ারা ছায়াতে মিশে যায় ;
অনাহূত অতিথির মতো তারা এসে সব বাগানের উপান্তে দাঁড়ায় ;
পাতার ভিতর দিয়ে তাকায় ঘৃণায় ; তবু প্রতীক্ষা শ্রবণে
বুঝি বাদ্যযন্ত্রে সুর ক্রমে বেড়ে উঠে ছড়াবে উচ্ছল কলস্বনে ;

প্রচণ্ড যে, একাকী যে, স্বর্গীয়তায় হৃদয় সম্পৃক্ত,
বাসনা বিনীত বর্তমান, অথচ ঈশ্বরতুল্য অনাসক্ত ;
যে, দেখে ভিড়ের মধ্যে আপন দর্শন
এবং, পার্কের বেঞ্চে, অন্তিম সিদ্ধান্তে আসে মন ॥

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ভিন্সেন্ট মিলে

একজন তরুণ কবির প্রতি

মহাকাল পাখিটার থেকে পাখির ডানাটা ভেঙে নিতে পারে না।
পাখি আর পাখির ডানা
একই সঙ্গে তলিয়ে যায়,
ঠিক যেন একটি পালক।

যা কিছু কোনোদিন আকাশে উঠেছে,
তা সে ভরতপাখিই হোক কি তুমিই হও,
আর পাঁচজনের মতো মরে যেতে পারে না।

অজিত দত্ত

আর্চিবল্ড ম্যাকলীশ

কবিতাপ্রসঙ্গ

কবিতাকে হতে হবে স্পর্শনীয় এবং নীরব
নিটোল ফলের অনুভব

বোবা
করধৃত যেমন প্রাচীন কোনো বৃহৎ শিরোপা

স্তব্ধতায়, যেন কোনো বহুব্যবহৃত বাতায়নবর্তী শিলা
যেখানে এখন জেগে শৈবালের লীলা –

কবিতাকে হতে হবে শব্দভারহীন
পাখির ডানার মতো হাওয়ায় উড্ডীন

চন্দ্রের সমান উচ্চতায়
কবিতাকে হতে হবে নির্বিকল্প, কালের দ্বিধায়।

পিছে ফেলে, জ্যোৎস্নায় উন্মুক্ত করা
রাত্রি অধ্যুষিত সব বৃক্ষের পসরা,

পিছে ফেলে, শীতের উপান্তবর্তী চন্দ্রের বিস্ময়
স্মৃতিতে স্মৃতিতে যে হৃদয়—

কবিকে অটল থাকতে হবে সব সময়ের রণে
চন্দ্রের মতন আহরণে

কবিতাকে হতে হবে, সমান অন্তত
সত্য হয়ে না ওঠার মতো

কেননা আর্তির সব পূর্ব ইতিহাসে
শূন্য এক গৃহপথ, নিষ্পত্র বৃক্ষই শুধু পাশে

ভালবাসবার থাকে।
আনততৃণের সারি, দুটি আলো সমুদ্রের শীর্ষে জ্বলে রবে—

কবিতা কিছুই জানাবে না, তাকে
হয়ে উঠতে হবে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ই. ই. কামিংস

ইত্যাদি

আমার মিষ্টি বুড়ী ইত্যাদি
লুসি মাসী সম্প্রতিকার

যুদ্ধে তোমায় বলতে পারতেন এবং তার চেয়ে
বড়ো কথা বলতেনও ঠিক কী সে ব্যাপারটা
সবাই লড়ছে যার

জন্যে,
আমার দিদি

ইসাবেল সৃষ্টি করে গেল হাজার
(আর
হাজার) মোজা নাইবা ধরলুম
শার্ট আর মাছি-প্রুফ কানঢাকনা

ইত্যাদি দস্তানা ইত্যাদি আমার
মা আশা করতেন যে
আমি মরে যাব ইত্যাদি
অবশ্য বীরের মতো আমার বাবার
বকে বকে গলা ভেঙে গেল যে এটা একটা
সম্মান এবং যদি পারতেন
তবে তিনিও ইতিমধ্যে আমি
অধম ইত্যাদি পড়ে রইলুম চুপচাপ
গভীর কাদায় ইতি
আদি
(স্বপ্ন দেখতে দেখতে
ইত্যাদি
তোমার
হাসির
চোখের পায়ের আর তোমার ইত্যাদির)

বিষ্ণু দে

মস্ত অতিথি

মস্ত অতিথি বন্ধু আমির

—অনন্তলোক ফেরতা মানুষ
এক ইচ্ছেতে নিচ্ছে আমার
স্বপ্ন, সত্তা, সমস্ত হুঁশ।

হও তবে সুখী সকালবিকেল
সুখী, যে-রকম সত্যি সুখী
(ভয় ছাড়া আর মিথ্যে কিছু না
মিথ্যে কিছু না পঞ্চভূতে।

মন ভীরু ; আর আইন তো চাল)
হেসে ওঠো, 'না-'কে 'হ্যাঁ' করে বানাও :
ভালোবাসো ; দাও, যেহেতু 'কেন'ই

— মহান্ অতিথি, হও সুখী হও ॥

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কী, কেমন

'কী, কেমন' শুধু বলবে আয়না
চাকরানি এসে বলবে 'কে ?'
আর (কিছুই না শুনে) মস্ত তাড়ায়
সাড়া দেবে যেন আমিই তুমি

ময়ূখ কিন্তু মারে না চাল

বন্দুক মানে বিকট শব্দ
'না' বোঝায় শুধু একটি মানুষ
আর (কোথাও 'হ্যাঁ' দেখে) ব্যথায় হাসবে
সে কিন্তু তুমি অমুকতমুক

সত্যি যুদ্ধ কে আর জেতে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

হার্ট ক্রেন

কৃষ্ণবর্ণ তম্বুরা

গারদে আবদ্ধ এক কৃষ্ণবর্ণ মানুষের সমস্ত আগ্রহ
পৃথিবীর রুদ্ধদ্বারে অন্যায় বিচার লক্ষ্য করে।
ইতস্ততঃ কীট নড়েচড়ে কাঁচপাত্রের ছায়ায়
আর এক জ্যান্ত মাছ গর্ত খোঁড়ে মেঝের ওপরে।

ঈশপ, তার ধ্যাননিমগ্নতায়, দেখেছিল
স্বর্গ,—সহঅবস্থানে কাছিম এবং খরগোস ;
এখন শৃগাল তার সমাধিতে কান পাতে, আর
বাতাসে মেশায় দীর্ঘ কণ্ঠের নির্ঘোষ।

কালো মানুষটি, একা, কারাগারের ভিতরে তার
আপন সাম্রাজ্যে ঘোরে, অন্ধকারে, যা আছে এখন
দেয়ালে ঝোলানো ওই তম্বুরার তারে,
ওদিকে আফ্রিকা জুড়ে বাসি মৃতদেহে দ্রুত মাছির গুঞ্জন ॥

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এলেন টেট্

এলিসের অন্তিম দিনগুলি

এলিস অলস হয়ে উঠেছে, বিশালকায় কিন্তু স্থূল নয়,
সে তার বিলীন এবং সায়স্ত বয়সে অবনত ;
উর্ধ্বে তন্দ্রালু সব পাতার নিবিড়ে এক বিড়াল দম্ভিল, মনে হয়
অমূর্ত ক্রোধের ভারে কাঁপছে অবিরত :

যে আলোই দোলে ওই সংকুল দুয়ারে
চিরকাল দোলে, যেন তৃণের আনত শীর্ষগুলি
লক্ষণীয় হবে না তো যখন পৃথিবী শব্দে, গতির জটিল অভিসারে
নির্বাসিত, মগ্ন থাকে, চতুর্দিকে দর্পণের অবরোধ তুলি।

উজ্জ্বল এলিস! সর্বদা প্রচেষ্টা তার ব্যাখ্যাযোগ্য করে দিতে
নষ্ট নিষ্ঠুরতা, যা সে বোঝাতে চেয়েছে
সতেজ নিশ্বাসবহ নাসিকানিবদ্ধ প্রাজ্ঞ দৃষ্টিসরণীতে
কোনো লক্ষ্যে তা নিবদ্ধ নেই; দিনমান চিন্তাভারহীন কাটিয়ে দিয়েছে।

অসীমের অভিধায় অন্যমনা আর সে পারে না
অযুগ্ম একাকী কোনো নির্ভার ভ্রমণ,
আমিত্ব আচ্ছন্ন তার স্বরচিত পৃথিবীর সবটুকু দেনা
পরিণামহীন প্রেম ভাঙে সক্রোধে এখন,

জাগতিক যমজের তুলনীয় নিজের প্রতি যে ভালোবাসা,
এলিস মেশাতে চায় তার দুটি প্রান্ত এক মধুর অন্বয়ে;
আর নয় দ্বিতীয় অধর খুঁজে চুম্বনের ব্যর্থ ব্রতে ভাসা
নিজে তা প্রথম ভাঙে, কাঁচের নিমগ্ন পরিচয়ে—

নিষ্ক্রিয়তার ভারে সে এখন একাকী,
ইন্দ্রিয়ের উৎসাহী বাণিজ্য, কিংবা উপপাদ্য যত বাসনার,
আজ তারা উদাসীন সমুদ্রবেলার প্রান্তে খড়ির টিলার মতো ফাঁকি,
শূন্য তনুহীন সব জান্তব উত্তাপ নিয়ে তার:

সমস্তই কাললগ্ন, যেখানে স্বর্গও যেন ব্যাপ্ত এক রাত্রি সূর্যহীন,
কিংবা রাত্রিহীন সূর্য ধাবমান পূর্ণ বাসনায়
সুযোগসন্ধানী, কিন্তু আজ এলিসের বিরক্ত দৃষ্টিও ক্ষীণ
মনুষ্যআকৃতিগত ঝিমুনো সমাপ্তিপূর্ব মূর্তির বীক্ষায়,

পৃথিবীর দিকে পিঠ দিয়ে থাকা আমরাও যাব না কখনো
বিচূর্ণ দরোজা দিয়ে, যেখানে নির্বাক এক ছায়াময় বিনষ্ট জনতা
অসীমপ্রয়াসী, গভীরতার মুখোশে, আর কান্নাহীন কোনো
অস্তিত্বের মতো, এক গাণিতিক শব আচ্ছাদনের বহতা

ব্যাপ্ত হয় তখনই বাতাসে—পাপস্পর্শহীন শুদ্ধ সেই সাজ।
হে শরীরের ঈশ্বর, তুমি আলিঙ্গনে আমাদের
আবার জাগ্রত করো ; বরং শয়তান যদি ছুঁতে পারি আজ
তোমার লাবণ্য, আর ভুল হোক পথ যদি কীর্ণ প্রস্তরের।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

থিয়োডোর রেটকে

সেই মুমূর্ষু

[ডবল্যু. বি. ইয়েটস্ স্মরণে]

১

॥ তার উক্তি ॥

আত্মজনকে শেষশয্যায়
শুনলাম বলে সেই মুমূর্ষু,
"লবণে মাখানো চামড়ার মতো
আত্মা আমার বাইরে শুকায় ;
নেই সেটি ব্যবহারের ভরসা।

"হয়েছে যা, হবে ফিরে ফিরে তাই ;
মাংস বলবে অস্থিকে 'খাই',
চুম্বন দেবে ফুটিয়ে গোলাপ ;
আমি জানি, জানে মুমূর্ষুজন,
শাশ্বত মানে, এখন, এখন।

"মৃত্যুর সব সম্ভাবনায়
শেষ মুহূর্ত সকলই জানায় ;
পৃথিবী দোলায় হৃদয় আমার।
আমি সেই শেষ পরম জিনিস,
গান গাইবার শিক্ষানবীশ।"

২

॥ এখন তবে কী ॥

ধরা পড়ে গেছি অস্ত-আলোয়,
এই কি আমার নতুন জন্ম !
খুরে রূপ নেয় আমার দুহাত।
করিনি অতীতে যে সব কর্ম
তারই সীসাভার বয়ে করি ক্ষয়।

শবসম্পদে গরীয়সী ভূমি,
প্রচুর পঙ্ক, বন মৌসুমী,
জপায় নিত্য বাঁচার মন্ত্র।
বিদঘুটে এই মানুষ আমায়
মুহূর্তগুলি বৃদ্ধ বানায়।

জ্বালিয়ে দিয়েছি শরীরের দায়,
ফাল্গুনে আর প্রেমের শিখায়।
বাতায়নে সব আবছায়া হলে
এখনও, দৃষ্টি নিবদ্ধ করি
তাতে নয় নয়, অন্য শরীরী।

অহংকারের চরম রাত্রে,
প্রশ্ন তুলেছি বিষয়মাত্রে,
এবং করব পুনরায় তাই—

দরজায় ও কে, যেন কড়া নাড়ে ?
যে আসে আসুক, দাঁড়াক সে দ্বারে।

৩

॥ দেয়াল ॥

এক প্রেত অচেতনে আসে আর হাৎড়িয়ে বেড়ায়
আমার জানলার কাঠ ; নবজন্ম চায় রুদ্ধস্বরে !
আমার পশ্চাতে ছায়া সে কখনো বন্ধু নয়, নয় ;
কাঁধে-রাখা তার হাত রূপ নেয় শিঙের প্রখরে ।
আমার কাজের মধ্যে যে পেয়েছি আমার পিতাকে
সে-আমাকে সীমাবদ্ধ অবলোপী অন্ধকার ঢাকে ।

যদিও উপেক্ষা করে বিশুষ্ক পরিধি প্রত্যক্ষের,
কামনামথিত চোখ কখনো কি শুদ্ধ রাখে ছবি,
অভ্যর্থনা করে উষা যে-জানলায় মুখ করে বের ?
বড়ো ধীর এই বৃদ্ধি সুকঠিন সহ্যাতীত হবি ।
দুর্বোধ্য ছায়ায় যবে নানা মূর্তি মাতলামি করে
সমস্ত কামুক প্রেম নৃত্য হয় কবরে কবরে ।

দেয়াল পশেছে এসে ; দেয়ালকে ভালোবাসতে হবে
অন্তহীন অন্ধকারে যে উন্মাদ চাই অপলক
আত্মা তার খেপে ওঠে চাক্ষুষ বৈভবে ।
বেঁচে থাকি, যতক্ষণ অন্ধকার হয় না আলোক ।
সমার্থক শাদা আর উষা । কে বলবে উষা একে,
সূর্যের পিছনে যবে উদ্ভাসিত অন্ধকার থাকে ।

৪

॥ উল্লাস ॥

একদা একক বৃক্ষ উল্লসিত করত আমাকে ;
শিশুর দৌড়ের নেশা এনে দিত বিমুক্ত বাতাস—

পৃথিবীকে ভালোবাসি ; ভালোবেসে মেটে কই আশা,
অনেক অনেক চাই দিব্যচক্ষু বিম্বিত ছায়াকে।
শরীর শরীর চায়, অস্থি চায় অস্থির অস্থিকে ;
জীবনমন্থনে বারি, একা তবু নইকো একাকী।

সে কি ছিল কোনো দেব, বেদনাকে দিল জন্মান্তর ?
আমার পিতাকে দেখি, লোল শীর্ণ চামড়ার পোশাক ;
ফিরাল সে মুখ তার : এ মানুষ নির্ভীক, পৃথক,
বহুধাবদস্তি, তবু গহ্বরের হাঁটে ক্ষুরধারে।
কম্পমান পাখি যেন পাখিশূন্য বায়ুব্যমণ্ডলে,
অসমসাহসী তবু সর্বত্র দৃষ্টির দ্যুতি ফেলে।

প্রয়োজন অনুযায়ী মাৎস্যন্যায় ন্যায্য ভাবে মাছ :
বৈর বিনা প্রাণ নেই ; ধমনীতে রক্তময় নদী
অতিশয় শ্রান্তস্রোত নিরুদ্বিগ্ন বিশ্রব্ধ অবধি।
নগ্ন করলে ক্ষতচিহ্ন রক্তে জাগে দুঃসাহসী নাচ।
পাখির কল্পনামাত্র পাখি হয় আকাশে উড্ডীন।
প্রতিদিন মরি আমি, তাই থাকি সত্তায় স্বাধীন।

উল্লাসকে ভয় কোরো, সে উন্মাদ আতঙ্কজনক।
দেখি তোরে, প্রিয়তমা, দেখি তোরে স্বপ্নের অতলে ;
মধুপগুঞ্জন শুনি, অনিশ্চিত বোল্ বলে বলে
জাফ্‌রির পূর্ণাঙ্গ গান ভরে প্রতিধ্বনিত ত্রিলোক।
নিশ্বাস নিশ্বাসমাত্র : আমার এ সমস্ত ভুবন ;
আমার মৃত্যুর দামে মৃত্যুকেই দেব নির্বাসন।

৫

॥ গান গায়, গান গায় ॥

পাংশু মৃত আলোয় নাচ রমণীদের প্রিয়—
চন্দ্র আমার মা : ও চাঁদ তোমায় ভালোবাসি।

নিজের ঘর কোথায় তার, শুশুক যেন আসে,
আশ্রয় দেয় ছায়া এবং দীর্ঘ রাতের গৃহ।
কোথায় পশু চেঁচায় আর মাংস কে নেয় ছিঁড়ে,
আমায় আনে সে আর্ত স্বর জন্মকালের নীড়ে।

কে বা জানত প্রেম শুধুই মানসস্রোতে গতি?
আমি কি আর কিচ্ছু নই—আসন্নের ঝোঁক?
গাইব গান কিংবা দীর্ঘশ্বাসে করব শোক;
নামো নামো, ওগো কোমল নম্রতম জ্যোতি।
আদিগন্ত মধুর মাঠ, শুনি তোমার পাখি
গাইছে গান, গান গাইছে, গান্ধারে গায় নাকি!

একাকী গায় যে চাতক, সে করবে সমর্থন:
দৃশ্যমান হারিয়ে যায়, যা জানো তাই থাকে!
চিরন্তনকে সীমায় বাঁধে, খড় বিছিয়ে রাখে,
শিলায় পিষ্ট শামুকটির ক্রুদ্ধ বিস্ফোরণ।
ধ্যানের দেখা বদলে গিয়েও হারায় না তার স্থিতি।
হে দেব, আনো, আমি যা তাই আমায় দেখায় ভীতি।

শিখর থেকে গভীর খাদে রক্ত থামায় ভয়
যখন ভাবি মৃত এবং প্রিয়তমের স্মৃতি;
সফল হওয়া কল্পনার হাতের মুঠে নয়
আলোকের এই শেষ-প্রদেশে; সেই সাহসী বাঁচে
সাথী যে নয় উড্ডীয়মান, তবু ঝাপটে ডানা
বস্তুময় বিশ্বে হানে, অতলান্ত অপরিমাণ শূন্য এবং কানা॥

অশ্রুকুমার শিকদার

কার্ল শাপিরো

ভারতবর্ষে

এই তো ভারতবর্ষ। দেখি মানুষরা গাছপালার
নিভৃতে যায় রবার-নরম পায়ে। দূরের পথে
শান্ত পায়ে হেঁটে এসে কখন ঘিরে দাঁড়ায়।
মাঝখানে এই দাঁড়িয়ে আছি। দেখছি নয়নতারায়
মুগ্ধ আলো। অনেক দিনের দাসত্ব আর দারুণ
মর্মবেদনায় যে-নয়ন ধূসর হয়ে আছে।
দীর্ঘ তো নয়, এদের চেয়ে অনেক দীর্ঘ আমি;
এবং পাংশু এই ভারতী অনন্ত নিশীথে।

বিকেল চারটে। সমুদ্রতীর। তাজমহল হোটেলে
একটি বায়স হঠাৎ এসে ঘরের জানালায়
বসেছিল। পালটেছিল চক্ষু। অন্য দিকে
যেই ফিরেছি, চায়ের পাত্র উলটে ফেলে দিয়ে
কেকএর টুকরো নিয়ে উধাও। আহা ভালোই। নিচের
মিশকালো ওই পথের দিকে তাকিয়ে দেখো। শাদা
জামাকাপড় চড়িয়ে ভারতবর্ষীরা যেখানে
ঘুরছে। আহা, কাকের খাদ্য কী ঐখানে ছিল?

এবং বিদেশীরা বলে, দারিদ্র্য তার হেতু;
ভাবে, প্রাচীন ব্যাধির স্বর্ণসুধাই মহৌষধি।
ভাবে, জীর্ণ চাকাও চলবে, তেল যদি দেয় কেউ।
ভাবছি, এবং তাকিয়ে আছি চক্রবালের দিকে।
সামনে আমার কাচ পাথরের মস্ত অট্টালিকা;
শীর্ষে লেখা—স্ট্যাণ্ডার্ড। তার বিরাট হরফগুলি
সন্ধ্যাকাশে জ্বলছে, নিচে নীল আরব্য সাগর।
স্ট্যাণ্ডার্ড কার? হয়তো আমার। মার্কিনী ঐ মান।

হায়রে, তবু বালির মতন ঠাণ্ডা নরম গলায়
বলবে এরা 'হুজুর !' দেখো পেশাদার ঐ সাধু
চোখ ঘুরিয়ে সে তার ভগবানের পায়ের তলায়
লুটিয়ে পড়ল পথের মধ্যখানেই। পথচারী
'সাহেব, হুজুর !' বলবে, দু হাত বাড়িয়ে দেবে তবু।
এবং দেখো সুন্দরীদের। ললাটে রঞ্জিত
চন্দ্রকলা। হাতের উপর হাত রেখে ঐ যারা
নম্র নতির শেষে মিলায় শূন্য নীরবতায়।

লাবণ্যময় কোটি মানুষ চোখের সামনে ধীরে
পাথর হয়ে ওঠে। শিলায় গড়া মানুষগুলি
মন্দিরে সজ্জিত। জঙ্ঘাদেশের বন্ধনীও
অর্ধশিথিল। বাহুকোণের জটিল মুদ্রা প্রেমের
জটিলতার প্রতীক। এবং হাড়ের কঠিনতা
হারিয়ে গিয়ে দেহের অস্থি কোমল মুদ্রা যেন।
সারি-সারি পৃথুল মূর্তি দেবালয়ের গায়ে,
দেবের, নৃত্যরতার এবং অর্ধমানুষ প্রাণীর।

সত্যিই কি দেবতা এরা ? নয়তো অন্যকিছু ?
এই সে পঙ্কিলতা, সবাই গভীরে যার নামে ?
এই নাকি সেই চোরাবালি, ধর্মনেতা এবং
বীরেরা যার গহ্বরে হয় শিলায় পরিণত ?
কে এখানে বিগ্রহ, কে নেহাত মাটির মানুষ ?
এই পাথুরে অরণ্যে হয় সবাই একাকার ?
বিশ্বাসের এই মন্দিরে সেই দেবতা আছে কোথায়
'যুক্তি' বলে চিনি যাকে, কোথায় মূর্তি তার ?

চোখে আমার নূতন আর-এক দেবের মূর্তি ভাসে।
তাম্রাভ সেই সন্ত, চোখের চশমা জ্বলে আলোয়,
অন্ত্যজদের হাতের উপর হাত রেখেছেন যিনি,

এবং যিনি ভারতকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন।
নেই তিনি আজ, এবং এদের চরকা—তা-ও নেই।
নেই, কেননা একটি হিন্দু যুবার খাদি জামার
নিচেই ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। জেনেশুনেই সে তাঁর
আশিস্ নিয়ে তাঁকেই হঠাৎ মৃত্যু দিয়ে গেছে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিরোধাভাস : পাখিরা

ভুল রয়ে গেছে পাখির বিষয়ে মূল্যায়নে
দ্রুত, পোষমানা, যন্ত্রসুলভ উচ্চারণে
বলতে পারি না আয় রে চলে যা আয়
পালন করতে, খাওয়াতে, মেলাতে, হায়
সুন্দর স্বপ্নকে।
হা রে সুন্দর, কবিরা ভ্রান্তিমান্
তোমাকে যখন ভালোবাসে, ধায়, ছল্‌কায়, গায় গান
বায়ুচারী জীব, নেকড়ে—বৃক্ষে থাকো
গোলন্দাজের নাড়ির খবর রাখো
শুধু ওঠে আর পড়ে, ওঠে আর পড়ে,
বুকে হাত রেখে বলিনে গাঢ়স্বরে
স্বাধীনতা স্বাধীনতা।
হা রে স্বাধীনতা, কবিরা ভ্রান্তিমান্
তোমাকে যখন ভালোবাসে, ধায়, ছলকায়, গায় গান।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

রুশ কবিতা



জর্জিয়ার শৈলশিরে রাত্রি

জর্জিয়ার শৈলশিরে রাত্রি তার আঙ্‌রাখা বিছায় ;
আমারে শোনায় গান মৃদুকণ্ঠ নদী,
ধীরে, ধীরে, ধীরে শোক জড়ায়-যে, আলিঙ্গন দেয়,
শোক সে—তবু কী দীপ্ত ! কেন্দ্রে তার তুমি নিরবধি।
তুমি। শুধু তুমিই যে মর্মে তার······দুঃখ-আবরণ
আমারে রেখেছে ঢেকে সংসারের কলকণ্ঠ হতে,
অন্তরে শুধুই মোর জাগে প্রেম, প্রেমের দাহন,
ভালোবাসা, পুড়ে মরা বিনা তার গতি কী জগতে !

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

নৈশ

ঘুম আসে না কো, রাত নিরালোক যাপে,
অশান্ত ঘুম, ব্যাপ্ত অন্ধকার,
টিক্‌টিক্ স্বর শিয়রে যে বারবার,
নাছোড়বান্দা ঘড়ি কি রাত্রি মাপে !

নিয়তি, না তিন বৃদ্ধার উচ্ছ্বাস,
আধো তন্দ্রায় রাত ঢুলে ঢুলে পড়ে,
জীবন-ইঁদুর কেন কিচ কিচ্‌ করে,
কেন রে জ্বালাস, বল্ কী বলতে চাস ?

ক্লান্তিকর এ-কানাকানি—অর্থ কী ?
এ কি গুঞ্জন ? অনুযোগ ? দোষারোপ ?
'কী খুঁজিস, কোন্ বাধায় ভুগিস তুই ?
বলিস আমারে এ-জীবন ব্যর্থ কি ?

কে বোঝাবে, হায়, কে মিটাবে মোর ক্ষোভ—
এ-কোন্ সন্ধ্যাভাষায় বকিস তুই !

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

তিন উৎস

বিস্তৃত বিশাল এই পৃথিবীর ক্ষেত্রে সকরুণ
তিন রহস্যের নদী ফল্গু, প্রবাহিত ;
একটি উৎস যৌবনের—ঝর্নাধারা উন্মত্ত দারুণ,
কল্লোলিত জল ছোটে ঝিকিমিকি, সিত ;
অন্য উৎস কাস্তেলিয়া—উর্মিমালা দৈবী প্রেরণায়
সংগীতে মাতায় মরু, চেতায় বন্দীকে ;
সর্বশেষ উৎস যেবা, হৃদয়ের উৎক্ষেপ জুড়ায়
সুশীতল বহে জল বিস্মৃতির দিকে ।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কবি

যতক্ষণ কবিকণ্ঠে সংগীতদেবতা
না পাঠায় আত্মনিবেদনের আহ্বান,
কবি ততোক্ষণ ক্ষুদ্র দৈনিকে সর্বদা
ডুবে থাকে, অতলে তলায়ে থাকে প্রাণ ।
ততোক্ষণ নিরুচ্চার স্বপ্নপূত বীণা ;
চিত্ত তার অবসন্ন আলস্য-রভসে,
অযোগ্য সংসার ওকে ঘিরে রাখে কিনা,
তারো মধ্যে সম্ভবত অযোগ্যতম সে ।

কিন্তু যবে একবার কর্ণে তার পশি
বিচলিত করে তোলে দেবতার বাণী

তখন কবির চিত্ত ওঠে যে উচ্ছুসি,
নভোচারী ঈগল সে—জেগে ওঠে প্রাণী।
তখন সে সংসারের তুচ্ছ ছেলেখেলা
ফেলে রাখে, দূরে রাখে জন-কোলাহল,
মানে না সে মানুষের দেবতার মেলা
সমুন্নতশির সে যে উদ্ধত, প্রবল।
কবি তবে পলাতক—উন্মদ, স্পর্ধিত,
প্রাণৈশ্বর্যে মত্ত, সুরে উদ্বেল সে নীত—
যেখানে নির্জনে সিন্ধুজলে সুমার্জিত
তটভূমি, অরণ্যানী রণিত ধ্বনিত।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

বুড়ো মানুষ

আর আমি নই উদ্দীপ্ত সে প্রেমিক
তামাম দুনিয়া যার কাজে তাজ্জব :
বসন্ত গেছে, বৈশাখ আজ স্মৃতি
নিবে গেছে যত যজ্ঞ ও উৎসব।

হা ইন্দ্র! কামদেবতা! তোমার দাস
অনুগত ছিল, তুমিই সাক্ষ্য দেবে।
যদি পারতাম নতুন জন্ম নিতে
ফিরে জ্বলতাম তোমাতে মোক্ষ ভেবে॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রূপসী

সকলি সাবলীল মহাশ্চর্য
সকলি পৃথিবীর, রিপুর উর্ধ্বে,

সে থাকে নিশ্চুপ লজ্জারুণ মুখ
আপন স্নিগ্ধ রূপের স্পর্ধে।
চতুর্দিক সে হরিণচোখে চায় :
বন্ধু নেই—নেই প্রতিদ্বন্দ্বী,
হারিয়ে যায় সে পরিমণ্ডলে
অন্য রূপসীর পাংশু ফন্দী।

যেদিকে অতি দ্রুত যাও না কেন তুমি—
হয়তো প্রেমিকার বিদায়লগ্ন,
মনের মোহনায় লালন করো তুমি
যে কোনো অপরূপ সোনালি স্বপ্ন,
তবু অকস্মাৎ দেখলে তাকে তুমি
থমকে পথে থেমে যাবে অনিচ্ছায়,
অলোকস্বর্গীয় রূপের সকাশে
প্রার্থনায় ধীর আনত শ্রদ্ধায়।

বিনয় মজুমদার

ভালোবাসা

তোমাকে ভালোবেসেছিলাম ; হয়তো ভালোবাসা
এখনো প্রাণে নেভেনি নিঃশেষে।
একথা শুনে আবার যেন হয়ো না বিচলিত
চাই না তুমি বিধুর হও বিষাদমেঘাবেশে।
নীরবে ভালোবেসেছিলাম—ছিল না প্রত্যাশা—
ঈর্ষাজ্বরে কখনো আর কখনো উচ্ছ্বাসে।
ভালোবাসায় ছিল এমন পেলব প্রগাঢ়তা!
তেমনি যেন আরেকজন তোমাকে ভালোবাসে।

বিনয় মজুমদার

ফেদর তিউত্‌চেফ

বসন্তের বজ্রধ্বনি

মে-মাসের জন্মলগ্নে ঝঞ্ঝার সংক্রাম ভালোবাসি ;
বসন্তের বজ্রধ্বনি বিচিত্র চিৎকারে মেতে যবে
খেলাচ্ছলে ঘুরে ঘুরে মহানন্দে নেচে নেচে আসি
বিবর্ণ নীলের বুকে ঝঙ্কারিবে গুরু গুরু রবে।

তখন আকাশ জুড়ে কোষমুক্ত বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝনা,
অবিরল বৃষ্টিধারা, ধূলি শূন্যে ওড়ে বায়ুভরে,
সিক্ত শাখা হতে দোলে সারে সার শুভ্র মুক্তাকণা,
নবীন শ্যামল শস্য সোনারঙ-করা সূর্যকরে।

গিরি-প্রস্রবণ হতে ছুটে আসে তীব্র স্রোতোধারা,
অরণ্য অন্তর সেঁচে ঢেলে দেয় পাখির কাকলি ;
সন্ধ্যাভাষা বনানীর, পাহাড়তলির ঘর সাড়া…
সবই তার প্রতিধ্বনি, বজ্রের গর্জন যারে বলি।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ক্রোধে বিদ্বেষে রাত্রি অন্ধকার

ক্রোধে বিদ্বেষে রাত্রি অন্ধকার,
আকাশের মুখ মেঘের বোরকা-ঢাকা ,
এ তো নয় ভয়, নয় ঘোর চিন্তার,
এ কেবল আধো-ঘুমে বুঁদ হয়ে থাকা।

এ-যে বিদ্যুৎগর্ভ গ্রীষ্ম-লীলা,
থেকে থেকে উদ্‌ভাস নভ-অঙ্গন,
মূক ও বধির শয়তান রঙ্গিলা
যেন বসায়েছে পাপের সম্মেলন।

একটিমাত্র ইঙ্গিতে যেন কার
অগ্নিকাণ্ড দাউদাউ মহাকাশে,
নিঃসীম কালো বিদীর্ণ একবার—
দূর বনরেখা একবার চোখে আসে।

ফের মুছে যায় ঘুচে যায় ছায়াছবি ;
স্বচ্ছ আঁধারে জগৎ প্রতীক্ষায়—
ও-মহাশূন্যে যেন কোনো এক ভবি
স্থির, ভয়াবহ মহৎ প্রতিজ্ঞায়।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মিহাইল লেরমনতফ্

গিরিচূড়ায়

একদা রজনীতে সোনালি মেঘ এক পথে যেতে
বিরাম লভিল সে বিশালকায় কোনো গিরিবুকে ;
প্রভাতে পরদিন তরুণী ধনী ফের মনোসুখে
পলাল আকাশের সুনীল সরণিতে নাচে মেতে।

তবু সে দুর্গম গিরিচূড়ায় কিছু রয়ে গেল,
রহিল এক কণা জ্যোতির লেশ, কিছু ভালো-লাগা :
রহিল একা এক দৈত্য, ভাবনার আলো-লাগা,
ভাবে সে, হাওয়া হায় রিক্ত কেন দিন বয়ে গেল।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আশা

নন্দনবনবিহারিণী মোর পাখি!
সারা দিনমান সাইপ্রেস-শাখে বসে
দেখে দিবালোক উড়ে যায়, দেখে নাকি?
সারাদিন তবু গান গায় নাকো ও-সে।
পিঠে ওর নভোনীলিমার আভালাগা,
উজ্জ্বল লাল মাথাটি; আগুন-রঙা
দুটি ডানা, তায় সোনার আভাস জাগা—
আকাশ যেমন উষার আলোয় ভাঙা।
কেবল পৃথিবী নিঝুম যখন ঘুমে,
রাতের কুয়াশা গড়ায় ছড়ায় চুপে,
সে মাতে গোপনে সংগীত-মরশুমে
নিখিলচিত্তহারিণী মোহিনী রূপে।
এমনি সে সুর, দুঃখ-নিগড় ভুলে
গলা দিতে হবে আমাকে, তোমাকে, তাকে,
ললিত রাগিণী প্রাণ বুকে রাখে তুলে—
যেমন পরম বন্ধু, ঘরে যে থাকে।
কতদিন ঝড়ঝঞ্ঝায় শুনেছি-যে
সেই গান, আহা, সে-গানে জীবন সাধি,
আহা, পাখি মোরে শাস্তি দিয়েছে কী-যে,
শুনি, গান শুনি, আশায় হৃদয় বাঁধি।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মেঘমালা

মাথার উপরে ওই মেঘমালা, উজ্জ্বল মুক্তার
অন্তহীন সারি ধায় ব্যস্ত নীল স্তেপের মন্থনে।
তুমি কি আমারই মতো নির্বাসনে ছুটেছ, তোমার
বাঞ্ছিত উত্তর ছেড়ে অনাত্মীয় নিঃসঙ্গ দক্ষিণে?

কে তোমাকে দণ্ড দিল ? সে কি নিয়তির নির্মমতা ?
সে কি গুপ্ত ঈর্ষা ? সে কি অন্ত কারো সুস্পষ্ট অন্যায় ?
বলো সে বুঝি তোমার বন্ধুদের বিষাক্ত শঠতা ?
তোমারই উপরে সেই কুটীল পাপের সব দায় !

না ! তুমি উদ্বিগ্ন জানি শূন্য মাঠ নিষ্ফল যেখানে…
জানো না প্রেমের দাহ, দণ্ডিতের কী দুঃখ জানো না।
যে মুক্ত সর্বদা, চিরনিরুত্তেজ, যার কোনোখানে
মাতৃভূমি নেই সে কি বোঝে নির্বাসনের যাতনা !

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলেক্সি তলস্তয়

কুয়োতলা, চেরিশাখার দোলন

কুয়োতলা। চেরি-শাখার দোলন।
একটি মেয়ের খালি পায়ের ছাপ।
পাশেপাশেই আরও একটি চলন—
কাঁটামারা বুটজুতোর মাপ।

মিলনবেলা বয়ে গেল যে কবেই ;
কেউ কোথা নেই, তবু শুনছে কান—
সেই ফিসফাস, সোহাগবচন সবই,
কলসি ফেলে পানিভরন-গান।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মারী, তোমার মনে কি পড়ে মারী

মারী, তোমার মনে কি পড়ে মারী,
কতকালের পুরানো সেই বাড়ি,
ঘুমিয়ে-পড়া পুকুর, চৌদিকে
চিরস্মরণ লাইম সারি সারি ?

পুরানো সেই পোড়ো বাগান, তার
বিজন পথ গাছগাছালি-ঘেরা,
বড়ো ঘরের বনাত-ঘেরা, নিচে
ছবির সারে পূর্বপুরুষেরা ?

মারী, তোমার মনে পড়ে কি মারী,
ভরসন্ধ্যে-আকাশ,
মাঠের শেষে মাঠ মাঠের সারি,
দূর গাঁয়ের ঘণ্টা বারোমাস ?

বাগান রেখে পিছনে, নদীতীর,
ধীর নদীর শান্ত মৃদু গতি,
ফসলক্ষেতে দুলছে আলোছায়া,
ঝুমকো ফুল সেই রঙিন অতি ?

সেই-যে বন, যেথা তোমায় আমি
বলেছিলাম—তুমি আমার হবে ?
মারী, তোমার পড়ে কি মনে মারী,
সেই সেদিন, হারিয়ে গেছে কবে ?

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ইভান সুরিকফ

য়ুক্রাইন-গীতি

গাঁয়ের পথে ফসলক্ষেতে
শস্য রাশে রাশে :
এলো যুবতী সেই সেখানে
ফসলকাটার আশে।
(আহা, হলুদবরণ ফসলকাটার আশে।)

হাত ভেরেছে, চলে না পা—
সুন্দরী যুবতী……
'নাগর আমার, আমার মরণ,
এসো শীঘ্রগতি—
(আহা, কোথায় তুমি, এসো শীঘ্রগতি—)

'এসো আমার মনোপাখি,
আবার এসো উড়ে,
যাও দেখে যাও, সোনার গন্ধে
মাঠ রয়েছে জুড়ে।
(আহা, সোনার গন্ধে মাঠ রয়েছে জুড়ে।)

'চড়া-রোদ্দুর-মাথায় ফসল
কে বলো শুকুবে ?—
মনোপাখি, আমি চোখের
বাদলে যাই ডুবে।'
(আহা, চোখের জলের বাদলে যাই ডুবে।)

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ভালেরি ব্রিউসফ

মিস্তিরি গো, মিস্তিরি

—মিস্তিরি গো, মিস্তিরি, শাদা পিরান গায়ে,
পাথর কেটে বানাচ্ছ কী? কার লেগে'?
—এ্যাই, সরে যা, জ্বালাস নেকো; গড়তে হবে ঠিক-ঠিকই।
কয়েদখানা গড়তে হবে তার লেগে'।

—মিস্তিরি গো, মিস্তিরি, ওলন-দড়ি হাতে,
এই নরকে কে পচবে? কেউ কয় নাকো?
—ও বাবুভাই, নওকো তুমি, নয়কো তোমার ভাই-বেরাদার
চুরি বিদ্যে শিখতে তোমায় হয় নাকো।

—মিস্তিরি গো, মিস্তিরি, বলো তো কে জেগে
চোখের জলে কাটাবে রাত এইখানে?
—আমার পুতি, আমার নাতি, আমার মতন মিস্তিরি।
এমনি ভাগ্যি মোদের যে ভাই সবখানে।

—মিস্তিরি গো, মিস্তিরি, সেই কয়েদী তোমায়
কারিগররে করবে স্মরণ, হুঁশ রাখো?
—এ্যাই, হুঁশিয়ার, বাঁশের ভারা এ-মস্করা সইবে নাকো!
সবই মোদের আছে জানা। চুপ থাকো।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ম্যাক্‌সিম গর্কি

ঝোড়ো পাখির গান

সমুদ্রের রুপালি তেপান্তর ঘিরে বিক্ষুব্ধ বায়ুমণ্ডলে ঘনায় ঝোড়ো মেঘ। আর মেঘ আর সমুদ্রের মাঝখানে দৃপ্ত

পথে-ঘাটে ওড়ে ঝোড়ো পাখি—যেন বিদ্যুতের কালো ঝল্‌কানি ॥

এই তার পাখা তরঙ্গকে ছোঁয়, এই সে তীরবেগে আকাশে ছোটে, ভীষণ চিৎকারে মেঘকে বিদীর্ণ করে, পাখির জনশূন্য চিৎকারে মেঘ সন্ধান পায় উদ্দাম আনন্দের ॥

সে চিৎকারে ধ্বনিত হয় ঝঞ্ঝার স্তবগাথা। ধ্বনিত হয় জ্বালাময়ী তার আবেগ, তার প্রজ্বলিত ক্রোধ, চূড়ান্ত বিজয়ে তার জ্বলন্ত বিশ্বাস ॥

গাঙচিলেরা ভয়ে বিলাপ করে—বিলাপ করতে করতে জল-রেখার ওপর দিয়ে ছুটে যায়। সমুদ্রের মসীকৃষ্ণ বুকে তাদের আতঙ্ককে লুকোতে পারলে, তারা বাঁচে ॥

পানকৌড়িরাও বিলাপ করে। সংগ্রামের অনামী উল্লাস তাদের জন্যে নয়। বজ্রকে ভেঙে পড়তে দেখে তারা সন্ত্রস্ত ॥

বোকা পেঙ্গুইনের দল পাহাড়ের গুহাগহ্বরে সভয়ে আশ্রয় খোঁজে। আর সমুদ্রের মাথার ওপর, রুপালি ফেনপুঞ্জের ওপর এক ঝোড়ো পাখি দৃপ্ত পাখসাটে উড়ে চলে ॥

আরও নিচে, আরও ঘনকৃষ্ণ হয়ে সমুদ্রের দিকে নামে ঝোড়ো মেঘ, সংগীতমুখর তরঙ্গমালা বজ্রের সান্নিধ্য চেয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে ॥

বজ্র ভেঙে পড়ে। জলের সঙ্গে হ ওয়ার বাধে হিংস্র যুদ্ধ। দুরন্ত ক্রোধে হাওয়ার দল ঢেউগুলোকে জাপটে ধরে, রত্নচূড় জলরাশিকে তারা পাহাড়ের গায়ে ছুঁড়ে দেয়, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ॥

বিদ্যুতের কালো ঝল্‌কানির মত ঝোড়ো পাখি আকাশ মন্থন করে, ঝোড়ো মেঘকে তীরের ফলার মতো বিদীর্ণ করে, দ্রুত-বেগে জলরাশিকে ফেড়ে ফেলে ॥

দানবের মতো ধেয়ে চলে ঝঞ্ঝার কালো দানব। নিয়ত সে অট্টহাসি হাসে, নিয়ত সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে—উপহাস করে ঝোড়ো মেঘকে, কান্না পায় তার আনন্দের আতিশয্যে ॥

বজ্রের ভেঙে-পড়ার মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ দানব শোনে ক্লান্তির চাপা ফিস্‌ফাস্‌। সে জানে মেঘ মুছে দিতে পারবে না সূর্যকে। কখনও পারবে না, কখনও পারবে না ঝোড়ো মেঘ সূর্যকে মুছে দিতে ॥

সমুদ্র গর্জে ওঠে · বজ্র ভেঙে পড়ে।

সমুদ্রের সীমাহীন বুকে ঝোড়ো মেঘের গায়ে জ্বলে ওঠে কালো বিদ্যুৎ,

নিচের দিকে নিক্ষিপ্ত অগ্নিবর্ষী বান জলরাশির হাতে প্রথমে বন্দী, তারপর নির্বাপিত হয়। কিন্তু তার সর্পিল ছায়াটি বেদনায় মুচড়ে মুচড়ে উঠে সমুদ্রের গভীর তলদেশে হারিয়ে যায় ॥

এখুনি ঝড় উঠবে। ঝড় উঠতে দেরি নেই।

তবু সেই দুঃসাহসী ঝোড়ো পাখি বিদ্যুতের ভিড়ে, গর্জমান উত্তাল সমুদ্রের ওপর দিয়ে দৃপ্ত পাখসাটে উড়ে চলে। তার চিৎকারে পুলকিত প্রতিধ্বনি ওঠে, চূড়ান্ত জয়ের ভবিষ্যদ্‌-বাণীর মতো—

সমস্ত ভীষণতা নিয়ে ভেঙে পড়ুক, ঝড় ভেঙে পড়ুক ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আলেক্‌সান্দর ব্লক

ঐকতান-গায়কের দলে

ঐকতান গায়কের দলে এক কুমারীর কণ্ঠ কথা বলে
ও বলে তাদের কথা দূরদেশে যারে দুঃখ ডাকে,
সে-সব জাহাজ যারা ভেসে ভেসে দুরন্ত পাথারে পাল তোলে,
ও বলে, এমনও আছে যে ভুলেছে সুখ বলে কাকে।

এই গান গায় কণ্ঠ। কণ্ঠ সেই গীর্জা ছেড়ে গম্বুজে ছড়ায়।
শঙ্খশাদা দুই কাঁধে পিছলে পড়ে ঝলসে ওঠে আলো,

আবছা অন্ধকারে বসে এদিকে সবাই শোনে ও-কে গান গায়
উজ্জ্বল আলোয় দেখে গান নাকি পোশাক চমৎকার।

ওরা বোঝে অনুভবে আনন্দের উপস্থিতি শিয়রে ওদের,
পৃথিবীর যত নদী মৃদুগতি, জাহাজ নোঙরে,
জানে ওরা অনুভবে এতোদিনে দূরদেশে শ্রান্ত মানুষের
জীবনে মিলেছে দিশা, ধন্য তারা যারা প্রাণ ধরে।

ওই কণ্ঠ মধুস্যন্দী, ও-আলোক মর্মে মর্মে আবেগস্পন্দিত ;
কেবল অসীম শূন্যে স্বর্গদ্বারে মানুষের শিশু
স্বর্গীয় রহস্য ভেদ করতে গিয়ে কেঁদে উঠলে মর্ত্য রোমাঞ্চিত—
যে-জন ফিরবে না আর তার জন্য কাঁদলেন যীশু।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সামরিক পদশব্দ

মোটা আর ভারি পর্দা ঝুলছে দরজায়,
জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে রাতের কুয়াশা।
ঘৃণ্য স্বাধীনতা রইল কতটা বজায়
জুয়ান, যখন মানলে ভয়, তার ভাষা ?

সজ্জিত শয়নঘর, নির্জন, তুহিন,
ভৃত্যেরা গভীর ঘুমে, রাত যায় বেজে,
অজানা দূরের দেশ দুঃখলেশহীন,
তারই মোরগের ডাক তোমার কানে-যে।

দেশদ্রোহী, ও-ডাকের অর্থ ভেবে দেখে
কিবা লাভ—আয়ু যার নিতান্ত সীমিত ?
ডোনা আনা সুপ্ত, বুকে হাত দুটি রেখে,
ডোনা আনা সুখসুপ্ত, স্বপ্ন-পরিবৃত।

ঘরের আয়নায় কার ক্রূর মুখচ্ছবি,
দাঁতে-দাঁত-চাপা, দৃঢ়, পাথরসদৃশ ?
আনা, ও-কবরে সুখনিদ্রা কি সম্ভবই ?
অপার্থিব জন্মে স্বপ্ন দেখাও ঈদৃশ ?

জীবন প্রকাণ্ড শূন্য, নিরর্থক, ফাঁকা !
এগোও সম্মুখ-যুদ্ধে, সুচির মরণে !
প্রত্যুত্তরে তুষারিত অন্ধকারে একা
বেজে উঠল শিঙা মুগ্ধ উল্লাসী রণনে।

দ্রুত উড়ে চলল গাড়ি, আগুন ছিটিয়ে,
নিঃশব্দ, নিকষ কৃষ্ণ, পেচকের চোখ—
সেই বাড়ি, অন্ধকার, কম্যাণ্ডার গিয়ে
ভারি শব্দহীন পায়ে ডাকলেন লোক।

কে যেন দরজা খুলল। হিমে, ত্রস্তেব্যস্তে
রাত্রের আকাশে ঘড়ি বাজল ধরা-গলা,
ঘড়ি বাজল…"রাত্রে খাওয়া, বলেছ আসতে।
তৈরি ? দেখো, এসে গেছি, এলুম একলা।"

এ-নিষ্ঠুর প্রশ্নে কোনো মিলল না অভয়,
জবাব মিলল না। গলা ভাঙল বেহায়া।
সুসজ্জিত ঘরে একা জেগে রইল ভয় ;
প্রাণুষা ; ভৃত্যেরা ঘুমে ; রাত্রি ছায়া-ছায়া।

সেই উষাকালে, হিম বিবর্ণ উষায়
রাত্রির গুণ্ঠন খোলা, ধীর পায়ে চলা।
"ডোনা আনা, কোথা তুমি ? রানি ? সে কোথায় ?
আনা ! আনা !"—ডেকে ডেকে ভাঙে কার গলা।

গাঢ়তম কুয়াশায় অন্ধ সে-সকালে
শেষ নিশ্বাসের শব্দ ঘণ্টা বেজে বেজে :
"ডোনা আনা উঠে আসবে তোর মৃত্যুকালে,
মৃত্যুর প্রহরে তোর আনা উঠবে বেঁচে।"

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আন্না আখ্‌মাতোকা

অথচ আশ্চর্য

সকলই বিক্রীত, হৃত, প্রতারিত, সর্বস্ব লুণ্ঠিত ;
ডানার ঝাপট রেখে কৃষ্ণকায় মৃত্যু যায় উড়ে।
তিলে তিলে কুরে কুরে খায় শোক, সর্বগ্রাস শোক—
তবু আলো। কেন আলো? এতো আলো নিকটে সুদূরে?

দিনমানে জনপদ সুবাসিত সৌগন্ধ্যে চেরির—
কোন্ বাগানের চেরি? কে তা জানে। প্রকাশ, নিশ্বাসে।
আলোয় আলো যে রাত্রি—হীরাপান্না ঝলমল করে
নূতন নক্ষত্রপুঞ্জ দূর স্বচ্ছ বসন্ত-আকাশে।

ভগ্ন, জীর্ণ, জঞ্জালের স্তূপে তবু বাড়িতে বাড়িতে
সুন্দরের আবির্ভাব লগ্ন, দেখো, আজ ঘনায়েছে—
অথচ, আশ্চর্য, কেউ জানে না কো, জানে না তা কেউ,
প্রত্যাশা যদিও এরই আশে এতোকাল কাটায়েছে!

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

বিচ্ছেদ

সুগন্ধে মৌ-মৌ পাশে লাইমের সারি
খোলা দরজার হাঁ-মুখ।
পরিত্যক্ত পড়ে আছে টেবিলের ’পরে
দস্তানা ও সওয়ারি চাবুক।

লম্ফর আলোর চাকৃতি হলুদরঙিন,
কাছাকাছি পোশাকের খস্‌খস-আওয়াজও।
(কেন তুমি ছেড়ে গেলে আমাকে বলো তো ?
কিছুতেই বুঝিনি তা আজও।)

ভোরের শীতল স্পর্শে স্বচ্ছ আলোয়
এ-পৃথিবী কী যে মোহময়ী !
হে হৃদয়, শান্ত হও, ধৈর্য ধরে থাকো,
জীবনে প্রভাত আসে ওই।

আহা কত ক্লান্ত, বড়ো শ্রান্ত হয়েছ যে—
হৃদয়, স্পন্দন বড়ো শ্লথ, বড়ো ক্ষীণ।
তবু জানি, কে যেন রে বলেছে আমায়—
আত্মা মৃত্যুহীন।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

তুষার

স্তূপীকৃত তুষারের উত্তুঙ্গ কঠিনে
ঘরে ফেরা স্তব্ধতায় আমাদের চলা
ওই শুভ্র আনন্দের অমিত অধীনে।
অভিপ্রেত নয় আজ কোনো কথা বলা।

গান হতে মধুময় স্বপ্নেরা এখন
সাফল্যের রূপ নেয়। কুঞ্জপথ মাঝে
পদক্ষেপে অবনত বৃক্ষের শাসন,
রুপালি নূপুর তব অঙ্গে মৃদু বাজে।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

বরিস পাস্তেরনাক

প্রত্যুষ

আমার নিয়তির সর্বস্ব ছিলে তুমি।
তারপর এলো যুদ্ধ, সর্বনাশ।
অনেক, অনেক দিন হয়ে গেল
কোনো চিহ্ন নেই, খবর নেই তোমার।

এতোকাল পরে
আবার তোমার কণ্ঠস্বরে আমি চঞ্চল।
সারারাত ধরে পড়েছি আমি তোমাকে।
এ যেন এক মূর্ছা থেকে জেগে ওঠা।

লোকজনের সংসর্গ চাই আমি,
যেতে চাই ভিড়ের মধ্যে, সকালের ব্যস্ততায়।
মনে হয়, টুকরো করে ভেঙে দিতে পারি সব-কিছু,
পারি ওদের ক্ষমা চাওয়াতে।

দৌড়ে নামি সিঁড়ি দিয়ে,
এই যেন প্রথম
বেরোচ্ছি তুষারে ঢাকা রাস্তায়
যার দুই দিকে ফুটপাত জনশূন্য।

চারদিকে আলো, গার্হস্থ্য, লোকেরা উঠে পড়ছে,
চা খাচ্ছে ছুটছে ট্র্যাম ধরতে।
কয়েকটি মিনিটের ব্যবধানে
শহরকে আর চেনা যায় না।

ফটকে ঘন হয়ে তুষার জমল
আর তার উপর ব্লিজার্ড বুনে চলেছে জাল।
ওদের সবারই তাড়াহুড়ো সময়মতো পৌঁছবে বলে,
অর্ধেক খাবার রইল পড়ে, চা শেষ হলো না।

ওদের প্রত্যেকের জন্য আমার দরদ
যেন ওদের চামড়া আমারও,
গলমান বরফের সঙ্গে আমিও গলে যাই,
ভোরের সঙ্গে কুঁচকে তুলি ভুরু।

আছে আমার মধ্যে নামহীন লোকেরা,
শিশুরা, কুনোরা, গাছপালা।
ওরা সবাই জয় করে নিয়েছে আমাকে,
আর এই আমার একমাত্র বিজয়।

বুদ্ধদেব বসু

একটি রূপকথা

একদা রূপকথার দেশে
ঘোড়সওয়ার
টগবগিয়ে মাড়িয়ে চলে
স্টেপির পাড়।

সামনে তার যুদ্ধ। দূরে
আঁধার এক অরণ্য

ঝাপসা ধুলোর পর্দা ছিঁড়ে
আসন্ন।

হৃদয়ে অস্বস্তি, বলে
আঁচড় কেটে :
'জলের ধারে শঙ্কা, নাও
কোমর এঁটে।'

শুনলে না সে। মানলে শুধু
নিজের মন,
গাছে নিবিড় পাহাড় বেয়ে
চলল ছুটে জোর কদম ;

পাহাড় পার, মস্ত মাঠ
রইল পিছে,
শুকিয়ে-যাওয়া ঝর্নারেখার
চিহ্ন ধরে নামল নিচে।

উপত্যকায় পায়ের ছাপে
জানতে
পেল, এ-পথ গেছে জলের
প্রান্তে।

সাবধানের শব্দ ওঠে
বারে-বারে ;
বধির, নিল চালিয়ে তার
অশ্বটিকে জলের ধারে।

ঝর্না যেথায়
আঁকাবাঁকা অল্প জলে,

গুহার মুখে
গন্ধকের আগুন জ্বলে।

উগ্র লাল ধোঁয়ায় চোখ
মেঘলা হলো। অকস্মাৎ
অরণ্যেরে দীর্ণ করে
উঠল দূর আর্তনাদ।

চমকে ওঠে অশ্বারোহী :
'আমায় ডাকে!'
জবাব দিতে কঠিন হাতে
আঁকড়ে ধরে বর্শাটাকে ;

মিটিমিটি চক্ষে পড়ে
এবার তার
মুণ্ড, ধড়, লম্বা ল্যাজ
জন্তুটার।

একটি মেয়ে
বন্দী হয়ে পড়ে আছে
শল্কময় বপুর তিন-
ফেরতা প্যাঁচে।

হাঁ থেকে লাল ফুলকি ওড়ে ;
দুলছে গলা,
যেন মেয়ের কাঁধের উপর
চাবুক তোলা।

রূপসীকে, রাজ্যে এক
নিয়ম আছে,

বলি দিতে হবে বিকট
আরণ্যক পশুর কাছে।

প্রজারা এই অর্ঘ্য দেয়
অজগরে,
বিনিময়ে দখল রাখে
বস্তিঘরে।

অবাধ সাপ বন্য সাধ
মিটিয়ে নিতে
রূপবতীর কণ্ঠ, বাহু
বাঁধে কঠিন কুণ্ডলীতে।

অশ্বারোহী প্রার্থনায়
পাঠালে চোখ ঊর্ধ্বে ;
বর্শা উঁচু করো এবার
যুদ্ধে।

* *

রুদ্ধ চোখ।
পাহাড়। মেঘ। জলের স্বর
পাথর। নদী।
বছর। যুগ। যুগান্তর।

রক্তমাখা ; লোহার টুপি
লুটোয় দূরে ;
থেঁৎলে যায় সর্প, তার
ঘোড়ার খুরে।

ছড়িয়ে আছে বর্শা আর

অশ্ব, নাগ, বালুর 'পরে ;
মূর্ছিত সে ; সংজ্ঞাহীন
কন্যা প'ড়ে।

স্নিগ্ধ নীল ঝামরে নামে,
দুপুর ভরে গুনগুনানি।
এই মেয়ে কে ? কিষানী ? রাজ-
কন্যা ? রানী ?

কখনো ঘোর পুলকে নামে
বিরামহীন অশ্রুধারা,
কখনো তারা মরণঘুমে
আত্মহারা।

কখনো তার স্বাস্থ্য ফেরে,
তাকায় চোখ একবার ;
কখনো ফের রক্তপাতে
নিঃসাড়।

কিন্তু হৃৎপিণ্ড বাজে।
কন্যা, বীর, জাগবে বলে
বারেক কেঁপে, নিদ্রাবেশে
আবার ঢলে।

রুদ্ধ চোখ।
পাহাড়। মেঘ। জলের স্বর।
পাথর। নদী।
বছর। যুগ। যুগান্তর।

বুদ্ধদেব বসু

ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কি

সম্মিলিত যাত্রা

শহরে বাগান মাড়াও মাড়াও বিদ্রোহী পদভরে !
মাথা উঁচু রাখো ! ফৌজী টুপিটা আকাশে দিক না লাফ !
দুনিয়ার মোরা দ্বিতীয় প্রলয়—ছড়াই বাইরে-ঘরে
পৃথিবীর প্রতি শহর আমরা ধুয়ে মুছে করি সাফ।

পায়ে পায়ে হাঁটে নানারঙ্ দিনগুলি।
বছর গড়ায় ধীরেসুস্থেই খুবই।
গতি আমাদের ইষ্ট—যেন না ভুলি।
হৃৎপিণ্ডটা বাজে বুঝি দুন্দুভি।

আমাদের চেয়ে দামি সোনা কই, বলো তো হে যাদুকর ?
বুলেটের হুলে বিষ কত আছে শুনি ?
আমাদের এই গান হতে কোন্ অস্ত্র-সে খরতর ?
আমাদের সোনা হৈ-হৈ আর হুল্লোড়—নাও গুনি'।

সবুজ সবুজ, ঢাকুক সবুজ ঘাসে
চলে-আসা দিন, ফেলে-আসা দিন যত।
রামধনু—রঙে ঝলমল নীলাকাশে।
ছোটে টগবগ বছর ঘোড়ার মতো।

গ্রহদের মুখ চেয়ো না, ভেবো না স্বস্ত্যয়নের কথাও ;
আমাদের গান গ্রহতারাদের সওয়ার।
নক্ষত্রকে পিছে ফেলে মোরা জীবন্ত হব উধাও—
ধাত্রী মোদের সপ্তর্ষিকে শুধাও জবাব তার !

আনন্দসুধা পান করো ! হাঁকো হৈ !
শিরা দপ্দপ্ বসন্তবন্যায়।
ওঠো, বুক বাঁধো ! ঘা মারো, মারো ঘা, ওই !
শোনো, বুকে বুকে ঝাঁঝর ঝন্ঝনায়।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

স্বরগ্রাম : উঁচু গলায়

১

আমার কাব্য পৌঁছবে তোমার দ্বারে
যুগযুগের গিরিশৃঙ্গ পেরিয়ে
যত সব কবি আর মুখ্যমন্ত্রীদের
মাথা টপকিয়ে, ডিঙিয়ে
তোমার কাছে পৌঁছবে আমার কাব্য।
না, না। সেভাবে নয়, সেভাবে নয় :
কামবৃত্তিকে সুলভ সুড়সুড়ি দেবার পালক নয় সে,
মুদ্রাবিশারদের হাতে যেভাবে পৌঁছয় ক্ষয়ে-যাওয়া টাকা—
সেভাবে নয়,
না, সেভাবে নয়—যেমন চোখে পৌঁছয় কতকালের মৃত তারার আলো ;
আমার কাব্য
ঘর্মে, শ্রমে
সুড়ঙ্গ কাটুক পর্বতপ্রমাণ সময়ের বুকে,
আর, রোমান ক্রীতদাসদের হাতে-গড়া
এক-আধটি পয়ঃপ্রণালী
যেমন এসে পৌঁছল আমাদের কালে,
তেমনি দেখা দিক যুগে যুগান্তরে—
দৃষ্টিগ্রাহ্য
স্পর্শবহ
বৃহদাকার
আমার কাব্য।

আর গ্রন্থাগারে বইয়ের স্তূপে
(যেখানে কবর-চাপা থাকে কাব্য।)
যদি সেদিন হঠাৎ সাক্ষাৎ পাও এই লৌহদৃঢ় পংক্তিগুলির,
এদের স্পর্শ কোরো তুমি

শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে,
পুরোনো অথচ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র হাতে তুলে নাও যেভাবে।

২

স্বাচ্ছন্দ্যহীন বিধবার মতো
পিছু পিছু হাঁটুক খ্যাতি,
প্রতিভাবানদের শবযাত্রায়
পিছু পিছু হাঁটুক খ্যাতি;
কাব্য, আমার কবিতা!
যদি মরতে হয়, মরিস সামান্য সৈনিকের মতো—
আক্রমণের মুখে আমাদের ফৌজী মানুষ
যেমন বরণ করে নেয় অনামী মৃত্যুকে।
মণ-মণ ব্রোঞ্জের মুখে থুথু দিই আমি,
থুথু দিই মূল্যহীন শ্বেতপাথরের স্তূপে।
আর যদি খ্যাতির কথাই ধরো,
পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেব আমরা,
অংশীদার হব সবাই একটিমাত্র কীর্তিস্তম্ভের :
লড়াইয়ের ময়দানে
বুকে বুক দিয়ে গড়ে-তোলা
সমাজতন্ত্রের সেই-যে কীর্তিস্তম্ভ।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ট্রাউজার-পরা মেঘ

[অংশ]

তোমাদের ভাবনা,
বেহেড মগজে কানাকানি
মোলায়েম আরামে ফাঁপানোফোলানো জো-হুকুমের মতো,
আমি হানব বিদ্রূপ রক্তে-ভেজা হৃদয়-টুকরো নিয়ে;
আর মেটাব আমার উদ্ধত, তীব্র, জ্বালা-ধরে-ওঠা ঘৃণা,

কোনো পাকাচুলের ডোরা-কাটা নেই আত্মায়,
না পিতামহদের স্নেহ সদয়, সরস !
আমি নাড়া দিই জগৎ আমার প্রবল গলার স্বরে
আর হেঁটে যাই—দিব্যসুঠাম
বাইশ বছর বয়স।

কোমলপ্রাণ !
তোমরা বাজাও প্রেম মৃদু বেহালায়, তুচ্ছ ছড়ে
মোটামাথা হলে পেটাও তা দামামায়
তবু, পারো না যা, নিজেকে এমন উগরিয়ে ঢেলে দিতে
যেমন আমি—তো হয়ে গেছি শুধু দুটি অনাবৃত ঠোঁট !

এসো, নিয়ে যাও পাঠ—
পরিপাটি যত গণ্যমান্য শ্রীময়সংস্কার
সাজানো কথা বৈঠকখানা স্ফুট-অস্ফুট কথার।

তোমরাও, এসো, যারা নাড়োচাড়ো ঠোঁট যেন রাঁধুনির
উল্টিয়ে পাতা কোনো পাক-প্রণালীর।

যদি চাও
আমি ক্রোধে ক্ষোভে ভরা যন্ত্রণাহত ঝড়
অথবা আকাশ যেমন ফেরায় রঙ
যদি চাও
আমি অনন্ত হব নমনীয় কোমলতা
মানুষ তো নয়, ট্রাউজার-পরা মেঘ !

পুষ্পিত-হওয়া অস্তিত্বের আমি দিই নিকো স্বীকার।
আবার আমার গানেতে জোরালো রটাই,
পুরুষ যেন বা হাসপাতালের দোমড়ানো শয্যা
আর, ব্যবহারজীর্ণ প্রবাল, নারী।

ভেবেছ কি ম্যালেরিয়া আমাকে শেখালে প্রলাপ ?

এ যে ঘটেছিল
ওদেসায়, ঘটেছিল।

'আমি তো আসছি চারটেয়' মারিয়া যে বলেছিল।

আট
নয়
দশ

তারপর সন্ধ্যা
জানলার থেকে পিছন ঘুরিয়ে দাঁড়ায়
আর ঝাঁপ দেয় রাত্রিতে ক্রূর ভয়াল
রুষ্ট ভ্রূকুটি
ডিসেম্বরের শীত

আমার জরাগ্রস্ত পিঠের আড়ালে
ঝাড়লণ্ঠন বাতিদানগুলো অট্টহাসিতে ফাটে এবং হ্রেষায়

এখন আমায় পারবেও না তো চিনতে
পেশীমাংসের স্ফীত এই সমাহার
গোঙায়
এবং মোচড়ায়।
এমন একটা জড়পিণ্ড, সে কী চায় ?
পিণ্ড, তবুও আকাঙ্ক্ষা তার হাজার।

সত্তার কোনও বাছাবাছি কিছু নেই
ব্রোঞ্জে ঢালাই কে, বা কে তার
হৃদয়ে লোহার পাত।

রাত্রে সে শুধু কামনা করে, সে কামনা
সব কর্কশ, কোমলতা মুড়ে নিতে
নারীতে।

এবং তখন
প্রকাণ্ডতম,
আমি দাঁড়াই দেহ-কুঁজ জানলার ধারে,
আর আমার ভ্রূ গলায় শার্শির কাঁচ।
কী হবে কী, প্রেম না অ-প্রেম ?
এবং প্রেম যদি সে কেমনতর, কেমন
প্রবল না কি ক্ষীণ ?
এ দেহ ধরবে প্রবল প্রেম ?
হয়তো তা হবে ছোট্ট খাট্টো
বিনীত, ছোট্ট প্রেম ;
চলতি গাড়ির আওয়াজে যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে
আর শুধু ঘোড়ায়-টানা ট্রামের ঘণ্টায় মানায়।
আবার ও পুনর্বার
বৃষ্টিতে নাক ঘষে
আমার মুখ তার মুখের উপর পিষ্ট,
আমি অপেক্ষা করি
নগরীর বজ্রপাত বর্ষণের কাদায় ছিটায়

তারপর মধ্যরাত্রি আসে ছুরি শানিয়ে,
ধরে ফেলে
ছেঁটে দাও, ছেঁটে দাও তাকে
নিপাত করো !

বারোটার ঘণ্টা পড়ল
ধড় থেকে ছিট্‌কানো কাটা মুণ্ডের মতো

জানলার শার্শিতে ধূসর বৃষ্টিকণা
একসঙ্গে জুড়ল চিৎকার,
কঠিন মুখবিকারে
যেন নতরদেমের সমস্ত গার্গইল
একসাথে জুড়ল চিৎকার

উৎসন্ন যাও!
যথেষ্ট নয় কি?
চিৎকার এখনই আমার মুখের চোয়াল খুলে ধরবে।
তারপর আমি শুনলাম
আস্তে
একটা স্নায়ুর লাফিয়ে-ওঠা
বিছানা থেকে রুগীর মতো
তারপর
প্রায় না নড়ে
প্রথমে,
দিল তা দ্রুত গা-ঝাড়া
উত্তেজিত
স্পষ্ট
এখন, আরও কয়েক জোড়া মিলে
তারা জুড়ে দিল বেপরোয়া নাচ

একতলার দেয়াল-পলেস্তারা শব্দ করে খসে পড়ছে

স্নায়ু
গুরু স্নায়ু
লঘু
অনেক অনেক স্নায়ু!
মাতামাতি করতে থাকল

যতক্ষণ না
তাদের পাগুলো দুমড়ে যায়।

কিন্তু রাত্রি চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে লাগল সারাটা ঘরে—
আর দুচোখ, ভারি হয়ে নেমে আসা, সেই কাদায়জলে
থমকে দাঁড়াল

দরজাগুলো হঠাৎ জোরে শব্দ করে খুলে গেল, দমকা
যেন হোটেলের সমস্ত দাঁতগুলো ঝিকিয়ে
উঠেছে আওয়াজ করে।
তুমি ঢুকে পড়লে ঘরে আচম্বিতে
ভঙ্গি যেন 'গ্রহণ নয় বর্জন'
তোমার হাতের দস্তানা জোড়া মুচড়ে
তুমি বললে, যেন ঘোষণা :
'জানো
আমার বিয়ে'

ভালো, ভালো পরিণীতা হবে, হও
কী এমন তাতে,
আমি তা গ্রহণ করতে পারি।
দেখো, দেখো, আমি শান্ত !
একটা মৃতদেহের
নাড়ীর মতো।
মনে পড়ে
কেমন করে বলতে কথা ?
'জ্যাক লণ্ডন,
টাকাকড়ি,
ভালোবাসা,
আবেগ।'
কিন্তু আমি দেখেছিলাম শুধু এই :

তুমি, গায়োকোঁণ্ডা
হরণ করে নেবার !

অপহৃত হয়ে গেলে তুমি

প্রেমে, আমি আবার ধরব জুয়া
আমার যুগল জ্রর খিলান জ্বলে উঠবে।
কী আসবে কী যাবে !
হা-ঘরে ভবঘুরেরাও খুঁজে নেয়
আশ্রয় আগুন-লাগা পোড়ো বাড়িতে।
তুমি আমাকে করতে চাও পরিহাস ?
'তোমার অমূল্য উন্মাদনার মুহূর্ত এতো কম
ভিক্ষুকের হাতের কোপেকেরও থেকে'
কিন্তু মনে রেখো
যখন উত্যক্ত করেছিল তারা ভিসুভিয়াসকে
ধ্বংস হয়েছিল পম্পেই !

শোনো
ভদ্রমহোদয়গণ !
শৌখিন
অপবিত্রকারী,
অপরাধের
আর হত্যার
দেখেছ কি তোমরা
ভয়ংকরের ভয়ংকর
আমার মুখ
যখন
আমি
চরম শান্ত ?

আমি অনুভব করি
আমার 'আমি'
আমাকে ধরবার পথে এতো অপরিসর
অদম্যভাবে বেরিয়ে আসতে চায় একটি দেহ
আমার থেকে।

বলো!
কে বলছ কথা?
মা
মা গো!
ছেলের তোমার ভীষণমহিম অসুখ!
মা
হৃদয় তার তপ্ত তাজাআগুনে
বলো তার বোনেদের, ল্যুদা আর ওল্যাকে
লুকোবার মতো নিভৃত কোণও নেই।

প্রত্যেক শব্দ
প্রতিটি পরিহাস
তার দগ্ধ মুখগহ্বর থেকে লাফিয়ে ওঠে
যেন বা উলঙ্গ বারনারী
আগুন-লাগা গণিকাপল্লীর থেকে।

মানুষের নাকে লাগে
পোড়া মাংসের গন্ধ!
ব্রিগেডের লোকজন ধেয়ে আসে,
ঝকমকে ব্রিগেড,
উজ্জ্বল হেলমেট।
কিন্তু হাঁটু-ঢাকা বুট পায়ে নেই!
বলো দমকলের লোকেদের
যেন মমতা নিয়ে ওঠে যখন হৃদয়ে লেগেছে আগুন।

কিংবা আমাকেই দাও,
আমার চোখ থেকে আমি পাম্প করে তুলব অশ্রুজল
আমার পাঁজর ধরে এগোব
আমি লাফ দিয়ে উঠব! উঠব! উঠব!
সব ধ্বসে পড়ল,
কিন্তু, হৃদয় থেকে কি লাফ দেওয়া যায়।

একটা অগ্নিভস্ম মুখের
ঠোঁটের চিড়-ফাটলের মধ্য থেকে
একটা দগ্ধ-চুম্বন উপরের দিকে উঠে যেতে চায়।

মা
আমি গাইতে পারি না
হৃদয়ের গীর্জায় গায়কদলের মঞ্চ জুড়ে আগুন।
শব্দ ও সংখ্যার ঝলসানো মূর্তিগুলো
খুলি থেকে পালাতে চাইছে
আগুন-লাগা বাড়ি থেকে শিশুদের মতো।
তেমনি, ত্রাস
আকাশকে ধরবার প্রয়াসে
উঁচু করে তুলল
লুসিতানিয়ার জ্বলন্ত বাহু।

একপ্রস্থ ঘরের নিরুদ্বেগের মধ্যে
যেখানে মানুষ কাঁপছে
বন্দর থেকে শত-চক্ষু আগুনের ছটা এসে লাগে।
ক্রন্দিত হও
যুগযুগশতাব্দী ব্যেপে
যদি পারো এক অন্তিম চিৎকারে : অগ্নিদাহে আমি!

সিদ্ধেশ্বর সেন

একটার ঘণ্টা পার হয়ে

একটার ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে, তুমি নিশ্চিত শয্যায়।
ছায়াপথ ছড়ায় রুপা রাত্রিতে।
আমার কোনো তাড়া নেই। ঘন ঘন তার
বার্তায় তোমায় জাগাব না, যে কারণ ফুরিয়েছে।
যেমন বললে ঘটনাটি সমাপ্ত।
ভালোবাসার নৌকা দৈনিকের ধাক্কায় চুরমার।
এখন তুমি আর আমি বিমুক্ত। কী হবে তখন
নিক্তিতে মেপে পরস্পরের দুঃখ বেদনা, ক্ষত।
দেখো, বিশ্বভুবনে নেমেছে কী স্তব্ধতা শান্তি,
নক্ষত্রের উপাচারে রাত্রি আবরিত করে আকাশ।
এমন মুহূর্ত জেগে উঠবার, সম্ভাষণের
যুগ, ইতিহাস আর সৃষ্টির উদ্দেশে।

সিদ্ধেশ্বর সেন

সর্গেই এসেনিন

ও আমার ফসলভরা মাঠ

ফসলভরা মাঠ, ও আমার ফসলভরা মাঠ,
অনাথ আমি দুখের কথা কই ;
ফেলে-আসা দিনের আমার পাষাণ-হেন ভার,
(শুধু) তোমার আলোয় উজল হয়ে রই।
আমার ঘোড়ার কেশর চুমে যোজন উড়ে যায়,
পাখির মতন যায় উড়ে শিস্ দিয়ে ;
মাথার ওপর সূর্য্যিদেবের দুঃখহরণ দান
অঝোরঝরন বর্ষণ বর্ষিয়ে।

বানে-ভাসা কান্নাভরা আমার দেশের মাটি
বসন্তে তুই শান্ত, জুড়াস জ্বালা ;

তোমার ও মাঠ, তোমার ওঘাট পাঠশালা আমারই
গুরু আমার উষা, তারার মালা।

বাতাস ও তোর ধর্মগ্রন্থ, বাইবেল-পুরাণ
ভাষা তাহার বুঝতে যখন চাই—
ঈশা স্বয়ং দেন দেখা, আর সঙ্গে সঙ্গে যান
আমি যখন মেষ-চারণে যাই।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

একটি কবিতা

এরই মধ্যে সন্ধ্যা।
কাঁটাগাছে ঝিকঝিকে শিশিরবিন্দু।
পিঠ রেখে আইভি গাছে
পথে একা দাঁড়িয়ে আছি।

চাঁদের জোরালো আলো
বাড়ির ছাদে।
দূরে কোথা থেকে কানে আসে
নাইটিংগেলের গান।

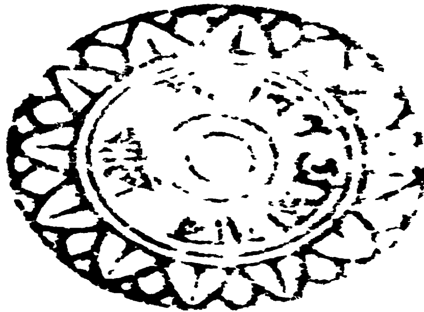
আরামী উষ্ণ আমেজ,
শীতকালে উনুনের পাশে যেমন।
আর উদ্যত বার্চের সারি
দীর্ঘায়িত মোমবাতির মতো।

আরো দূরে নদীর ওপারে
বনের কিনারায়
নিদ্রালু প্রহরীর খটখটি
জাগায় বিরস ধূসর শব্দ।

সমর সেন

চীনা কবিতা





ওয়েন ই-তো

তিনটি কবিতা

১

ঠকাতে আমি চাই না তোমাকে,
কবি আমি নই, -
তবু ভালোবাসি আমি
শাদা পাথরের কঠিন শুদ্ধতা,
সবুজ দেওদার আর সাগর,
দাঁড়কাকের পিঠে চাপা সন্ধ্যার সূর্য,
গোধূলিতে ভরে ওঠা বাদুড়ের ডানা।
তুমি জানো আমি ভালোবাসি
যে বীর তাকে—
আর ভালোবাসি উঁচু পাহাড়
আমি ভালোবাসি দেশের নিশান
বাতাসে যে দেয় হাতছানি
বাসন্তী রঙ থেকে শুরু করে
ব্রোঞ্জ রঙের চন্দ্রমল্লিকা।
মনে রেখেছ তো
আমার খাদ্য হচ্ছে এক পাত্র তেতো চা!
কিন্তু আরো একটা আমি রয়েছে,
তোমার ভয় করে না?
সেখানে মাছির মতন ভাবনা,
ময়লা-ফেলা-কেনেস্তারায় হামাগুড়ি।

২

সেদিন ভাগ্যের হাত থেকে ছাড়া পেলেই যাই!
ভয় নেই – যদিও পার হতে হবে এক কালো সুড়ঙ্গ,
তুমি সাহস করে এগিও; ধরতে দিও আমাকে তোমার হাত;
প্রশ্ন কোরো না কোথা হতে এলো এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস।

কেবল মনে রেখো আমার আজকের কথা, সাবধানে রেখো
দুহাতে জড়িয়ে ধরা, জড়ো-করা চুমো, সাবধানে রেখো ওই জলন্ত হাসি,
সব গুছিয়ে তুলে রাখো, কম না হয়—মনে রেখো আমার কথা,
উঠিয়ে রাখো, আরো. ওই প্রবাল-রঙের একটানা বুক-কাঁপা।

দুঃখ এই, আজ তুমি কেঁদেছিলে—মন চায় মনকে—
সে সময় তোমাকে কুড়োতে দেওয়া উচিত ছিল, একটা আরাম,
কুড়িয়ে নাও আমাদের আজ হারানো হলুদ সোনা।
ওই হরেক রঙের চটকানো পাপড়ি, সবই আমাদের ভালোবাসা,
উঠিয়ে নাও, ধারণ করো।
তুমি পরেছ ভালোবাসার আলোকমালা,
আমরা আরো এগিয়ে যাই, ওর জন্য থাক নরক আর স্বর্গ।

৩

তুমি সূর্যের দিকে তুলে হাত শপথ করেছিলে,
ডেকেছিলে শীতের বাজপাখিকে,
বলেছিলে তুমি ভক্ত, তুমি শুদ্ধ,
বেশ তো   আমি তোমায় বিশ্বাস করছি,
যদি মনের আবেগে কান্না ফুল ওঠে ফুটে
তবু আমি অবাক হব না।
সত্যি ! তুমি কী-যে শপথ করলে
'যতদিন সমুদ্র না শুকোয়, পাথর না ক্ষয়ে যায়'
তাতে আরো হাসি পায়।
কেবল একটা ফুৎকারের অপেক্ষা !
এখনও কি আমি মাতাল হইনি ?
আবার কি বলছ, 'চিরকালের জন্য' ?
ভালোবাসা, জানো তুমি একটা নিশ্বাসের লোভ আমার এখনও আছে,
এসো, তাড়াতাড়ি আমার মনটাকে ঘিরে ফেলো,
তাড়াতাড়ি, তুমি চলো, তুমি চলো…
তোমার এই চালটা আমি আগেই ভেবেছিলুম

বদলও কিছু হয়নি

'চিরকালের জন্য', আগেই হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে দিয়েছ,
আমার ভাগে খুদকুঁড়ো
অন্যে পেয়েছে তোমার বিচিত্র পাতার সমারোহ—
পরিপূর্ণ হাজার বসন্ত।
তুমি বিশ্বাস করছ না?
যদি একদিন মৃত্যুদূত দেখায় তোমার নামের সই
তখন যাবে না? যাও চলে যাও,
তার কোলে গিয়ে থাকো,
তার সঙ্গে বলো তোমার
'সমুদ্র না শুকায়, পাথর না ক্ষয়ে যায়'
শপথের কথা—
বুঝিয়ো তোমার শুদ্ধতা!

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উয়েন ই থুয়ো

প্রিয়তমা

প্রিয়তমা, তুমিই করেছ কিস্তি মাৎ।
দাবা খেলি এসো আর এক হাত
জিততে চাই না আমি
হারতেই চাই
এই দেহভার এই সত্তা
চাই একেবারে হারিয়ে ফেলতে
তোমাতে।

জ্যোতি রায়

ঠাট্টা নয়

ঠাট্টা নয়, আমি অমন জাতের কবি নই।
যদিও স্ফটিকের দ্যুতি মুগ্ধ করে আমাকে
ভালো লাগে সবুজ পাইন, বিশাল সাগর, কাকের ডানায়
সূর্যাস্তের শেষ ছটা, বাদুড়ের পাখায় পাখায়
জট-বাঁধা ধূসর আকাশ। বীর আর পাহাড়ের চূড়াও
আমার প্রিয়, হাওয়ায় ওড়ানো জাতীয় পতাকা
নাড়া দেয় আমাকে, আমাকে নাড়া দেয় সব রঙ
রঙ গেরুয়া থেকে ক্রিসেনথিমামের ঘন জমাট—তামাটে ঠাট;
তবু মনে রেখো আমার রুচি—
এক পাত্র পুরোনো চায়ে।
হয়তো চমকে উঠবে: আমার মধ্যে এ আর এক মানুষ
যার ভাবনা ঘুরছে মশার মতন গুন্ গুন্
আর সে হুমড়িয়ে আছে আবর্জনার স্তূপে।

জ্যোতি রায়

ফং চি.

আমাদের তারুণ্যের

আমাদের তারুণ্যের শঙ্কাহীনতায়
সেই কতদিন আগে অন্ধকার রাতে
তোমাকে জাগাল। কতবার কতভাবে
ভেঙে গেছে ভুল, তবু সেই জাগরণ জেগে রয়।
তাই চিরদিন আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে;
আমরা এ যুগে লক্ষ্য করেছি তোমাকে,
মূঢ়তার অবাধ খেয়ালি রাজ্য এক

সমানে চলেছে ; আমাদের যুগধাত্রী
রইলেন চিরকাল অজ্ঞাতবাসেই।

কখনও দেখেছ তুমি মেঘ-চেরা আলোর বিবৃতি
তারপর ফিরে চেয়ে ফের দেখা ঝড়—ঘনীভূত ;
খেদহীন যাত্রা শেষ এবার তোমার,
এই দুর্বিপাকে শুধু ফোটাতে পারত
তোমার ঠোঁটের কোণে, একটি আশার স্মিতরেখা
চলতি পথের পাশে জেগে-ওঠা ঘাস।

জ্যোতি রায়

ভ্যান গগ

যেখানেই গেলে
জ্বাল্‌লে আগুন
দহনযজ্ঞে প্রাণের।
আগুনে রাঙল
গম্ভীর স্থির শিশুগাছ একসারি,
আগুনে সতেজ ঝলমল
ঐ যায় ঐ পথের মানুষ
—আকাশে সূর্য অগ্নিক্ষরা।
নববসন্তে আসা
কান্ত তরুণ গাছ
একটা জেলের উঠোন মাত্র—
দুটোই দেখছি আকাশে তুলেছে হাত মন্ত্রের ঘোরে
আকুতি ছড়াল বিশাল শূন্যে
হলো থর থর শিখা
জ্বল্‌ল।
মাথা নিচু করে আবছা আলোয়
ছুলে চলে কারা আলুর খোসা—
বরফ জমাট রেখা, তা কখনও গলবে না গলবে না।

আরও যে কতই চিত্রিত ছবি—
কত না সাঁকোর, সোনার তরীর;
আর তুমি, তুমি হতে চেয়েছিলে নাকি
এই যারা যাবে পারে, সেই সব হতভাগ্যের পারানি?

জ্যোতি রায়

পিয়েন চি সিন

টুকরো

তুমি দেখছ সেতুর ওপর থেকে
কেউ দেখল তোমাকে বারান্দার থেকে
পূর্ণকলার চাঁদ হাজির তোমার জানলাতে—
আর তুমি তো সাজাও কার
স্বপ্নের রূপরেখা।

জ্যোতি রায়

নির্জনতা

গ্রামের ছেলে সে
তার ভয় ছিল নির্জনতায়
বালিশের নিচে রাখত তাই ঝিঁঝিপোকা।
বড়ো হলো—শহরে এলো—হতো হাড়ভাঙা খাটুনি
এক মুহূর্তের রইল না অবসর
কিনল একটা ঘড়ি
ঘড়িতে কাঁটাগুলো অন্ধকারেও জ্বলত।
ছেলেবেলার ঝিঁঝিদের সাথে তার রেশারেশি ছিল—
আগাছাভরা কবরখানা জুড়ে ঝিঁঝিঁ করত ওরা।

তিনঘণ্টা হলো সে মারা গেছে,
কিন্তু ঘড়িটা চলেছে ঠিকই—
টিক টিক টিক।

জ্যোতি রায়

আই চিং

রিক্ততা

পাহাড় রিক্ত   একটাও গাছ নেই
জমিটা রুক্ষ   একটিও নেই লতা
নদীটা শুষ্ক   একটুও জল নেই
জনতা ক্ষুব্ধ   অশ্রুও নেই চোখে।

জ্যোতি রায়

শীতের বনে

শীতের বনভূমি পেরোতে আমি ভালোবাসি।
শীতের বন : রৌদ্র রিক্ত, রুক্ষ হাওয়া, ঝরছে বরফ,
নেই কোনো রঙ, পাখিদের গান বন্ধ,
শীতের বন নির্জনে এই পেরিয়ে যাওয়ায় বিমুগ্ধ মন আমার।
কোনো এক শিকারী যেন
চুপিসারে—পেরিয়ে চলব শীতের বন
না হতেও পারে শিকার জোটার কপাল।

জ্যোতি রায়

রাতের গান

তুমি, তুমি আবার স্বপ্ন ভেঙে উঠেছ,
আবার চোখ মেলেছ ভোরের আলোর দিকে,
আবার মনে আনছ তোমার চলে যাওয়া দিনগুলো,
কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়ে বালিশের উপর,
হাল্কা আক্ষেপ খানিকটা
বিশেষ কিছু না, কিছু তো আর পাপ করোনি,
কেননা কান্নার আবার রকমফের আছে :
কখন আনন্দে, কখন দুঃখে,
কখন নরম শিহরণে,
কখন বিরাট ভাবধারায়,
কখন বা যে লোক গাইতে পারে না,
সে চায় তার বুক ঠেলে উড়ে যাক গানের শব্দ
সঙ্গে নিয়ে যাক তার ছোটোখাটো কষ্টগুলোকে, ভাবনাগুলোকে।

কিন্তু তুমি তো এই এতোটুকু ছেলে,
তুমি বলছ মানুষের ভালোবাসার মধ্যে তুমি বেড়ে উঠেছ,
তোমার আবার কারণ না বলতে পারার কী মানে থাকতে পারে ?
কোনো কোনো সময় নাকি ভালো করে ঘুমোতেই পারো না ?
তুমি বলছ তুমি হচ্ছ অগ্নিপিণ্ড,
তাহলে তুমি বরং তাড়াতাড়ি পুড়ে শেষ হয়ে যাও।
তুমি বলো যে জানে সে বুদ্ধিমান তার আরো বেশি কষ্ট,
যে জানে সে সুন্দর তার আরো বেশি মন খারাপ।
না, যে বুদ্ধিমান তার এই কষ্টের মধ্যে থেমে থাকা উচিত নয়,
যে সুন্দর তার কেবল নিজের রূপের কথাই ভাবা উচিত নয়।

আর আমাদের নিঃসাড় বোধ করা ঠিক হবে না।
শীতপ্রধান দেশ থেকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ

সর্বত্র আমাদের মতন মালি রয়েছে
বদলে চলেছে মানুষের বাগান :
আমরা চাই বদলে দিতে প্রকৃতির মরশুম,
যদি তাতে প্রাণীজগৎ হয়ে ওঠে আরো সুন্দর।
যদি মাটির কাদা থেকেও
উঠে আসে গরম ভাব, বের হয় সুগন্ধ।
তুমি, তুমি তো সবে আমাদের দলে ভিড়েছ,
তুমিই বলো না তোমার বেঁচে থাকাটাই ঝকমারি ?
না, আমরা বেঁচে আছি
মানুষের মাঝে, আমাদের মাঝে, আমরা চাই আনন্দ
তাই মানুষ যদি এখনও তা না পেয়ে থাকে
তাহলে সেটা আমরা নিজেরাই গড়ব।

তুমি বলছ তুমি বিশ্বাস করো মানুষের আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ,
কিন্তু তুমি নিজে হচ্ছ ব্যতিক্রম।
মানুষের সবাই যখন হাসছে,
আশ্চর্য তোমার কি মনে হয় না সেই ধরনের আনন্দ ?
এখন সমবয়সী ছেলেমেয়েরা
সূর্যের আলোর নিচে খেলে বেড়াচ্ছে,
মরশুম ভালো পেলে প্রেমও করছে,
আশ্চর্য তোমার ঈর্ষা জাগে না ?
না, কাল আছে আমাদের কালকের আনন্দ
আজ আছে আমাদের আলো ঝলমল কর্তব্য।
তুমি আবার তাই ঘুমিয়ে পড়ো।
রাতের নিস্তব্ধতা আর বিস্তার
সে তো আমাদের ভাবনার জন্য নয়
সে হচ্ছে আমাদের বিশ্রামের জন্য,
যাতে করে প্রচুর আনন্দ আর জোর নিয়ে
নতুন দিনকে আমরা অভ্যর্থনা জানাতে পারি,

আর কাজের মাঝে আনতে পারি
ঘুমের ঝোঁক আর আশীর্বাদ।
তুমি আবার তাই ঘুমিয়ে পড়ো
ধীরে ধীরে বুঁজে ফেলো তোমার চোখের পাতা।

আমার শরীর ঘুমোচ্ছে, আমার মন আছে জেগে।
গানের মধ্যে গান
আর আমার মগজ যেন পাল্লাখোলা জানলা,
আমার চিন্তা আমার মেঘের দল,
আমার দিকে ছিটকে ভেসে আসছে,
তার উপর আবার বৈশাখ মাস
সকাল বেলা চমৎকার, চমৎকার সূর্যের আলো,
সন্ধ্যেবেলা চমৎকার, চমৎকার চাঁদের আলো,
কিন্তু আমি মোপাসাঁর গল্পের সেই
কড়া অথচ মজার ধর্মযাজক হতে পারব না,
ঘুম আসছে না বলে হাতজোড় করে যে বলে :
"ভগবান, তোমার তৈরি এই কালোরাত তো ঘুমোবার জন্যে,
তবে আবার কেন বানালে এই চাঁদের আলো, আর গাদাখানেক তারা,
আমার ঠোঁটের পাশে ভাসা এই মদের মতন আবহাওয়া ?"
আমি খাট ছেড়ে উঠতে পারি না, ঢুকতে পারি না বনের মধ্যে,
বলতে পারি না প্রতি গাছের আছে এক সুন্দরী আত্মা,
আর তারপর তাদের সঙ্গে একসাথে কাঁদতেও পারি না।
তা ছাড়া আমি তোমার মতো নয় শেলী!
আমি বলতে পারি না আমি হচ্ছি এরিয়েল,
ছোট্ট একটি আত্মা, উড়ে বেড়াই,
উড়ে বেড়াই যেখানে কেউ কোথাও থাকে না, পাহাড়ের খাদে।
"Alas ! I have no hope, nor health…
Nor fame, nor power, nor love, nor leisure…
আমি তোমার মতন একলা প্রেমের গান গাইতে পারব না,
"I arise from the dreams of thee …"

তুমি বোধহয় সারাদিন কিছুই করতে না,
গ্রীষ্মের রাতে ঘাসের উপর কেবল শুয়ে
গরম দেশের এক ঘুম দিতে।
কিন্তু কমরেড হো চি ফাং, তুমি বলছ,
যা স্বাভাবিক তা তোমার ভালো লাগে না,
তবে তোমার বইয়ের মধ্যে
যেটা স্বাভাবিক সেটা অত সুন্দর করে কেন লিখলে ?

হ্যাঁ এই স্বাভাবিক নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই।
যেটা স্বাভাবিক সেটাকে আমি করি দৃশ্যপট। একটা গহনা মাত্র ;
যেমন কখনও বা মাঠে বেড়াতে যাই,
কখনও বা একগোছা ফুল গুঁজে দি বোতামের ছোট্ট ঘরে,

স্বাভাবিকের সঙ্গে তুলনা করতে চাই বলেই
মানুষকে ভালোবাসি আরো বেশি।
আমরা শেষ করেছি উনবিংশ শতাব্দীর সহজভাব।
আমরা আজকের মানুষ।
তার উপর আমি চাই লড়াইয়ের কথা বলতে।
মানুষের মধ্যে লড়াই এখন ভীষণ হয়েছে।
ফ্রান্সের রণাঙ্গনে দু'লক্ষ সৈন্য যেন দুই বিরাট ঢেউ
পরস্পর ঠেলাঠেলি করছে, পরস্পর মারছে, পরস্পর কামড়ে গিলছে।

প্রতিবার ট্যাঙ্ক বেরোচ্ছে একসঙ্গে তিন হাজার।
লীগ অফ নেশন্‌স্ যেন কপর্দকশূন্য মনোহারী দোকান ;
দলিল শুধরোচ্ছে, লোক বরখাস্ত করছে,
আর সবাই বার করছে কিছু সেই বাবদ টাকা।
তুমি তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ো, ইতালি !
তবু তুমি আছো, আমেরিকা,
প্রাণপণে যুদ্ধের যোগান দিয়ে বানিয়েছ তোমার বিরাট ভুঁড়ি,•

প্রতি বছর তুমি চাও পঞ্চাশ হাজার উড়োজাহাজ।
তোমরা সবাই তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ো, ঢুকে পড়ো।
কেউ তোমাদের টেনে আনতে পারবে না,
পাগলের মতন ছুটে যাবে তোমাদের শেষদিনের দিকে।
কত জ্যান্ত মানুষ,
কত পরিষ্কার মাথাওয়ালা লোক,
কত মহৎ সাদাসিধে লোক,
কত এই পৃথিবী আর তার ভবিষ্যৎ নিয়ে কাজ করবার লোক,
জোর করে তাদের দিয়ে বানাচ্ছে জ্যান্ত লোক পোঁতবার জিনিস ?

আর আমি, আমার কত ইচ্ছে ওদের গিয়ে জড়িয়ে ধরি !
তা ছাড়া আমি মোটেই হা হুতাশ করছি না
আমি জানি তারা জাগতে চায়, দাঁড়াতে চায়,
সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধকে বদলে নিতে চায় বিদ্রোহের যুদ্ধে,
আর মৃত্যু আর বিস্মরণের মধ্যে থেকে জন্ম দিতে চায় নতুন ইউরোপ,
নতুন পৃথিবী,

তা ছাড়া আমি চাই লেনিনের কথা বলতে।
আমি তাকে দেখেছি।
আমি দেখেছি তাকে ছোটো ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে

'এদের জীবন ভালো করে তুলতে হবে।
আমাদের জীবনের মতন কেবল কষ্ট-ভরা যেন না থাকে।'
আমি দেখেছি তাকে ভোরবেলা জানলার সামনে :
'আমার গ্রামের এক কমরেডকে চিঠি লিখলুম।
ও মনমরা হয়ে আছে, হাঁপিয়ে পড়েছে।
ওকে সান্ত্বনা না দিয়ে আমি থাকতে পারি না।
কেননা এই মেজাজ জিনিসটা একটা ছোটোখাটো ব্যাপার নয়।'
তা ছাড়া আমি যেন ওর ওই চিঠি পেলুম।
যেন শুনলুম সভায় তাঁর বজ্রকণ্ঠ :
'আমাদের স্বপ্নালু হতেই হবে।'

হ্যাঁ, আমি এই কাজ ভালোবাসি ;
আবার স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি ;
আমি নিজেকে ভালোবাসতে পেলে ভারি খুশি হয়ে উঠি,
আবার নিজেকে খাটুতে হবে শুনলে কষ্ট হয় ;
নিজেকে টেনে তুলতে হবে !

ভাই আমার, তুমি কেন মন খারাপ করছ ?
আরে কাঁদুনে, তুমি বলো তো জীবন কেন সুন্দর নয় ?
তুমি বলো, তুমি দেখেছ চাঁদকে পিছলে কালো মেঘের মধ্যে ঢুকতে,
দেখেছ, রাতের বাতাসে এক গোছা কাঁটা-গোলাপ কাঁপছে।
দু'জন প্রেমিক, বেশিক্ষণ ছেড়ে থাকতে পারে না,
প্রথম যেখানে চুমু খেয়েছিল সেইখানে দেখা,
নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভুলে, আলাপ, স্বপ্ন আর আবেগ ভুলে,
এ ওকে করে নিষ্ঠুর পরীক্ষা, বলে ফেলে পরস্পরের বেইমানি।
তুমি বলো, তুমি দেখেছ এক চাষীর ঘরে,
মাকড়সার জাল, তিলের তেলের আলো আর গোরুর নিশ্বাসের মধ্যে
বিয়ের ভোজের পরে, একটু কেন মন ওঠেনি বলে
স্বামী শুরু করে জানোয়ারের চিৎকার, মারতে যায় নতুন বৌকে।
তুমি বলো, তুমি দেখেছ, আত্মীয়ের বাড়িতে মানুষ
পাঁচ বছরের এক অনাথ
সূর্যের আলো ভর্তি রাস্তায়
ছুটছে, ছুটছে আবার হঠাৎ থেমে গেল,
হঠাৎ কেঁপে ওঠে ঠোঁটটা, চোখের জল গড়িয়ে পড়ে
সত্যি, জীবন মোটেই সুন্দর নয়, একেবারেই নয়।
তুমি বলছ, তুমি আবার সেই গল্পটা বলবে—
যে গল্পটা এর মধ্যেই অনেকবার বলেছ—
একটা ছোট্ট ফিঙে প্রতি রাতে দেবমূর্তির গা থেকে
জহরত তুলে নিয়ে বিলোত গরীবদের মধ্যে
অনেক, অনেক গরীব লোক,

শীতকাল এসে গেল তবুও উড়ে দক্ষিণ দেশে গেল না
শেষে ঠাণ্ডায় জমে নিজেই মারা গেল।
তুমি বলছ, আমরা রূপকথার মধ্যে বেশিক্ষণ কেন বাঁচতে পারি না,
কেন কেবল বইয়ের মধ্যেই সহজে পাওয়া যায়
মুক্তোর মতন নরম আলো দেওয়া গল্প ?
তুমি বলছ, তোমার চলে যাওয়া ধারণাগুলো আবার তুলবে—
ওগুলো সত্যি ভীষণ পুরোনো ধারণা—
তোমার মনে হয় আমরা মানুষরা
গাছ-পাতারও সমান নই, জানোয়ারদের জীবনেও আনন্দ আছে
তা ছাড়া সংগতি :
ঘাস গাছ কেমন এক সঙ্গে সারাটা জীবন বেঁচে থাকে,
লম্বা কিংবা ছোট্ট জীবন,
তা ছাড়া বাঁচিয়ে চলেছে ওদের জাতকে,
ভরিয়ে চলেছে জমি ; আর জানোয়ার
প্রচণ্ড ক্ষিদের সময়েও
নিজেদের জাতকে মারে না, কাটে না, গিলে খায় না,
একেবারেই পারে না পরস্পর মারামারি কাটাকাটির এক মুহূর্ত আগে
মুখে হাসি মেখে কান-ভোলানো কূট কথা বলতে।
তুমি বলো, তুমি জানো
তোমার দেখা খুব কম, অত্যন্ত অল্প,
এর থেকে অনেক বেশি নোংরা, অনেক বড়ো নোংরা—
হ্যাঁ, এর থেকে অনেক বেশি নোংরামি আছে,
অনেক বড়ো নোংরামি।
আর এই জন্যই তো আমরা বিপ্লবের দলে ঢুকেছি।
তুমি বলছ,
তুমিও বিপ্লবের কথা তুললে -
তুমি বলছ যে তুমি জানো যে বিপ্লব
সাবান মেখে সুগন্ধ স্নান নয়,
শাদা দস্তানা পরেও এ কাজ হাসিল হয় না
আমাদের হাত ভর্তি কাদামাটি

আর পেশীগুলো ফেটে পড়ছে
তার উপর ছোঁয়াচ লাগার নোংরাকেও আমরা ভয় করি না।
তুমি বলছ, তোমার হচ্ছে ছোটোদের স্বপ্নালু মন,
ওই রকম সহজেই কেঁপে ওঠে।
তুমি বলছ, তোমার আর কোনো গল্প বলা উচিত
যেমন ধরো, যে আগুন এনেছিল তার গল্প—
দেবতা-বিরোধী তাকে লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছিল নেড়া পাহাড়ের চুড়োয়
প্রতিদিন ভীষণ শকুনে ঠুকরে খেতো তার মেটে,
যে মেটে ঠুকরে খাবার পরেও আবার গজাত,—
মানুষের ইতিহাসে আগুন আন্‌নেওয়ালা শুধু একজনই নয়,
আজকাল আগুন আননেওয়ালা কেবল একলাই নেই,
আছে অগুন্তি দলের লোক,
তার তাই আছে অগুন্তি গল্প।
তুমি বলছ, তুমি দেখেছ
অন্ধকারের আলোর ভিতর দিয়ে,
কষ্টের আনন্দের ভিতর দিয়ে,
মৃত্যুর নতুন জন্মের ভিতর দিয়ে,
কুৎসিতের সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে,
এরা মোটেই দূরে নয়,
মোটেই এরা ছায়া নয়,
কেননা তুমি কেবল দেখোই নি
এদের থেকে নিশ্বাস টেনেছ
যেমন আকাশ থেকে, মরু থেকে, আর ভোরের আবহাওয়া থেকে টানো।
তা হলে ভাই তোমার আর কী বলার থাকতে পারে?
তা হলে বোকা তুই আবার কাঁদছিস কেন?
তুমি বলছ, তুমি কাঁদছ তোমার নিজের দুর্বলতায়,
তোমার নিজের বোকামির জন্য।
তোমার নিজের আঙুল দিয়ে তোমার কান্না মুছে ফেলো,

এসো আমরা আলোর গল্প করি,
আনন্দের গল্প করি, সাহসের গল্প করি।

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইউ মিন চুয়ান

মর্মর শব্দে

মর্মর মর্মর
ঝরাপাতা ঝরে যায়
বিছায় আমার ভাবনায়—
সেই পাতাগুলো সরিয়ে দিল না কেউ।
তোমার নীরব রহস্য দুর্জ্ঞেয়
এক অশান্ত সমুদ্র
করেছে আমার আকণ্ঠ ভরাডুবি।

বিস্মিত দৃক্‌পাত
সুনীল আকাশে,
সীমাহীন এই শূন্যতা
শূন্য সীমাহীনতা,
মেঘের চূড়ায় আরূঢ়
বিমানচালক ঝরে পড়ল কি—মৃত?
ভাবতে বোসো তা। লাওৎসে আর চুয়াংৎসজ্‌ পড়ো
দশটি বছর ঠেসে।

জ্যোতি রায়

শিশু

একটা আয়নার সামনে
আঙুল চুষছে শিশু
দার্শনিক কাণ্ড বললেন—
'এই বর্ণে বিমুগ্ধ হওয়া
আর ভোজনে বিলাস পাওয়া
প্রাকৃতিক এক ধর্ম।'

আধুনিকাদের ঠেলায় নার্সিসাস
আবার তার মুখ দেখে জলে—
'ইদিপাস কমপ্লেক্স'—ঘাড় নাড়লেন
ফ্রয়েড।

জ্যোতি রায়

মু-তান

নিরাশাবাদী

অনেকদিন আগে ঝাপসা-আঁধারে বুদ্ধ-মন্দির নিঃসঙ্গতায় পূর্ণ ছিল,
চোখ-ঝল্‌সানো ধুনোদানিতে আগুনের ফুলকি অনেক আগেই নিবেছে,
আমাদের কাছে সংসার হচ্ছে খানিক শুকনো নীরস পাঁক,
তবু তাতেই গড়েছে রত্নাসনের ওই মূর্তি, আর ওর চোখে
এখনও চমক, ধৈর্য আর কাপুরুষতার আভা,
ও ত্রিকালজ্ঞ, ও মানে ভূত, ভবিষ্যৎ।

আর এরা সব পাপিষ্ঠ,
ইতিহাসের এরাই পুরুষ আর স্ত্রী; অসংখ্য ভুলের পাহাড় গড়ে তোলে,
যারা ভূমিষ্ঠ হয়ে উৎসর্গ করে তেজ বীর্য,
শেষে তারাই কাঁদে, বিদায় নিয়ে চলে যায়।

রাজনৈতিকেরা মিথ্যে চেঁচিয়ে চলে 'আমরা মুক্তি চাই।'
যে মানুষ সকলের জীবন নষ্ট করে চলে গেল মেরু দেশে,
সেও দু হাত তুলে স্তব্ধ—মৃত্যু—ভাগ্যাকাশের কাছে জানায়
'আমায় তাপ দাও, কেন তাপ দেবে না ?
আমি ধ্যানে অপেক্ষা করছি তোমার সেই মহাপ্রেম !
সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যাও : এই সব হট্টগোল, রাগ আর ঘেয়ো রক্ত,
সংসারের ধুলো ! তবু দেখো আমার শরীর কী-রকম শুদ্ধ নির্মল।'

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাপানি কবিতা



অচিন পাখি

এ কোন্ নূতন পাখি মোর জানালায় ?
বহিয়া তারার আলো আঁখি তারকায় ?
শানিত দৃষ্টির তেজ অন্তর ভেদিয়া
আঁধারের করে অবসান, বিচ্ছেদিয়া
রুদ্ধ প্রাণরহস্যের করে আবিষ্কার !
অগ্নিদ্যুতি-সমুজ্জ্বল পক্ষদুটি তার
দক্ষিণের আকাশের হিরণ্য-প্রভায়,
কণ্ঠস্বরে রাগিণীর মূর্ছনা ছড়ায় !
আমার নিরালা ঘর ভরি উঠে গানে,
বিফল জীবন ভরে আনন্দের দানে ।
নাহি জানি নাম তার, এলো কোথা হতে,
অবারিত-আলো-ভরা আকাশের পথে,
কী বারতা নিয়ে এল দূর অজানার !
স্বপ্নে যেন ফিরে আসে জীবনে আবার
অতীত নিদাঘস্মৃতি, ফিরে আসে ধীরে
বসন্তের সঞ্জীবনী হেমন্তের তীরে !
উড়িয়া পলাবে পাখি সে ভয়ে দুর্বল
রুদ্ধশ্বাসে বসে আছি, বিস্ময়ে নিশ্চল !
জানি যাদুকর-জালে পড়িয়াছি ধরা,
মায়ার আলোকে যার স্বর্গ আজি ধরা !

প্রিয়ংবদা দেবী

আবেদন

যখন জাগেনি উষা আমি সেই ক্ষণে
অন্তরের আবেদন আনি তার দ্বারে,

চন্দ্র-আঁকা শৈল-চূড়ে গুহার আঁধারে
যেথা অজানার বাস নিঃশব্দ ভুবনে।

আমার অন্তর ভাসে শুভ্র সরসীর
বাষ্প-কুয়াশায়, যেথা অরণ্যের তীরে
শৈবালে চাঁদের আলো স্বপ্নে দেয় ঘিরে,
চকিত ছায়ায় কাঁপে আবেগ নিশির!

বনের হরিণ আমি সবল স্বাধীন,
মানব-পরশ-ভীরু, দূরতা-প্রয়াসী ;
শুধু তুমি ওগো মোর কল্প-লোকবাসী,
আনন্দে করিলে মোরে চির-ভয়হীন!

কমলা, কমল-আঁখি তোমার কিরণে
অপূর্ব পুলকে পূর্ণ সর্ব বনস্থল,
মানিক্য-কণ্ঠের সুরে উল্লাসে চঞ্চল,
দূরতার ব্যবধান নাহিক স্মরণে!

প্রিয়ংবদা দেবী

লোগুচি

মর্মবেদনা

ওগো ভগবান, এই বুকে মোর যে অনল শিখা জ্বলে,
তারি ছায়াখানি উঠিল কি ভাসি ভানুর অস্তাচলে?

অশান্তিময় ক্ষুব্ধ হৃদয় তোলে কি প্রতিধ্বনি,
সিন্ধুবেলায় উথলে যখন তরঙ্গ গরজনি?

আর্ত আরবে পথহারা বায়ু আঁধারে যখন ধায়,
অন্তর্গূঢ় মোর বেদনা কি সে তিমিরে ভাষা পায় ?

নয়নে আমার বারিধারা যবে ঝরে পরমেশ্বর,
স্বর্গের ব্যথা অশ্রুনিঝরে নামে কি এ ধরা-পর ?

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সমুদ্রের প্রতি

হে ভীষণ বিশালতা, হে বিস্ময়বিকম্প্র বিস্তার !
হে অকূল ধবলিমা, মহাশান্তি তলতটহীন !
শুনি তব সৌম্যমুখে আশীর্বাণী যেন বিধাতার
কী অমোঘ প্রত্যাদেশ ধরে তব গহন তুহিন !
স্থলচর আমাদেরে শুনাও তোমার রুদ্রবীণা,
মানবের বৈতালিক, চিরন্তন সত্যের উদ্গাতা !
তোমার সংগীতরবে ভুলে যাই মোর বাহুলীনা
প্রেয়সীরে, ভুলি গৃহ সুখশয্যা যেথা মোর পাতা।
অমৃতের উৎসধারা তোমা মাঝে হয় আত্মহারা,
ত্রিদিবের মহাশক্তি ঘনীভূত তব নীলজলে।
বিস্ময় বিহ্বল মোর ভীরু হিয়া কপোতের পারা
ওড়ে তব বক্ষোপরি, ছায়া তার ভাসে ঊর্মিদলে।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

হাইকু

জীবন

জীবন ?
একটি চিন্তা, আলোর কাঁপন।
কাক উড়ে যায়
নভোনীলিমায়।

বৈচিত্র্য

সবই একঘেয়ে ?

দেখো চেয়ে

ওড়ে পাখি ফোটে ফুল,

মাধুরীর নাই তুল।

তমিস্রা

সাঁঝের আঁধার

আমার প্রিয়ার কেশভার।

স্বর্গ হতে

নেমে এলো তমিস্রার স্রোতে

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ইয়ামামুরা বোচো

একক

গোধূলি বেলায়

আকাশ,

এবং আমার অতীত—

তার দুঃখ ;

আকাশে

অসংখ্য পৃথিবীতে পথ করে

পাখিরা চলে গেছে—

জানে না কেউ কোথায়

দিব্যেন্দু পালিত

হাঙ্গিওয়ারা সাকুতারো

ডাকঘরের জানালায়

ডাকঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে
বাড়িতে চিঠি লিখি।
অবস্থাটা ঝোড়ো কাকের মতো, মুমূর্ষু
জুতো এবং ভাগ্য দুটোই ছেঁড়া।
আকাশটা ধূসর
এবং আজও আমি বেকার।

বাবা, আমাকে বলো
জীবনের আর কী বাকি।
ছেঁড়া ঝুলির সামর্থ্য গুনি
নেতিবাচক দুঃখের চিন্তায়;
পয়সাগুলো যেন আমারই জীবনের টুক্‌রো,
ছুঁড়ে দিই ফুটপাথের উপর।
হায়রে আমার শহর,
হায়রে আমার বুড়ো বাপ!

আমি সোজা চলে যাব সমুদ্রে—
বিষাদের পথে হেঁটে যাব জেটি পর্যন্ত,
বাতাসের মতো ঘুরতে-ঘুরতে।
হে জীবন!
আমি বাঁশির শব্দ শুনছি
একটি জাহাজ এবার সমুদ্রে যাবে।

দিব্যেন্দু পালিত

একটি ইচ্ছা

লক্ষ্যহীন, অর্থহীন,
স্বল্পায়ু—
কিন্তু সত্য।
একটি অসাধারণ সত্য কবিতা—
যদি এইসব দিনে
মাত্র সেইরকম একটি লিখতে পারতুম!
এখন জানি ঈশ্বর কী চেয়েছিলেন
মেঘ সৃষ্টির আগে।

ঘুমপাড়ানি গান
আমার মা যা গাইতেন এক সময়—
তাও যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়ে আনতে পারতুম!
কিন্তু মুহূর্তের আবেগে গাওয়া সেই গান—
মা অনেকদিনই ভুলে গেছেন।

আমার জীবদ্দশায়,
একবারও যদি লিখতে পারতুম
বাতাসের মতো এক গান, স্ফূর্ত ও প্রাঞ্জল,
তবুও গেঁথে যেত মানুষের অন্তরে,
বাহ্যিক সবকিছুই হারিয়ে যেত হঠাৎ,
আর বেঁচে থাকত মানুষের সঙ্গে সঙ্গে—
যদি লিখতে পারতুম সেই রকম একটি!

দিব্যেন্দু পালিত

হোরিগুচি দাইগাকু

শিয়াল

আঙুর বনে
একটি শিয়াল
এবং একটি নেকড়ে তোমার
জানালায়!

দিব্যেন্দু পালিত

কণ্ঠহার

বাসনা আমার
অশ্রু ফোঁটায় একটি তারে
তোমার জন্যে
বাঁধতে পারি
কণ্ঠহার।

দিব্যেন্দু পালিত

সাইজো ইয়াসো

কেউ

বাতায়নের পাশ দিয়ে কেউ যায়
বলতে বলতে : "আঁধার, শুধু আঁধার।"

(অবাক হলাম সমস্ত ঘর আলো
এমন কী ওই বাহিরেতেও আলো)

কিন্তু ঘরের পাশ দিয়ে কেউ যায়
বলতে বলতে, "আঁধার, বড়ো আঁধার।"

দিব্যেন্দু পালিত

ফুকাও সুমাকো

দান্তের সমাধি

দান্তের সমাধির সম্মুখে, যেখানে সূর্য তার আবহমান কিরণ বিলায়, আমি প্রার্থনা করেছি যথার্থ মানবিক হবার—আর, যদি তা পূরণ হয়, তাহলে আমি আর চাইব না কবি হতে।

দান্তে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন এক রুপালি চাবুক—সেই বিখ্যাত অস্ত্র, প্রচণ্ডতম ঘৃণার আদর্শ, যে-ঘৃণার নিষ্ঠুর কশাঘাতে নিজের পিতৃভূমিকে আঘাত হানতে-হানতে তাঁর হাত-ব্যথা হয়েছিল। আমি নাড়িয়ে দিয়েছিলুম, ভারবাহী খচ্চরের জন্য কখনো একে ব্যবহার করব না এই প্রতিজ্ঞায়—হঠাৎ আমি দৃঢ় হয়েছিলুম।

অনেক পবিত্র পাতা জড়ো হয়েছিল দান্তের বাগানে, আর তাদের কাঁটায় বিদ্ধ আমার সম্বল ছিল তীব্র অনুভূতি। নবজন্মে দীক্ষিত এক রমণীর মতো দর্শকের খাতায় সই দিয়েছিলুম, তোমার অনুগত পরিচারিকা—সুমাকো ফুকাও।

দিব্যেন্দু পালিত

মিকি রোফু

বৃষ্টির গান

[অংশ]

বৃষ্টিপাতের শব্দ
শান্ত হৃদয়ে
আমার হৃদয়ের খুব কাছে বৃষ্টির শব্দ।

শব্দটা শুনতে শুনতে,
বৃষ্টির শব্দে,
যেন আমার প্রিয়তমার দীর্ঘশ্বাস
তার ঝুঁকে-পড়া ললাট আমার বুকে।

আর যখন ঝিরঝিরে
যেন টুকরো যন্ত্রণা ;
আবার নতুন জোর এলে,
যেন আকণ্ঠ বিষাদ।

আহা, এখনো ঝরে পড়ছে বিষাদের সুর,
হৃদয় উথলে উঠছে তীব্র আকাঙ্ক্ষায়।
রাতের বৃষ্টির দীর্ঘশ্বাস
হৃদয়ে স্বপ্নের মতন…

দিব্যেন্দু পালিত

মারুইয়ামা কাওরু

দূর থেকে স্কুলের দৃশ্য

স্কুল ছাড়ার পর থেকে দশটি বছর শুধুই ঘুরেছি
পিছনে তাকালে বহুদূর স্মৃতির মাঝে দেখতে পাই
উজ্জ্বল পদকে খচিত স্বস্তির মতো স্কুলটি :
টালির ছাদ, ক্লাশঘর—
একজন শিক্ষক বলে যাচ্ছেন।
অনেক অরুণ মুখ, নির্নিমেষ মগ্ন চোখে শুনছে তাঁকে ;
কিন্তু জানালার পাশে কে যেন অন্যমনস্ক,
আমারই মতো, অমূর্ত চোখে এদিকে তাকিয়ে—
সে কি এখনো আমাকে দেখেনি ?
হায়, এখান থেকে আমি যে তাকে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ··

দিব্যেন্দু পালিত

উৎসব

আশ্চর্য বলতে হবে
আমার পছন্দ
উৎসবশেষের মুহূর্ত।

উৎসবের মাঝে
মানুষের ভিড়ে
কদাচ নিজেকে হারাই।
আমি খুঁজি—
আমি শুধুই খুঁজে ফিরি।

কিন্তু উৎসব শেষ হলে
যখন সমস্ত মানুষ ছত্রখান,
জড়িয়ে পড়ার মধ্যে
আবিষ্কার করি নিজেকে
আনন্দিত সবাই যখন উদ্দেশ্যবিহীন,
অবাক হয়ে
নিজেকে দেখি।

আবার,
আশ্চর্য বলতে হবে,
আমি পছন্দ করি
একটি উৎসব গড়ে তুলতে

দিব্যেন্দু পালিত

ব্যাঙের আত্মকাহিনী

আমার জন্ম বোলোগ্‌নার আশেপাশে,
এক পদ্মপুকুরে।
তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে, আকাশে লাথি ছুঁড়ে—
পুচ্ছহীন চারপেয়ে পাখির দৃশ্য
বিস্ময় বয়ে আনত আমার কাছে।
আমার নাম কোয়েবুক্—
নামটি, অবশ্যই, নিজের দেওয়া।
একদিন ধরা পড়লুম জালে,
সোজা চলে এলুম এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ;
সঠিক বলতে হয়, গ্যাল্‌ভানি ল্যাবোরেটারিতে।
কয়েকজন ছাত্র (যতদূর জানি)
হেঁটে গেল, ভেনিসীয় গানের গুঞ্জন তুলে—
১৭৮০-র সেই বিকেলে,
ধারালো এক ছুরি চলে গেল আমার উদর বিদ্ধ করে,
বিশ্ব বুঝে নিল বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎস।

আমি মরে গেলুম,
আমি চলে এলুম পৃথিবীর বাইরে —
ইতালির স্বর্গ সুন্দর, অতি সুন্দর।

দিব্যেন্দু পালিত

ব্যাঙ্

তোমার স্বপ্ন
দিগন্ত-ছোঁয়া চূড়ার থেকেও দূর ;

তোমার পিঠ
স্বর্গের ফাঁদ···

(হ্যাঁ, তা সত্যি)

দিব্যেন্দু পালিত

তাকামি জুন

স্বর্গ

স্বর্গ কোথায় শুরু ?
কালো ঘুড়িটা যেখানে ওড়ে
সেইখানে কি স্বর্গ ?

লোকচক্ষুর বাহিরে
এখানে
একটি ফল ধীরে ধীরে পেকে উঠছে,
আহা, তার চারপাশে ইতিমধ্যেই নেমে এসেছে স্বর্গ।

দিব্যেন্দু পালিত


প্রকীর্ণ লেখমালা

রাত্রি

ঘুমোও বাছা ঘুমোও, তোমার ঘুম আসবে বলে
পশ্চিমের ঐ আকাশ থেকে মিলিয়ে গেল আলো ;
আলোর কণা নিবল সবই, শিশির শুধু ঝলে,
আমার মুখটি শাদা কেবল, আর সকলই কালো।

ছোট্ট খোকা, তোমার চোখে স্বপ্ন নামে, তাই
পথ ঘাট সব এলিয়ে আছে শান্তিতে নিঃঝুম ;
নদীর জলের আওয়াজ ছাড়া শব্দ কোথাও নাই,
একলা আমি রই জেগে, আর বিশ্বভরা ঘুম।

আস্তে নামে কুয়াশা—সে ডুবায় স্তব্ধ ধরা,
নীলাভ এক দীর্ঘ নিশাস মিলায় তমিস্রায় ;
হালকা মৃদু স্নিগ্ধ হাতের আদর যেন ভরা,
শব্দবিহীন শান্তি এলো, বিশ্বভুবন ছায়।

আমার গানে ঘুমিয়ে পড়ে আমার খোকনমণি,
একলা সে নয়, গানের দোলায় যেই সে ঘুমে ঢলে,
অমনি দেখি সেই দোলনে সমস্ত ধরণী
গভীর সুখের গহীন গাঙে উধাও ভেসে চলে॥

অজিত দত্ত

চেয়েছি একটি শিশু

একটি শিশু ! দুজনের মিলনের একটি স্মারক
চেয়েছি তোমার কাছে চূড়ান্ত সুখের দিন-যামে
তোমার অস্ফুটতম গুঞ্জনে কাঁপাত যবে হাড়
জলজলে কপালে জাগত অনুরাগ বিন্দু বিন্দু ঘামে।

চেয়েছি কুমার এক। বসন্তের তরুণ তমাল
বাড়ায় ব্যাকুল বাহু নীলাকাশে, তেমনি সে হোক ;
অপাপবিদ্ধ প্রাণ, দুটি ঠোঁটে অধীর আগ্রহ
আশ্চর্য, আয়ত নম্র যেসাসের মতো যার চোখ।

বাহু তার মালা হয়ে জড়াক না গলায় আমার
আমার জীবন-স্রোত তার মাঝে লুপ্ত হয়ে যায় ;
সত্তার গভীর থেকে পাহাড়ের শিখরে শিখরে
একটি কোমল গন্ধ সবখানে নিশ্বাস ছড়ায়।

যেতে যেতে আমরা তাকে চেয়ে দেখি যে মেয়ে মা হবে,
ঠোঁট যার কাঁপা কাঁপা, দৃষ্টি যার প্রার্থনার মতো।
প্রেমিক-যুগল হাঁটি, ভিড় ঠেলে অকস্মাৎ পথে,
শিশুর আশ্চর্য চোখে চেয়ে হই বিস্ময়-আহত।

তন্দ্রাহীন রাত গেছে সুখের, স্বপ্নের জাল বুনে ;
বিধ্বস্ত হয়নি শয্যা বাসনার উদগ্র ব্যসনে।
ঘুম-পাড়ানিয়া গানে গা-মুড়ে যে জন্ম নেবে কাল
তারি উপাধান আমি রচেছি বক্ষের দুটি স্তনে।

সূর্য ততো উষ্ণ নয় যার নিচে সে পোহাবে রোদ,
আমার কর্কশ কোলে, তাকে আমি শোয়াব কী করে !
হৃৎপিণ্ড উত্তাল হয়, আশ্চর্য এ দেবতার দান
যত দেখি, দীন দুটি চোখে ততো অশ্রু ওঠে ভরে।

মৃত্যুকে নেইকো ভয় ; তার দুটি চোখে চোখ রেখে
ক্ষতি বিনষ্টির সব শঙ্কা, সব চিন্তা মুছে যায় ;
মৃত্যুর পাতাল সিঁড়ি ভাঙতে আর ভয় নেই, কোনো
উজ্জ্বল সকালে কিংবা ছায়াম্লান বিষণ্ণ সন্ধ্যায়।

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

পার লাগারকুইস্ট

গোধূলিবেলার শোভার অন্ত নেই

গোধূলিবেলার শোভার অন্ত নেই।
স্বর্গের থেকে ক্ষরিত প্রণয় যেন
জ্বলছে এবং নিবছে
মাঠের উপরে, পৃথিবীর ঘরবাড়ির উপরে, আকাশে।

সবই যেন বড়ো কোমল, কান্ত ; কেউ
মমতার হাত বুলায় তাদের শরীরে।
দূরের ভূমিকে মুছে দিয়েছেন ঈশ্বর।
সবই এতো কাছে, সবই এতো দূরে তবু।
যা-কিছু পেয়েছে মানুষ, পেয়েছে শুধু দু দিনের জন্য।

সবই তো আমার। অথচ আমার কাছ থেকে সবকিছু
ফিরিয়ে নেবেন তিনি।
খানিক বাদেই সবকিছু ফের ফিরিয়ে নেবেন তিনি।
এই গাছ, ওই মেঘ, আর এই পায়ের তলার মাটি।
চিহ্নবিহীন চলে যেতে হবে, একা।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ভার্নার ফন হাইডেনস্ট্যাম

কত অনায়াসে ক্রোধে জ্বলে ওঠে মানুষ

কত অনায়াসে ক্রোধে জ্বলে ওঠে মানুষ!
কত অনায়াসে, হৃদয়ের কোনো খবর না নিয়ে, সবাই
ব্যক্তি-প্রাণের দোষারোপে দেখো মত্ত!

অথচ প্রতিটি হৃদয়ে রয়েছে সেই অলক্ষ্য কামরা,
দরজায় যার তালা দেওয়া, আর যে-তালা খোলে না চাবিতে।
ঘরের ভিতরে দীপের আগুন, সে-আগুনে কোন্ তেল
পুড়ছে, তা কেউ জানে না।
শুধু দেখা যায়, চাবির ফোকর দিয়ে
ম্লান বিশীর্ণ আলো এসে পড়ে বাইরে, এবং তার
আভায় আমরা ঘুরি ফিরি, জাগি, অথবা ঘুমিয়ে পড়ি।
সেই আলোতেই চিনি পথ, সেই আলোকিত পথ দিয়ে
চলি আমৃত্যু যেখানে পথের প্রান্ত।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এরিক অ্যাক্সেল কার্লফেল্ট

কল্পসুখ

দারিদ্র্যজ্বালাজর্জর এই জীবনের থেকে আমি
সঙ্গিবিহীন দুঃখের রজনীতে
গান গাই, ওগো ঈপ্সিতা বধূ, এ-গান তোমার জন্যে।
এবং আমার স্বপ্নে তোমারই ছবি আঁকি, ছায়াশান্ত
পাইনের পটভূমিকায় ওই দীপ্ত মুখের আদল
না-ফোটা অবধি ছবি এঁকে যাই আমি।

উজ্জ্বল ক্রানবেরির রক্তরসে এ তোমার ব্যগ্র
ওষ্ঠ এঁকেছি, লাল আর শাদা রঙের কোমল শ্যাওলায়
এঁকেছি তোমার কণ্ঠ এবং বুক।
এবং তোমার সোনালি চুলের শোভাকে
ধরেছি শরতে-সোনারঙ এই বার্চের পাতা দিয়ে।
ধরতে পারিনি তোমার হাসির উন্মুখতাকে শুধু।

তুমি জেগে আছো আলোকের ঐশ্বর্যে
বীণার মধুর স্বরতরঙ্গে যেন
জেগে আছো তুমি। অথচ তোমার হৃদয়
আসক্ত আজও নিশীথকালের অরণ্যমর্মরে,
ভালোবাসো তুমি ঝিল্লির গান আজও।
শূন্যতা নয়, অনন্ত সুখ নয়,
তুমি চাও ঘাস, চাও ফুল, নীরবতা,
চাও বিস্মৃতি, শান্তি।

যখন তোমার ইচ্ছা জ্বলবে আগুনে
এবং সকল সংশয় হবে ছিন্ন,
ফিরবে না আর, তখনই আমার এখানে আসবে তুমি।
আমি গান গাই সেই মিলনের চিন্তায়,
এ দুটি জীবন যেখানে হারায়, গলে যায় যে-মিলনে।

দারিদ্র্যজ্বালাজর্জর এই জীবনের থেকে আমি
সঙ্গিবিহীন দুঃখের রজনীতে
দৃপ্ত কণ্ঠে গান গাই: "যদি হও চিরসঙ্গিনী,
তবে আর ক্ষয়ক্ষতির চিন্তা কোরো না।
তোমারই শোভায় সুন্দর হবে আমাদের গৃহখানি।
সুখ হবে যৌতুক।
সকাল আবার দেবে উপহার শান্তি।"

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

য়োহান লুডভিগ

জলের ঢেউ

চরণ দুটি ডুবিয়ে দিয়ে জলে
মেয়েটি ছিল নদীর তীরে বসে,
সহসা পাখি আকাশ থেকে বলে,

"ও মেয়ে তুমি দিও না ঢেউ জলে
জলের এই আয়না যদি ভাঙে
আকাশ আর ভাসবেনাত জলে!"

নয়ন তুলে আকাশে চায় মেয়ে
চাহনি যেন বেদনা ঢালে নীলে
শাওন বুঝি নামল চোখ ছেয়ে।

"নদীর তরে পেও না ব্যথা পাখি
এখনি জল স্বচ্ছ হয়ে যাবে—
নালিশ আছে জানিয়ে তবে রাখি!

যখন তুমি আমারে নদীবাঁকে
তরুণ সাথীর সঙ্গে দেখেছিলে
তখন কেন বলোনি পাখি তাকে:

ও ছেলে তুমি দিও না ঢেউ জলে
আবিল হবে কুমারী প্রাণ তার—
দিও না ঢেউ, আয়না ভেঙে গেলে
ফলিত সেথা হবে না নভ আর।"

কবিতা সিংহ

ফ্রান্‌ৎসে প্রেশেরেন্‌

নির্দেশ

সাহস হয় না উপেক্ষা করি তোমার মানা,
কাছে গিয়ে হাতে হাত রাখি বারেবারে,
চেয়ে দেখো, ওগো সুন্দরী, সুশাসনা।
এ হৃদয় কত অনুগত হতে পারে।

সাহস হয় না উপেক্ষা করি তোমার মানা
বহন করতে তোমার কাননে প্রণয়, প্রিয়া—
চেয়ে দেখো, ওগো সুন্দরী, সুনয়না!
কত সুশাসনে রেখেছি হৃদয়, নিষ্ঠুর দরদিয়া।

সাহস হয় না উপেক্ষা করি তোমার মানা
তব উপবনে নিয়ে যেতে মোর প্রেমের সাজি,
চেয়ে দেখো, ওগো সুন্দরী সুবসনা!
সযত্নে কত বাঁধনে বেঁধেছি হৃদয়মুকুলরাজি।

সাহস হয় না উপেক্ষা করি তোমার মানা
মিলনপিয়াসী নয়নে তোমার মূর্তি গাঁথা,
চেয়ে দেখো, ওগো সুন্দরী সুভাষণা!
নির্দেশ তব হোক সে কঠোর, বন্ধ আমার চোখের পাতা

এ কী নির্দেশ, এ যে ক্ষমাহীন, প্রিয়া,
ভুলে যেতে হবে যা-কিছু তোমার স্মৃতি,
ওগো সুন্দরী, নিষ্ঠুর দরদিয়া,
অক্ষম আমি, জানিনে তেমন রীতি।

যদি পারো দিও আমার হৃদয়ে অপরের সংহিতা
আরো ভালো যদি মন যায় পরবাসে,
তার আগে প্রিয়া, তোমার চেষ্টা বৃথা,
তোমার ছবিটি আমার মানসে শাশ্বত উদ্ভাসে।

শিশির চট্টোপাধ্যায়

শ নীলসন

হাঁটু মুড়ে চুপে

হাঁটু মুড়ে চুপে প্রেমিকের দল
ধায় সপ্তমী চাঁদে,
বাদক কাঁপছে কাঁদছে কোমল
সুরের মূর্ছনাতে ;
অথবা যেমন লিলির গুচ্ছ
মৃদু প্রতিজ্ঞা করে,
পরিব্রাজক তেমনি লাজুক
বুঝিনি ঘুণাক্ষরে।
অনুশোচনার অশ্রু যেমন
পাপের উপর ঝরে
নীরবে, দুঃখ ঘনায় যেমন
বেহালায় অগোচরে ;
ঘোষণাবিহীন ঝঞ্ঝাশূন্য
বিনা অসি বিনা তেজে,
ভালোবাসা এসেছিল একদিন
বুঝিনি সে এসেছে যে ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জর্জ সেফেরিস

সাইপ্রাসে সালামিস

দুপুরে কখনো সূর্য, আবার কখনো লঘু বৃষ্টি মুঠো মুঠো
তার সে সৈকত পূর্ণ প্রাচীন পাত্রের যত চূর্ণকণিকায়।
স্তম্ভগুলি, অবান্তর। এখন আছেন মাত্র সন্ত এপিফ্যানিঅস
স্বর্ণপ্রভ সাম্রাজ্যের সংহত সামর্থ্যে যিনি স্তিমিত উজ্জ্বল।

যৌবনের মাংস ও শোণিত, ভালোবাসাবাসি, সব দৃশ্য ঘটেছে এখানে ;
হৃদয়ের দ্রুতগতি, ঝিনুকের আরক্ত গোলাপ, হালকা পায়ে
নিতান্ত-নির্ভয়ে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া,
এবং উন্মুক্ত বাহু ইচ্ছায় যে যুক্ত হতে চায়।
প্রভূত জলের পরে ঈশ্বরের স্বর।
এই ছিল লয়ের প্রদেশ।

নুড়িতে পেলাম শুনতে কার পদপাত।
দেখিনি তাদের মুখ। পিছনে তাকানোমাত্র তারা পলাতক।
গবাদি চলার মতো আমাকে দলিত করে গুরুভার সে স্বর অথচ
রয়ে গেল আকাশের শিরায় শিরায়, সিন্ধুর উদ্বেলে
নুড়িতে নুড়িতে, বারবার :

"পৃথিবীর হাতল নেই, যে
তারা তুলে নেবে কাঁধে, নিয়ে চলে যাবে।
যত তৃষ্ণা তীব্র হোক, তবু তারা হয় না সক্ষম
আধ ঘটি জল ঢেলে লবণসমুদ্রবারি স্বাদু করে নিতে।
এবং এ সব দেহ, মাংস ও রুধির,
কোন্ সে অপরিচিত দেশের মাটিতে যারা পেল রূপ পেল অবয়ব
আত্মা বসবাস করে তাদের ভিতর।
সে আত্মা বদলাবে বলে জড়ো করে তারা যন্ত্রপাতি।
কিন্তু তা কিছুতে হবে না। বড়ো জোর চূর্ণ করতে পারে
যদি আত্মা চূর্ণ করা যায়।
পরিণত হতে শস্য দীর্ঘ কিছু সময় নেয় না
বিশেষ হয় না দেরি
গেঁজে উঠতে কটুতার স্বাদ
বিশেষ হয় না দেরি
পাপের উত্থান হতে
রুগ্ন মন শূন্য হয়ে যেতে

বিশেষ হয় না দেরি
পাগলামিতে পুনরায় ভরে দিতে তাকে।
সেখানে রয়েছে দ্বীপ।"

বন্ধু যারা বিগত যুদ্ধের,
আজ বন্ধ্যা পরিত্যক্ত মেঘলিপ্ত সিন্ধুর সৈকতে
দিন যবে ফুরায় ফুরায়, তোমাদের কথা ভাবি—
রণে যার মৃত্যু হলো, যার হলো দীর্ঘকাল পরে,
মৃত্যুর কুয়াশা চিরে দেখল যারা ঊষার উত্থান,
অথবা তারার নিচে নৃশংস নির্জনে
অনুভব করেছিল যারা শরীর পুড়িয়ে জ্বলে দুর্নিবার প্রলয়ের
অতিকায় অন্ধ রাঙা চোখ;
এবং তাদেরও কথা, প্রার্থনায় নতজানু ছিল
যখন জাহাজগুলি দীর্ণ করে দিয়েছিল ইস্পাতের জ্বলন্ত করাত
"হে ঈশ্বর, কিছুতে দিয়ো না ভুলতে
কোন্ পথে এলো হন্তারক;
স্বার্থবুদ্ধি, লোভ, মিথ্যাচার,
প্রেমধারা শুষ্কস্রোত।
ঈশ্বর, সামর্থ্য দাও, করি সব সমূলে নির্মূল।"

এখন উপলে বসে ভুলে যাওয়া বুঝি শ্রেয়স্কর;
নিরর্থক বাক্যব্যয়
শক্তিধর যা দেয় নির্দেশ, অন্যথা ঘটাবে তার সাধ্য কার এতো?
স্বীয় কণ্ঠস্বর কেউ পারে কি শোনাতে?
প্রত্যেকের স্বপ্নগুলি পর্যন্ত পৃথক; যে আতঙ্ক একের নিদ্রাকে
দারুণ বিরক্ত করে অন্যে তার খবরই রাখে না।

ঠিক কথা। কিন্তু দূত ইতিমধ্যে পথে অগ্রসর
এবং যতই দীর্ঘ হোক পন্থা তার, হেলেস্‌পণ্টকে বাঁধতে যারা

চেয়েছিল, সে তাদের হাতে অবশ্যই
সালামিস-সমাচার পৌঁছে দেবে আতঙ্কজনক।
জলের রাশির পরে ঈশ্বরের স্বর।
সেখানে রয়েছে দ্বীপ॥

অশ্রুকুমার সিকদার

এস্. ডি. কুজো

দ্বিজ

ওরা এলো সমুদ্রপথে,
ঢেউয়ের মালার মতো অসংখ্য অগুন্‌তি এলো ওরা।
সমুদ্র-সবুজ আলখাল্লা পরনে
শাদা ফেনার ঝালর-দোলানো পোশাকে
ওরা এলো আর গেল, আর আবার এলো আরো অনেকে।
সোনালি বালিয়াড়িতে চিরকালের আল্‌পনা টেনে টেনে
ওদের অমোঘ ভবিতব্যে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় এলো যখন
তখন রাত্রি।

ওরা এলো বহুদূর ডাঙা ভেঙে, জীবন্মৃতের দল,
নতুন জন্মের জোয়ান জোয়ারে এলো ওরা।
আর আমার মায়ের দীর্ঘশ্বাস ছাপিয়ে
রাত্রির গহনে হাওয়ার নরম পদশব্দ চাপা দিয়ে
আমার কানে বাজল কুহকের গলা।
অবশেষে মোরগ-ডাকা ভোরে গান গেয়ে উঠল নিসর্গ,
আর শিশিরের জড়োয়া-বিজড়িত হাত তুলে
বিমুগ্ধ আমাকে ডাক দিল প্রত্যূষা।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

একটি কবিতার অংশ

আহা, তামালিতে ফুলের কী বাহার,
আগুনগন্ধ ফুল !
ওরা কখনো রঙ বদলায় না
যতই ছিনিমিনি খেলুক ওদের নিয়ে হার্‌মাটান-হাওয়া।
পাহাড়ের মাথায় সেই ক্রুশকাঠ এখনো দেখতে পাই
দেখতে পাই ঘাসে-বিছানো তোমার চুল ;
পরলোক আজ আমাদের দুজনকে ঢেকে রেখেছে
আর একদিন ভালোবেসে কী সুখীই না ছিলুম আমরা।
হাসির সেই বর্ণালি আজ নেই :
আমি হারিয়ে বসেছি আলো।
স্পর্শময় অন্ধকারে
অরণ্যের নৈঃশব্দ্য শুনি শুধু,
দাঁড়িয়ে থাকি চুপচাপ :
আমি কি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই ?......
কেবল স্বপ্নে দেখি গীতিকবিতার মতো তোমার দুটি বুক
আমার প্রলাপজড়ানো মনের ঝোড়ো পাথারে
নৌকোর মতো দোলে।
আমি অপেক্ষা করে আছি
তোমার তপ্ত চুম্বনের প্রতীক্ষায় বিশুষ্ক ঠোঁট
আমি অপেক্ষা করে আছি :
ঘাসের ফাঁকে হিল্‌হিলিয়ে চলে গেল একটা সাপ
আস্তে-ধীরে, ভ্রূক্ষেপ না করে, সময়ের মতো নিঃশব্দে
সময়ের মতো।
আমি অপেক্ষা করে আছি :
কোনো খবরই আনে না হাওয়ারা ;
গাছের ফাঁকে-ফাঁকে ফাটলে-ফোকরে হাওয়া দেয়
হাওয়া হাসে।

আমি বুঝি না ওদের কথা......
জগৎ-সংসারের ধরতাই-বুলি এখন আমার মুখে
কিংকর্তব্য-মানুষের বুকনি
স্বল্পচেনা পথে শাদা নুড়িতে ঠোকর খায়
চিন্তিতভাবে এগোয়
বিভ্রান্ত মানুষ—
ওদের বাঁধা বুলি আমি বকি
আর পায়ে পায়ে মাটি পা জড়িয়ে ধরে আমার।
আহ্, আমি ক্লান্ত
এই হাওয়া নিয়ে ক্লান্ত
এই যন্ত্রণার কফিন এই হৃদয়
এই দীর্ঘ নিষ্ফল ডাক শুনে ক্লান্ত, ক্লান্ত।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ল্যাংস্টন হিউজ

নদীর কথা বলি

এইখানে নদীর গান গাই :
পৃথিবীর বয়সের মতো আজন্ম
সমতা রেখে বহমান নদী।
ধমনীর স্রোত সে তো তার কাছে
একান্ত নবীন। ইতিহাস আরো পরে।

আমার হৃদয় যেন
প্রত্যন্ত গভীর ছোঁয়া,
নিতল শিকড়-মেলা নদী!

আমার অবগাহন য়ুক্রেতিসে
বিশুদ্ধ ভোরের কৈশোর,
আমার ঘর বাঁধার স্বপ্নে আমার
নীড় কঙ্গোর ধারে, কত ঘুম তার সুর।
আমার দুচোখ ছড়িয়েছি নীলের এপার ওপার,
গড়েছি নিপুণ শিল্পে তীক্ষ্ন পিরামিড।
আমার চেতনার উজ্জীবনে আমি
মিসিসিপির গান শুনেছি বহুবার।
আমি দেখেছি তার বুক আহা,
গোধূলিতে সোনার উৎসব
সূর্যাস্তে অপরূপ শোভা।

আমি নদীদের জানি—গান গাই
আজন্ম স্থবির স্থির, বহমান সন্ধ্যার নদী ;

তাই বুঝি আমারও হৃদয়
প্রত্যন্ত গভীর ছোঁয়া
নিতল শিকড়-মেলা নদী—
জ্যোতির্ময় যাত্রার গান।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

একটি কালো মেয়ের জন্যে গান

দক্ষিণের পথ বেয়ে দূরের ডিক্সি
(যেখানে হৃদয় আজ ছিন্নভিন্ন পাখা)
তারা তাকে ঝুলিয়ে দিল দোরাস্তার মোড়ে
দীর্ঘ ছায়া নড়ে আমার কৃষ্ণকলি প্রিয়তমা-দেহে।

দক্ষিণের পথ বেয়ে দূরের ডিক্সি
(দেখি তারই চূর্ণ প্রাণ বাতাসের ঘরে)

উন্মুখ শুধাই আমি শ্বেত প্রভু যিশুর মন্দিরে
কী লাভ তুমিই বলো প্রার্থনার অন্তিম প্রয়াণে।

দক্ষিণের পথ বেয়ে দূরের ডিক্সি
(এখন হৃদয় থেকে রক্ত ঝরে শুধু)
উলঙ্গ গাছের ডালে শুনি এক প্রেমের গোঙানি,
ভালোবাসা ! সে তো আজ ফাঁসিকাঠে নগ্ন ছায়া, প্রেত

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

নাজিম হিক্‌মত

রবিবার

আজ রবিবার
আজ এই প্রথম
রোদ্দুরে আমাকে বেরোতে দিয়েছে ওরা
আর জীবনে এই প্রথম
দেখে অবাক হলাম আকাশ কত সুদূর
কত নীল
কত বিরাট।

আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম নিশ্চল নিঃস্পন্দ হয়ে।
তারপর অবাক বিস্ময় নিয়ে মাটিতে বসলাম।
শাদা দেয়ালে এলিয়ে দিলাম পিঠ।
ঠিক এই মুহূর্তে কোনো অলস স্বপ্ন নয়
বধূ নয়, সংগ্রাম নয়, স্বাধীনতা নয়।
পৃথিবী, সূর্য আর আমি।...

আমি আনন্দিত, আমি সুখী।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

শেখ বদরুদ্দিনের মহাকাব্য থেকে

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
চম্‌কানো
চাপা গলায়
যেন রাজদ্রোহের আলাপ।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
যেন কোনো বেইমানের ফ্যাকাশে উলঙ্গ পা
স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার মাটিতে ধাবমান।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
সেরেজের বাজারে
কাঁসারির ঝাঁপের সামনে
একটি গাছে ঝুলছে বদরুদ্দিন আমার।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
নক্ষত্রহীন এই নিশুতি রাত্রে
বৃষ্টিতে ভিজছে
নিষ্পত্র গাছের ডালে আমার শেখের উলঙ্গ শরীর।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
সেরেজের বাজার মূক
সেরেজের বাজার অন্ধ।
হাওয়ায় নৈঃশব্দ্যের, হাওয়ায় অন্ধতার শাপগ্রস্ত বিষাদ
সেরেজের বাজার হাত দিয়ে ঢেকে আছে মুখ।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গেরিট আখতেরবার্গ

বসন্ত এবং মৃত্যু

বসন্ত আর মৃত্যু যুগলপথিক
সেই বন্ধুতা সকলেরই অবিদিত
কেবল একের নিকটে যে অর্পিত
বশীভূত হবে অন্যেরও কাছে ঠিক।

হৃদয়, পুষ্পপ্রহর পরিত্যাগের
পূর্বেই মাতো বসন্তউৎসবে।
সাজাবে তোমায় অভাবিত গৌরবে
কোনো ফুল নয় অনুরূপ অর্ঘ্যের।

চরম আঁধার অন্তিম যন্ত্রণা
আসবার আগে মৃত্যুকে ভুলো নাকো।
অথবা তোমার আগ্রহ বৃথা রাখো
মুকুলে মুকুলে, অকারণ আনাগোনা।

বসন্ত আর মৃত্যু যুগল পথিক
সেই বন্ধুতা সকলেরই অবিদিত
কেবল একের নিকটে যে অর্পিত
বশীভূত হবে অন্যেরও কাছে ঠিক।

আলোক সরকার

জে. বার্নিং

গোলাপ

গোলাপ-ও শঙ্কিত হয় এমন কোমল বেদনায়
সারারাত্রি ভরে যবে শান্ত বৃষ্টি অবিরল ঝরে,
এতো নম্র শীতলতা ক্ষত করে তব যন্ত্রণায়,
আমারও আঘাত, প্রিয়া, কোনোদিন যাবে না সে সরে।

একদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দু-জনে দেখেছি
বৃষ্টিধৌত গোলাপের ছিন্নদল,—তুমি আর আমি
শুনেছি সমস্ত রাত জলধ্বনি, তুমি কিংবা আমি
নশ্বর ক্ষণিক সত্তা সর্বজয়ী কেউ কি বুঝেছি।

গোলাপের পাপড়িগুলি, শুভ্র লাল করুণ ছড়ানো
দুটি ছোটো হাত ভরে নিয়েছিলে, তবুও কখন
সিক্ততায় ঝরে গেল পুনরায় সুনিবিড় ঘাসে।

সেই নম্র যন্ত্রণায় ভরা এই হৃদয়, কে জানো
কী ভাবে প্রশান্ত হবে, বর্তমানে গোলাপ যখন
তোমার দু-হাতে পাপড়ি মেলে, স্তব্ধ সুনিবিড় ঘাসে।

আলোক সরকার

জে. এঙ্গেলমান

বিদায়

আজ সমাপ্ত তোমার আমার বিরলে থাকার দিন।
এখনও যাহারা রয়েছে শয্যাসীন
হে হৃদয়, ওরা আমার মতন জানে না সুনিশ্চয়
বিষাদ ব্যতীত ভাগ্য কভু না রয়।

মুখখানি তোলো, বাড়াও ওষ্ঠাধর।
একদা বিশ্বজগৎ-ব্যাপ্ত হিম-প্রবাহের পর
চন্দ্র সূর্য হবে নিমজ্জমান
তারও আগে মুছে যাবে আমাদের নাম।

যে-রূপসাগরে বাহু দুটি ছিল নিরবধি আপ্লুত
পাথুরে মাটিতে রবে নিদ্রাভিভূত।
কণ্ঠে কেঁপেছে যে-ভালোবাসার ঢেউ
হবে নিঃশেষ, খুঁজেও পাবে না কেউ।

আর কেউ কভু আশ্চর্যের পায়নি এ-সন্ধান
আমার জীবনপাত্রে তুমি যে মাধুরী করেছ দান
রাতের আঁধারে যা ছিল ক্ষুদ্র শিখা
প্রভাতের পটে সে পেল রক্তটীকা।

নক্ষত্রেরা চঞ্চলগতি চলে যায় কোথা দূরে
নদী বহে চলে, একটি বালক সুরে
শুরু করেছিল বিদায়ের গান, স্তব্ধ সে গানটিও
প্রিয়তমা সখী, প্রিয়তমা, মোর প্রিয়।

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

এ্যাণ্টনী ডকার

অগ্নিশিখা

প্রত্যহ এই পৃথিবীটা যেন ক্ষুদ্রায়মান
ক্ষুদ্রকায় এ দ্বীপখানি যেথা আমরা থাকি
ক্রমে ক্ষয়ে আসে ভালোবাসা দেওয়া-নেওয়ার প্রাণ
প্রত্যেক দিন।

প্রত্যেক দিন বেড়েই চলেছে শুধু ব্যবধান
ভাবনার মুখে কালো ও ক্লিষ্ট মুখোশ আঁটা
মানুষের কাছে অতি সামান্য প্রত্যাশা রাখি
জীর্ণতা তার জাগাবে আবার আগুনের গান।

নিজের কথাটি সাগ্রহে যবে করেছি স্মরণ
সময় ও ক্ষয় করেছে আমার সকলই হরণ
সামান্যই সে, যৌবনে যেটা হতে পারতাম
অগ্নিবর্ণ উজ্জ্বল শিখা দেদীপ্যমান
প্রত্যেক দিন।

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

মাইকেল ডিক

উৎসবের রাত

সোয়ার্দি মেডি, মুক্তা-খচিত দাঁত
বুকে তার সুখ-নীড় রচিয়াছে দুটি পিঙ্গল পাখি
দুটি নির্বাক পাখি দুইজনা বেদনা ও শোকাঘাত
তাদের বন্য স্বভাব কেবলই কুখ্যাতি আনে ডাকি।

গোপন গভীর খাড়ি আছে এক ছোটো অরণ্যে তার
রেখেছে রাতের আলোয় ছায়ায় ঢাকি
সেখানে যেজন যতবার নামে ফিরে আসে ততোবার
মুঠোয় জড়ায় উষ্ণ বুকের দুটি পিঙ্গল পাখি।

আমরা দুজনা কাউকে ডাকি না নিত্য-নতুন নামে
রচি না প্রেমের কিংবদন্তী অথবা চাতুরী ছল
আমরা কেবল দোঁহে পাশাপাশি উষ্ণ দেহের টানে।

রুটিখানি নাও, খাও ওটা, আমি এনেছি তোমার তরে—
গাও তো তোমার অতি-প্রিয় সেই গ্রীষ্মকালীন গান,
আমার পুষ্প-স্তবক ঘুমাক আজ রজনীতে তোমার খোঁপার পরে।

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

পি. এন্. ফান আইক

মৃত্যু এবং ফুলবাগানের মালি

পারস্যের এক গণ্যমান্য লোকের কাছে শোনা :

তখন সকাল, ত্রস্ত আমার ফুলবাগানের মালি,
ছুটে এসে বললে, 'দায়ী এই পোড়া কপালই!

গোলাপের ঐ কেয়ারিটা বানাচ্ছি আন্‌মনে,
এমন সময় মৃত্যু এসে তাকায় চোখের কোণে।

দেখে আমি ভয়েই সারা, ছুটছে কালঘাম,
মৃত্যু আরো ভয় দেখাল, দৌড়ে পালালাম।

ঘোড়াটা দিন আমায়, হুজুর, বাঁচান আমার জান,
রাত্রি হবার আগেই যাব পৌঁছে ইস্পাহান।'

এই বলে সে উধাও। দেখি সন্ধেটা না-যেতে
মৃত্যু আনাগোনা করছে দেওদার পার্কেতে।

নিজে থেকে কয় না কিছু, শুধাই আমি তারে,
কেন অমন ভয় দেখালে আমার মালিটারে?

হেসে উঠে বললে : 'ও কি ভয় দেখানোর ধরন ?
নাকি আমি নিজেই অবাক হয়েছিলাম, কারণ

কী করে সে ব্যস্ত থাকে ভোরবেলা বাগানে,
নির্ঘাৎ রাত হলেই যাকে ধরব ইস্পাহানে !'

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

উৎসনির্দেশ

[অনুবাদে প্রধানত ইংরেজি ভাষার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে যাঁরা পড়তে চান তাঁদের সুবিধের জন্য মূল কবিতার একটি উৎসনির্দেশ এখানে রাখা হলো। তালিকাটি ঈষৎ অসম্পূর্ণ। প্রকীর্ণ অংশের আঠারোটি এবং অন্যান্য বিভাগের কয়েকটি কবিতার অনুল্লেখ রয়ে গেল। পৃষ্ঠাসংখ্যা অনুসারে নামগুলি সাজানো।]

ফরাসি

৩. Plaisir d'amour ne dure ; ৪. Il vivait , il jouait ; Nuits de Juin ৫. Le relais ; Une allèe du Luxumburg ৬. Chanson de barberina ৭. L'Art ১১. Midi, roi des étés ১২. Tre fila d'oro ১৩. Hymne ১৪. Correspondances ১৫. Une charogne ১৭. Recueillement ১৮. Harmonie du soir ; L'Ennemi ১৯. L'Azure ২১. Brise marine ২২. L'Après-midi d'un Faune ২৬. Apparition ২৭. Quand l'ombre menaça ২৮. Autre eventai· ২৯. Art poêtique ৩০ Colloque sentimental ·৩১. L'heure exquise ৩২. Femme et chatte ৩৩. Le Faune ; Mon rêne familiar ৩৪. Paria ৩৭. Le crapaud ৩৮. L'Aube ৩৯. Le déserts de l'amour ৪০. L'éternite ৪১. Voyelles ৪২. A une raison ; Ma bohime ৪৩. Soir de printemps sur les boulevards ৪৪. Crépuscule de mi-juillet, huit heures ৪৫. E'clair de gouffre ; ৪৭. Ardeur ৪৮. La Muse qui est la Grâce ৫০. **From** 'Chantecler' ৫১. La Cimetière marin ৫৭. Chanson à part ৬১. La jolie rousse ৬৩. J'ai eu le courage ৬৪. Tererbiuon de manches ; Les Grenadines repentantes ৬৫. Saisir ৬৯. Plein ciel ৭০. Eloges XVII ৭১. Eloges XVIII ; **From** Exil ৭২. **From** Chronique ৭৩. Son de Cloche ; Tard dans la nuit ৭৪. Chemin Perdu ৭৫. L'Amoureuse ; ৭৬. Air Vif ৭৭. L'art poêtique ৭৮. Marque Chagalle ৭৯. Paris ৮০. Richard II quarante ৮৩. Labyrinthe ৮৪. La jeune fill de Budapest ; Rue de Seine ৮৭. La jardin ; Familiale ৮৮. Pour toi mon amour ৮৯. L'amourause en secret ; Jeune chevel à la crinière vaporeuse.

জার্মান

৯৩. Das Rosenband ; Motetto als der erste Zahn durch war ৯৪. Prometheus ৯৬. Die schöne nacht ৯৭. **From** Faust I/IV ১০১. Zu Frühling ১০২. Hyperions Schicksalslied ১০৩. Die Heimat ১০৪. Geh' Unter, schöne Sonne ১০৫. Hymnen an die nacht ১০৬. Auf meines kindes tod ১০৭. Mondnacht ১০৮. Du bist

wie; Den könig wiswamitra; Der ungläubige ১০৯. An Jenny ১১১. Dokbin; Die heimkehr, VII ১১৩. Gebet; Septembermorgen; Zur nacht ১১৪. Aflohnt ১১৫. Der römische Brunnen; Ecce homo; Der Wanderer und sein schalten ১১৭. Denk nicht zuviel; All die jungel ১১৮. Mein kind kam heim ১১৯. Patrouille; Schwermut; Mit silbergrauen wufte was das tal ১২১. Ballade des äusseren lebens ১২২. Verwandlung ১২৩. Herbst; Die sonnette an Orpheus III/1 ১২৪. Orpheus XXIV ১২৫. Orpheus 1/XIX; Duino Elegies (2) ১২৮. Rose, oh reiner widerspruch, Lust ১২৯. Blume Baum Vogel; Nacht ১৩০. Sternenlied; Sommer; Form ist wollust ১৩১. Mann und frau gehn durch die kresbaracke ১৩২. Vor einem kornfled ১৩৩. Ein wort; Ein winterabend ১৩৪.; Der krieg (1911) ১৩৬. Der Pflaumenbaum ১৩৭. Die landschaft des exils; Die maske des Bösen.

ইতালীয়

১৪৩. L'infinito; A sè stesso ১৪৪. Pianto antico ১৪৫. Congedo; Mezzogiorno alpino; Allora ১৪৬. Lavandare ১৪৭. La pioggia nel pineto ১৫১. La chimera ১৫২. Griardino autunnale ১৫৩. L'inventriata ১৫৪. Donna genovese; **From** Quattro lyriche per S.A. ১৫৫. Elerno; Agonia ১৫৬. Stassera; Allegria di naufragi; Mattina; Tutto ho perduto ১৫৭. Sera; ১৫৮. Per album ১৫৯. L'ombra della magnolia ১৬০. Lungomare; Vento sulla mezzaluna ১৬১. Dolla rocca di Bergamo alta ১৬২. Antico inverno; Ed è subito sera ১৬৩.; Novembre.

স্পেনীয়

১৬৭. Pax Anima ১৬৮. ? En qué piensas tú, muer to Cristomio ? ১৭১. Lo Fatal ১৭২. **From** Une dia **and** El haro de Florece ১৭৪. Una poema; La meditation per esta dia ১৭৫. Una poema ১৭৬. Critica Parabla ১৭৯. **From** Platero y yo ১৮০. Masa ১৮১. Casida de la rosa ১৮২. El hino mudo ১৮৩. Canto nocturno de les marinaras Andalces ১৮৪. La casada infiel ১৮৬. Pueblo ১৮৭. Poema del destierro; Retornos ১৮৮. Ritornos ১৮৯. La alba que nombra ১৯০. Una composicion poêtica; Una pequeña balada de Plovdiv ১৯১. El arpa ১৯২. Tierras Offendidas ১৯৪. Himme

ইংরেজি

মার্কিন

রুশ

চীনা

জাপানি